এপার গঙ্গা ওপার আমুদরিয়া

সুভাষ সমাজদার

প্রথম প্রকাশ : গান্ধী জন্মদিবস, ১৩৬৩

প্রকাশক :

Indian Council for Economic & Political Affairs
1, Auckland Place. Calcutta-17

মুদ্রক : হুগলী প্রিন্টিং কোং লিঃ
৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০৭১

Printed by :
Hooghly Printing Co. Ltd.
41, Chowringhee Road,
Calcutta-700071.

প্রচ্ছদ : ডি. রায়

Cover : D. Roy

Distributor :
Manisha Granthalaya (P) Ltd.
4/3 B, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-700012

অমিয় গুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু

To
Amiya Gooptu Esq.
As a token of
respect and
love.

এই লেখকের—

1. বাণিজ্যে বাঙালী ঃ একাল ও সেকাল ।
(Vanijye Bangalee : Ekal O Sekal
A well-documented book on
Trade and Economics of Bengal
from Vedic Period to Plassy).

2. গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ।
(Ganga Theke Caspian : A Historical
novel based on trading relations
between India and Russia
during 16th Century).

3. নগরসুন্দরী (Nagar Sundari :
History of the learned and
intellectual Courtesan from
authentic sources).

4. দাসদাসীর হাট (Das-dasir Hat-
History of the slavery in Bengal).

সূচীপত্র (Contents)

গ্রন্থকারের নিবেদন (Preface by the Author) ... ... ক

শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন (Shak-Hun dal Pathan Mughal ek dehe halo lin... Relations between ancient Central Asia and India) ... ১-(1)

প্রত্নতত্ত্বে রুশ-ভারত মৈত্রী (Archaeological evidences of Indo-Russ Friendship) ১১-(11)

ডেরিয়াস : ভারত-রুশ মৈত্রীর প্রথম পথিকৃত (Darius : 521-485 B. C.—The Pioneer in the Connecting link between India-Russia) ... . ২৭-(27)

কনিষ্ক : রুশ-ভারত সখ্যতা (Kanishka. A.D. 2 : Russia-India Relations) ... ... ৩৯-(39)

আমুদরিয়ার দেশে ভারতীয় সন্ন্যাসী (Indian monks in the land of oxus) ... ৫২-(52)

সিল্করুট : ভারত-রুশ মৈত্রী সেতু (Silk route : A bridge of friendship between Bharat-Russ) ... ... ৭১-(71)

ইবন খোরদাদবিহ—গাঙ্গেয় উপত্যকায় রুশী সাক্লাবাহ (Ibn Khordadbiha : Russians sword in Gangetic Valley) ... ৯১-(91)

ইবন ফাদলাহন—দশম শতাব্দী : আমুদরিয়ার দেশে ভারতীয় তান্ত্রিক (10th Century A. D. Indian yogi in the land of oxus) ৯৬-(96)

মার্কোপোলো : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রুশ-ভারত মৈত্রী (Marco Polo : XIII Century A. D. Indo-Russ friendship) ... ১০১-(101)

ইবন বতুতা : গাঙ্গেয় উপত্যকায় খোয়ারিজমের ঘোড়া ও তরমুজ (Ibn Batuta ; XIV Century A. D. Horse and Melon of Khawarism in Gangetic Valley) ... ১১১-(111)

বাবর : দুই মহান দেশের সখ্যতার সেতুবন্ধন (Babar XV Century A. D. Constructing a bridge of friendship between two great and ancient lands) ... ১২২-(122)
জেনকিনসন : রুশ-ভারত মৈত্রী (Jenkinson XVI Century A. D. Ruisian-Indian relations) ... ... ১৩৩-(183)
রুশ-ভারত মৈত্রী : সপ্তদশ শতাব্দী—ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বা মধ্যএশিয়া (Indo-Russ friendship : XVII Century A. D. India and Union of Soviet Federal Republic or Central Asia) ... ... ১৪৩-(143)
রুশ-ভারত মৈত্রী : অষ্টাদশ শতাব্দী (Russian-Indian relations. XVIII Century A. D.) ১৬২-(162)
রুশ-ভারতসম্বন্ধীয় তথ্য-নির্দেশিকা (Index to the facts, referred in the text) ... ... ১৭৭-(177)

নিবেদন

সাত বছর আগে, ১৯৭৪ সালে যোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (আকবরের সমসাময়িক) গৌড়ের উচ্চাভিলাষী বণিক ভিখু শেখের মসলিন ও মালদহী রেশমবস্ত্রের সম্ভার নিয়ে রাশিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার তথ্যটুকু ভিত্তি করে লিখেছিলাম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান'। গাঙ্গেয় মৃত্তিকার সঙ্গে সেই সুদূর ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সেই ঐতিহাসিক তথ্যটির ভেতরে ইঙ্গিত ছিল পারশ্যোপসাগরে ঝড়ে জাহাজ ডুবির পরে ভিখু শেখ বুশায়ার (পারশ্যোপসাগরের বন্দর) থেকে ইস্পাহান, তেহরান এবং তাব্রিজ (আজার বাইজান) হয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিল। তারপরে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' (১৩৩০ সন), রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং গম্ভীরা গানে শুধু ভিখুর নামটি ছাড়া আর কোন উপাদান পাওয়া যায় না।

ইতিহাস যেই স্তব্ধ হয়ে গেল, অমনি আমার মনকে আলোড়িত করে তুলল নানা প্রশ্ন—ভিখুর সুদূর রাশিয়ায় বাণিজ্যযাত্রা নিশ্চয়ই আকস্মিক নয়। কবে—কত যুগ আগে হিমালয়ের পরপারবর্তী মধ্যএশিয়া তথা আমুদরিয়া শিরদরিয়ার উপত্যকার সমৃদ্ধ জনপদগুলোর সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডের শুরু হয়েছিল বাণিজ্যিক লেনদেন; আর সেই সূত্রেই কেমন করে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধান এড়িয়ে দুইটি প্রাচীন দেশের সৌহার্দ্যবন্ধন গড়ে উঠেছিল ?

সেই শুরু। এই বিষয়টিকে ভিত্তি করে ব্যাপক অনুসন্ধানের বাসনা নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুঁথি, দলিল দস্তাবেজ এবং পত্র পত্রিকা যত হাতড়াই ততই বিস্মিত আর মুগ্ধ হয়ে যাই এক একটি অদ্ভুত উপাদানের বৈচিত্র্যে। লাহোরের কবি মাসুদ সালমান (ত্রয়োদশ শতাব্দী) রুশী তলোয়ারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন। রুশী ইস্পাতের তৈরী তীক্ষ্ণধার তরবারি নাকি উত্তর ভারতের রণনিপুণ সৈনিকদের কাছে ছিল একান্ত অপরিহার্য। ভেনিসের দুঃসাহসী ভ্রমণকারী মার্কোপোলো (১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) দেখছেন, ভারতীয় বেনিয়া 'গ্যাঞ্জেটিক মসলিনের পণ্যসম্ভার নিয়ে হিন্দুকুশ-

পামীর ডিঙিয়ে চলেছে ব্যাক্ট্রিয়া (আধুনিককালের উত্তর আফগানিস্থানের একটি অঞ্চলের প্রাচীন নাম) হয়ে আমুদরিয়ার সন্নিহিত দেশে। রুশী ঘোড়ায় চেপে মরক্কোর বহুদর্শী পরিব্রাজক ইবনবতুতা (১৩০৩-১৩৭৭) প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বলছেন, খোয়ারিজমের (আধুনিককালের উজবেকিস্থান ও তুর্কমেম রিপাবলিকের অধীন) জলে বাতাসে পুষ্ট তেজস্বী অশ্ব এবং সুমিস্ট মেলোন বা তরমুজের বিপুল চাহিদা ছিল ভারতে। তার তিন-চারশো বছর পরে ইউরোপীয় সওদাগর এবং ভ্রমনকারী ফর্স্টার Forster (১৫৮৩-১৬১৯) জন স্ট্রুজ (John struys, ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ আরও অনেকের ভ্রমণবিবরণী বা রোজনামচায় ভারত-রুশ সখ্যতার যেমন অজস্র তথ্য ছড়িয়ে আছে তেমনি Scandinavian Instititute of Asian studies-এর পুস্তিকায় আছে খোয়ারিজমের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগের ব্রোঞ্জের কবন্ধ রমণীমূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠবে মহেঞ্জোদারোর নর্তকীর (ব্রোঞ্জের-ই) আশ্চর্য সাদৃশ্যের চমকপ্রদ তথ্য! হিন্দুকুশের দক্ষিণে পাহাড়ের ঢালুতে নিবিড় দেওদারবীথির নীলাভ ছায়ায় যাযাবর উপজাতিদের সমাধি ভূমিতে আবিস্কৃত প্রস্তরীভূত মৃতদেহের কণ্ঠে গাঙ্গেয় উপত্যকার হীরকখচিত রক্তিমাভ প্রস্তুরের পুঁতির মালা; উজবেকিস্থানের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের (৩য়-৪র্থ খ্রীষ্টাব্দ) ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ঘন-কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠদেহী সশস্ত্র যোদ্ধার আবয়বিক গঠনে কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় অধিবাসীদের সুস্পষ্ট প্রভাব—পুরাতত্ত্ববিদ্যার সোভিয়েত পণ্ডিত টলস্টভ (Tolstov), ফ্রামকিন (Frumkin) প্রমুখদের নিরলস অনুসন্ধানে আবিস্কৃত আরও অনেক চমকপ্রদ প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটি ঐতিহাসিক সত্য—গাঙ্গেয়ভূমির সঙ্গে মধ্যএশিয়া তথা আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার জলবিধৌত ভূখণ্ডের সখ্যতাবন্ধন স্মরণাতীতকালের।

হাজার হাজার বছর আগে (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক এবং তারও পূর্ববর্তীকাল) দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় আর হিন্দুকুশ-পামীর ডিঙিয়ে দুস্তর মরুভূমি পেরিয়ে প্রাচীন বাণিজ্যপথ সিল্করুট দিয়ে (২৯ খৃঃ পূঃ) অসংখ্য দূরভিলাষী সার্থবাহের সহযাত্রী হয়ে গিয়েছে অগণিত দুঃসাহসী বৌদ্ধশ্রমন। আর আমুদরিয়ার দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতি। ডেলিগেশান, কনফারেন্স, পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসী ছাড়াই রুশ-ভারত মৈত্রীর বনিয়াদ রচিত হয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীর দেশদেশান্তরের বণিকদের মিলনস্থল—ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর ক্যারাভানসরাইতে। এই পান্থশালাগুলো-ই ছিল

সাবেকদিনের ইনফরমেশান সেন্টার বা এম্ব্যাসীতে।

গোর্কিসদনের আমন্ত্রণে 'সোভিয়েত-দেশ' পাঠকদের সভায়, সাধারণ সভা-সমিতিতে এবং বেতারে বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ হয়েছে। 'সপ্তাহ' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্তের আমন্ত্রণে প্রথমে কিছু অংশ সেখানে, বাদবাকী টুকু ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির মুখপত্র 'রুষ-ভারতীতে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়, উজবেকিস্থানের Soviet-Indian Friendship Society-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরাট মীরকাশিমভকে (Surat Mirkasymov) এই গ্রন্থের সারসংক্ষেপ বা সিনপসিস পাঠিয়েছিলাম। তিনিও খুব উৎসাহ প্রকাশ করে রুশীভাষায় লেখা মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের একটি বই পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। আর সে-বইটির পাঠোদ্ধার করে আমাকে ঋণী করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান হরিশচন্দ্র গুপ্ত। মনে পড়ছে—'গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান' পড়ে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও মানবিকী বিদ্যাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন "কঠিন পরিশ্রম করে এত তথ্য সংগ্রহ করেছো—এবার এই 'Basic Facts'-গুলো নিয়ে একটা প্রবন্ধের বই লেখো—তাঁর এই সস্নেহ নির্দেশ এই দুরূহ কাজে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বলা কর্তব্য—কাগজ, মুদ্রণের দারুণ অগ্নিমূল্যের বাজারে এই প্রবন্ধের বই-টির প্রকাশনায় যখন বেশ বিচলিত হয়েছি তখন বন্ধুবর কবি তরুণ সান্যাল নিরন্তন উৎসাহ দিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। সোভিয়েত মধ্যএশিয়া-বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার, ডক্টর মহাদেব সাহা, চিন্মোহন সেহানবীশ এবং বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এঁরা কেউ পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে, কেউ নতুন তথ্যের হদিশ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন অগ্রজপ্রতিম কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের প্রদ্যোত গুহ ও বন্ধুবর সিদ্ধেশ্বর সেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের সহৃদয়তাকে খর্ব করতে চাই না। জাতীয় গ্রন্থাগাগের বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে ঠিক প্রয়োজনীয় বই এবং পত্রপত্রিকা নির্বাচন এবং এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের সূচী প্রণয়ণ করে প্রভূত সাহায্য করেছেন আরতি চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা বসু। নানাভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপিকা গৌরী সেন সহকর্মী ডক্টর বিজয় দেব, ডক্টর দিলীপ মিত্র এবং প্রেসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন

হয়েছেন শ্রীজি. পি. দাশগুপ্ত।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন মনে করছি, এই গ্রন্থে আলোচিত আমুদরিয়া-শিরদরিয়া সন্নিহিত অঞ্চলের (কাজাকস্থান, কিরগিজিয়া, তাজিকিস্থান এবং উজবেকিস্থান) মাটি শুধু মানবসভ্যতার আদিমতম লীলাভূমি নয়, যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শক, হুন, সুগ্দীয়, কুশান, তিব্বতীয়, চীনা, পারসিক, আরবীয়, ভারতীয় ও গ্রীক এবং মধ্যএশিয়ার আরও অনেক নরগোষ্ঠীর স্রোত এই ভূখণ্ডের একস্থান থেকে আর একস্থানে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার সমন্বয়ে নতুন ধরণের সংস্কৃতি ও শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। অতএব বলাবাহুল্য, বিষয়টি যেমন ব্যাপক এবং জটিল তেমনি দূরপ্রসারী। বর্তমানগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর ওপরে আছে প্রচুর উপাদান। সে-সব—শুধু কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। তাই এই গ্রন্থটিকে গাঙ্গের উপত্যকার সঙ্গে সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার মৈত্রীবন্ধনের বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে দাবী করতে পারি না। তবে এই গ্রন্থ পড়ে যদি কোন গবেষক উৎসাহিত হয়ে এই বিষয়ের ওপরে বিশদ কাজ করেন তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

গ্রন্থটিকে, যতদূর সম্ভব, তথ্যভিত্তিক করতে যত্ন নিয়েছি। অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষক-মনা পাঠকদের জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রায় প্রতিটি তথ্য-সূত্রের গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করেছি।

সুভাষ সমাজদার

PREFACE

Seven years ago, in 1974, I wrote a historical novel, 'GANGA THEKE CASPIAN' based on an amazing fact of history. One ambitious Bengalee merchant, Bhikhu Sheikh, went to Russia in the latter half of the 16th century 1577 A.D., during the reign of Akbar the Great (Bengal District Gazetteer, Lambourne, 191 a.p. 59, 60) with his precious merchandise of silk and Maldahi cloth. In addition to this basic fact and against the background of the trade relations between the Gangetic Valley and the remote land of Volga-Caspian, there were additional information that Bhikhu Sheikh, after a tragic shipwreck in the Persian Sea, reached the Russian territory by journey overland in a caravan from Bushire (a port on the Persian Bay) through Ispahan, Teharan and Tabriz (Azarbaijan). No farther material is available on this episode except only the mention of the name of Bhikhu Sheikh in "Madhya Yuger Bangla" by the celebrated historian, Kali Prasanna Bandhopadhyaya (1330 BS) (Rajani kanta Chakrabarti's Gaurer Itihas-2nd Part) and the folk song, 'Gambhira'.

Yet, while history became deadly silent, my mind became restless at this daring trading venture of Bhikhu in Russia. That could not have been a random, isolated event. When and how many thousand years ago, trade relations existed between these two ancient regions, namely the oxus (Amudarya) and jaxartes (Sirdarya) valley, beyond the Himalayas and India? How was the cultural and social

ties and the cordial friendship between these two great lands formed ?

This was the beginning—a beginning that was the nucleus of my ceseless pursuit of searching the facets of relationship of these two vast regions in the seemingly profund sea of darknesy. But as I proceed with the search for data in old and rare books, periodicals and documents in the vast collection of the National Library' Calcutta, an amazingly rich and fascinating material was revealed. The illustrious poet of Lahore, Masud Salamn (thirteenth century) gave exotic description of Russian sword. Such weapon, an exemplary instance of Russian craftsmanship according to the historian, was widely used by valiant warriors of Northern India. Marco Polo, an adventurous traveller of Venice (1298 A.D.), visualised that Indian Merchants with their merchandise of Gangetic muslin, were going to the regions adjacent to oxus river via Bactria (ancient name of North Afghanistan) after crossing the lofty Hindukush and the Pamir.

The Versatile genius and well experienced traveller of Morocco, Ibn Batuta (1703-1733 A.D.) riding on a Russian horse set his feet first in Indian soil. He said, in his famous travel account, 'Rehla' that there was then a steady demand in India for the sweet and delicious melons as well as horses of Khawrism (now under Uzbekistan and Turkmen Republics). Innumerable instances of Russian-Indian contacts are recorded in the accounts of the merchant travellers of later periods, for example, Froster (1585) ; John Struys (1684 A. D.) etc. Similarly, a valuable pamphlet of the Scandinavian Institute of Asia Studies refers to the startling fact of striking similarity between the bronze statue of a female without head, discovered in the excavations

of Khawrism, with the archaeological evidence of a vivacious court-dancer of Mohenjodaro (2500 B. C.). The archaeological expedition in cemetries of the pastoral tribes under the cool and bluish shade of Deodar groves on the Southern slopes of Hindukush, revealed a few fragments of fossils, wearing the diamond-drilled carnelian beads, brought from India; statues of emperors and darkskinned armour-plated warriors of South Indian style were found in the ruins of the ancient palace (3rd or 4th century A. D.) of Khawrism suggesting that Khorezm troops at that time included Indians. Numerous other discoveries by the archaeological expedition led by P.S. Tolstov, Alexander Frumkin and other leading Soviet experts of archaeology, established that this historical truth—the Gangetic land had obviously broad ties of friendship with the region of Amudarya and Sirdarya, since time immemorial. A number of adventurous Budhist monks along, with the countless number of ambitious traders, frequently crossed the snow-covered lofty Himalayas and the Hindukush-Pamir and traversing the vast and dreadful desert went to Central Asia through Great Silk Road (29 B. C.) many thousand years ago. Obviously they had spread their own distinctive cultural and religious beliefs in the land of Amudarya (Oxus or Bakshu is also mentioned in the Vedas) and Sirdarya. The foundations of Russian-Indian relations had perhaps been laid in the old caravan sarai, the meeting place of the traders from various countries of the ancient world. These caravan sarais of famous trade centres were, nevertheless, the major information exchanges or embassies of early days.

A synopsis of this book was sent to Mr Surat Mirkasymov, Vice-President Soviet-Indian Friendship Society of

Uzbekistan. While acknowledging it and encouraging me, he was kind enough to despatch me a short treatise on the ancient history of central Asia in Russian language. I am deeply indebted to Mr Harish Chandra Gupta, Deputy Librarian, National Library who has Kindly translated the book into English for me.

I recall also with profound respect, the valuable comments of the late National Professor of Humanities and celebrated linguist, Dr Suniti Kumar Chattopadhyay who after going through my historical novel, 'GANGA THEKE CASPIAN' wrote :

"You have collected so much data on Indo-Russ friendship with hard labour. Now you should write a well-documented treaties, exploiting those basic facts." His affectionate advice has no doubt inspired me in venturing into this very difficult task.

In revising the entire manuscript or leading me to an unknown source of a completely new material and providing necessary advice, the revered Gopal Haldar, Dr Mahadev Saha, Chinmohn Sehanavis and Vivekananda Mukhopadhya, Premendra Mitra, Subhas Mukhopadhya and Prodyot Guha, Sidheshwar Sen of the Soviet Information Service, Calcutta-encouraged me in more than one way.

My colleagues, Mrs Arati Chattopadhyaya and Miss Aparna Basu, helped me in collecting the relevant books and periodicals from the vast collection of the National Library and preparing the long and difficult index. I am also grateful to the invaluable assistance given to me by Professor Miss Gouri Sen, Dr. Bejoy Dev and Dr. Dilip Mitra. To Mr. G. P. Dasgupta who has carried out the arduous task of contacting the press regularly I owe

a deep debt of gratitude. It should obviously be noted that the soil of the ancient land of Amudarya and Sirdarya, Comprising modern Kazakistan, Krigizia, Tadzikistan and Uzbekistan was the melting pot of the Shakas, Hunas, Sogdians, Persians, Arabs, Indians, Greeks and many other ancient races of Central Asia. An absolutely new culture and art had been created with the synthesis of the various cultures of these diverse nations.

This subject is vast in scope and equally complex and varied. Naturally, it is not claimed that this work is a complete record of the close relations between Soviet Central Asia and the Gangeic region in ancient times. A good deal of material had to be left out, as its inclusion would have resulted in further adding to the length of the book. I would feel gratified and amply rewarded, if this book of mine provides the stimulus to research workers to carry out further in-depth studies in this fascinating, still virgin field. My endeavours then will not have been in vain.

Subhas Samajdar

এক

শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন

ভারত আর সোভিয়েত মধ্যএশিয়া।

সুদূর অতীতের প্রাচীন দুই ভূখণ্ড। সুমহান এই দুই দেশের ঐতিহ্য। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর কথা।

কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই গঙ্গা-আমুদরিয়া-সিরদরিয়ার জলের অস্ফুট কলোল্লাসে মর্মরিত হয়ে উঠেছিল সুপ্রাচীনকালের এই দুইটি দেশের নিবিড় সখ্যতার আভাস।

সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে একদা ভারতীয় সভ্যতা যেমন ইন্দোচীনে, শ্যামে, (থাইল্যাণ্ডে), কম্বোজে, যবদ্বীপে ও বালিদ্বীপের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিল (এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে ১০০০ থেকে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেরও কিছু আগে থেকেই ভারতের পূর্ব-সমুদ্র সংলগ্ন দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল)।* তেমনি (হিন্দুকুশ ও পামীরের গহন পার্বত্যলোক পেরিয়ে তিয়েনশানের গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে ইরান থেকে বাদাখশান, বামিয়েন থেকে তুর্ফান, তাসখন্দ-সমরখন্দ থেকে সমগ্র মধ্যএশিয়ায় একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল।

আজ মধ্যএশিয়ায় এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোন অঞ্চল উজবেক, কোনটা কাজাক কি আজারবাইজান বা কিরগিজ কিম্বা তাজিক কি তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত শিল্পে ও বানিজ্যে, বিত্তায় ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক একটি অঙ্গরাজ্য। আধুনিক কালের তাসখন্দের

* Elphinstone. History of india. P. 185

উজবেক অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স, অতিকায় হাইড্রোপাওয়ার স্টেশনের জটিল যন্ত্রযূথ, বৈকোনুরের (কাজাক) কসমোড্রাম, কাস্পিয়ান তীরে ডি-সাল্টিং ইনস্টলেশান, কি বাকুর অয়েল রিফাইনারী এবং সমুদ্রবক্ষে ভাসমান ড্রিলিং রিগ এবং প্রদেশে প্রদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির বিপুল বিস্ময়কর সমৃদ্ধি দেখে কল্পনা করা কঠিন—তার সেই সাবেকদিনের ভয়ঙ্কর রূপ—যতদূর চোখ যায় মরুপ্রান্তর নিঃসীম শূন্যতায় গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। দূরদিগন্তে ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। আবার কোথাও কোথাও পার্বত্য অরণ্যের সবুজ সমারোহ, কোথাও ভয়ভীষণ গিরিখাত, কোথাও তীব্র ও প্রখর গিরিনির্ঝরিণী। জনশূন্য, প্রাণীশূন্য এক একটি ভূভাগ।

কিন্তু—তবুও—তবুও—'The region beyond Himalayas was never so isolated from India...The people of the Northern India and specially the people of Punjab possessed some knowledge of this region and were in contact with nomads almost in every age. (১)

দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় আর তুষারাবৃত কারাকোরাম, পামীর ও হিন্দুকুশ কিন্তু কখনো ভারত—বিশেষ করে উত্তর ভারত ও আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার যুগযুগান্তরের বন্ধনের ভেতরে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারেনি; পারেনি ভারতীয় বণিকদের উটের পিঠে পণ্যসম্ভার চাপিয়ে সেই দুর্গম পথে বাণিজ্য যাত্রাকে রুখতে; পারেনি দুঃসাহসী হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণের গতিরোধ করতে। তারা মধ্যএশিয়ার ঊষর প্রান্তরের বুকে গড়ে তুলেছিল সুরম্য বিহার, অসংখ্য চৈত্যগৃহ, সঙ্ঘারাম। কালক্রমে সেসব বিলীন হয়ে গিয়েছে মরুর বুকে। এখানকার বন্ধ্যা, অনুর্বর মাটিতে রেণু রেণু হয়ে মিশে গিয়েছে সেই সব বৌদ্ধ মঠ হর্মাতয়নের ধ্বংসচূর্ণ।

মধ্যএশিয়ার আধুনিক কালের তাজিকিস্থান, কিরগিজ এবং উজবেকিস্থান অর্থাৎ দক্ষিণ সোভিয়েত এশিয়ার কোন কোন অঞ্চল স্মরণাতীতকালে রুশ-ভারত মৈত্রীর স্বাক্ষর বহন করছে। দুটো দেশের শোণিত-সমন্বয় আর সংস্কৃতি সমন্বয়ের পাথুরে প্রমাণ বহন ক'রছে মধ্য-এশিয়ার কিজিলকুম মরুভূমির বালুতে, তিয়েনশান পাহাড়ের খাঁজে, জারফশান আর ফেরগানা উপত্যকার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অজস্র ভগ্নস্তূপ। তাই দুটো

দেশের সভ্যতাবন্ধনের সুদূর অতীতে ইতিহাসের আলোচনায় সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিবৃত্ত নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'প্রত্নতত্ত্ব', যার ইংরেজী হলো আর্কিওলজি (Archaeology)। এই শব্দটি গ্রীক ভাষার Archaios অর্থাৎ প্রাচীন আর লোগোজ Logos এর অর্থ হলো তথ্যের আলোচনা বা বক্তৃতা—এই দুটি শব্দের সমন্বয়।

আধুনিককালের সোভিয়েতের পুরাকীর্ত্তির অনুসন্ধানীরা বলেন—'আর্কিও-লজির শব্দগত ভাষান্তরে সায়েন্স অফ অ্যান্টিকুইটিজে (Science of Antiquities) কিন্তু আর্কিওলজির ব্যাপক অর্থ পরিষ্কার হয় না। গ্রীক রোমান ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আর্কিওলজি শব্দটিকে শুধু প্রাচীনদিনের ইতিহাস অনুসন্ধানের সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন। আমাদের মতে আর্কিওলজি'র ভেতর আছে নৃতত্ত্বানুসন্ধান অর্থাৎ মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস, আছে দেশদেশান্তরের নরবংশের স্রোতের অবিরাম প্রবাহের ইতিবৃত্ত, আছে তার শিল্প ভাস্কর্যের বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আর্কিওলজির সেই ব্যাপক অর্থকে ভিত্তি ক'রেই আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি—" (২)

রুশ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের এই উক্তি যে অতিরঞ্জিত নয়, রাশিয়ায় অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ ক'রে এসে বলেছেন মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন,—Historical and archaeological research is done in Russia almost with a devotion. (৩)

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য Russian Academy of Science-এর সদস্য এবং উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুরাতত্ত্ববিদ এম, রষ্টোভেফট (M. Rostovtzeft) জানিয়েছেন (৪) রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে না কি সর্বপ্রথম কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্স থেকে আগত রাশিয়ায় বসবাসকারী পুরাতত্ত্ববিদ্যার ফরাসী পণ্ডিতেরা। রুশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের মনে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সম্বন্ধে দুর্নিবার স্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ফরাসী ঐতিহাসিক ডুক দ্য রিচেলিইউ (Duc de Richelieu কমতে দ্য ল্যাঙ্গেরণ (Comte De Langeron) এবং কাউজিনারী (Cousinery)। তারপর অবশ্য রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ফরাসীদের পাশাপাশি

সুপ্রাচীনকালে সেই অবলুপ্ত সভ্যতার নিদর্শনের পাথুরে তথ্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে।

কিন্তু 'Archaeology in U S.S R.' গ্রন্থটির লেখক Alexander Mongait বলেন—(৫)

রাশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল প্রাক বিপ্লব যুগে ষোড়শ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষভাগে (১৫২৯)। এই শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ার প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা Moscow Armoury Museum (মস্কো আর্মারি মিউজিয়াম)। বলাবাহুল্য তদানীন্তনকালের রাশিয়ার শাসনকর্তা প্রথম পিটারের (Peter 1) উৎসাহেই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর রুশ প্রত্নতাত্ত্বিক বি. এম- কিট্রোভো (B. M. Kitrovo) থেকে শুরু করে এ. এস. উভারভ, (A. S. Uvarov, ১৮২৮-৮৪), আই, ওয়াই. জ্যাবেলিন, (I. Y. Zabellin, ১৮২০-১৯০৮), ডি. ওয়াই. স্যামোকভ্যাসভ (D. Y. Samokvasov, ১৮৪৩-১৯১১), এল, কে. আইভ্যানেভস্কি (L. K. Ivanovsky, ১৮৪৫-১৮৯২) ভি. আই. সিজভ (V. I. Sizov), স্পিটসিন (Spitsin), ফার্মাকোভোস্কি (Farmakovsky), এবং সাম্প্রতিকালে প্রফেসার টলস্টভ ও ডক্টর বের্নস্ট্যাম (Dr. Bernshtom) পর্য্যন্ত গবেষকদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই প্রমাণিত হয়েছে Russian state found itself in possession of major Cultural centres of ancient civilisation...In Russia there are relics of almost all ages and almost all peoples—from primitive tools of the stone Age to classical world articles of inimitable beauty, from the ancient cuneiform of the Assyrian Kingdom to undeciphered charaeters surviving on rocks in Siberian mountains অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতা আর সংস্কৃতির অধিকাংশ কেন্দ্রগুলোর ধ্বংসাবশেষ আধুনিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। সেই আদিকালে প্রস্তরযুগের হাতিয়ার থেকে শুরু করে উন্নততর সভ্যতার গরিমাদীপ্ত কালের অনেক অননুকরণীয় সুন্দর জিনিস এবং অ্যাসিরিয়ার কিউনিফরম অর্থাৎ বাণমুখ লিপি (কীলক বা গোজের মতো প্রাচীন লিপি) থেকে শুরু করে সাইবেরিয়ার পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা

অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন (যাদের পাঠোদ্ধার এখনো হয়নি)—প্রায় প্রতিটি যুগের মানব সমাজের, প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের চিহ্ন দেখা যায় রাশিয়ার মাটিতে।

মনগেটের এই তথ্যটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় রস্টোভেফটের এই উক্তিতে (৬) The Contributions of South Russia (Central Asia) in the history of World in General and to the Civilisation of mankind is immense......

কিন্তু ভারত ও মধ্যসোভিয়েত এশিয়ার স্মরণাতীতকালের মৈত্রীর ইতিহাস পর্যালোচনার আগে ঠিক কোন কোন অঞ্চল মধ্যএশিয়ার অন্তর্গত সেই মানচিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট থাকা দরকার। আলেকজাণ্ডার বেলিনিতস্কি (Alekesander Belinitsky) বলেছেন (৭) আধুনিককালের রাশিয়ায় মধ্য-এশিয়ার ভৌগলিক অঞ্চলের সীমানাভুক্ত হলো—উজবেক, তাজিক, তুর্কমেনিয়া, কিরগিজ এবং কাজাক রিপাবলিকের দক্ষিণাংশ।

এই পরিধিকেই আরও প্রসারিত করে রাহুল সংকৃত্যায়ন জানিয়েছেন—পূর্বে ইরান এবং কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে চীন সীমান্তে তিয়েনশান পর্বতমালা, দক্ষিণে আফগানিস্থান আর উত্তরে উত্তর মহাসাগর—এই সীমানার ভেতরে আরল সমুদ্রে পতিত, মধ্য এশিয়ার জীবন সরণি দুই অন্তর্বাহিনী নদী আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার জলধারা পুষ্ট যে ভূখণ্ডে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি অবস্থিত, সেই ভূখণ্ডকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে 'এশিয়াটিক রাশিয়া'।

তার মাটির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র খুঁজতে হলে যেতে হবে খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগে অর্থাৎ সেকেণ্ড মিলেনিয়াম বিফোর ক্রাইষ্ট (Second millennium before christ). এই তথ্যটির ঐতিহাসিক সত্যতার আভাস পাওয়া যায় মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের অক্লান্ত গবেষক, স্বনামধন্য পণ্ডিত রাহুলের এই উক্তিতে—The Dravids. who founded Mahenjodaro and Harappa, the magnificent cities and the glorious culture of Indus Valley, had a link with central Asia. (৮)

অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার মাটিতে যে গরিমাময় সভ্যতা আর সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করছে মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ তার সঙ্গেও মধ্যএশিয়ার

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁর এই বক্তব্যের ঐতিহাসিক প্রমাণের স্বপক্ষে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এক ভাগ টিন
দশ ভাগ তামা

এই দুটো ধাতু ওই পরিমাণ মিশিয়ে দিলে যে ব্রোঞ্জ পাওয়া যায় —এই রাসায়নিক রহস্যটি আমাদের উত্তরসূরীরা খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগে থেকেই জানতো! প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাজাবাগিয়াব (Tajabagyab) সংস্কৃতিকেই ব্রোঞ্জ যুগের সময়ের সীমারেখা বলে নির্দিষ্ট করেছেন। The culture of Tajabagyab in the Second millennium before christ is considered to be a Bronze Age culture (৯)

কোথায় এই তাজাবাগিয়াব, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

তাজাবাগিয়াব।

আরল সমুদ্রের পূর্ব-দক্ষিণে আমুদরিয়ার দুই তীরের বদ্বীপে সুপ্রাচীন-কালের ভূখণ্ড খোয়ারিজমের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক কালের এক ভগ্নস্তূপ হলো তাজাবাগিয়াব।

রুশ প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক টলষ্টভ (Tolstov) কিন্তু মনে করেন (১০) ব্রোঞ্জযুগেরও বহু বহু আগে খোয়ারিজমের এলাকায় গড়ে উঠেছিল এমন এক প্রাচীন সভ্যতা যারা পশুচারণ এবং কৃষিকাজ জানতো।

টলষ্টভ তাঁর নিরলস প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আঙ্কা-কালা (Anka-Kala) টেসিক-কালা (Teshik-Kala) ধ্বংসস্তূপের ভেতরে যেসব নিদর্শন পেয়েছেন, সেগুলো কৃষিজীবী এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজভুক্ত এক উন্নততর আদিম অধিবাসীদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর দিচ্ছে। আবার আরল সমুদ্রের ধারে সুলতান উজদেগ (খোয়ারিজম) পাহাড়ের পাদদেশে মানবসভ্যতার আদিমতম পর্যায় সেই প্রস্তর যুগের শিকারী এবং মৎস্যজীবীদের আবাসস্থলের ভগ্নাবশেষও পেয়েছেন টলস্তভ।

খোয়ারিজম (Khwarism অথবা Khorezm)।

শুধু এই নামটি ছাড়া আধুনিক কালের মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ায় যার কোনো অস্তিত্ব নেই ; বর্তমানে যে অঞ্চলটি কিছু উজবেকিস্থান, তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক এবং স্বয়ংশাসিত কারাকালপাক (Karakalpak) প্রদেশের ভেতরে বিভক্ত হয়েছে—সেই খোয়ারিজমের মাটিতেই যে মানবসভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল, গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বক্তব্যের ভেতরেও তার আভাস পাওয়া যায়। হেরোডোটাস বলেছেন, Valley of the river Akes (AXU * অর্থাৎ Amu-daria), Khwarism the most ancient land in Asia. (১১)

কিজিলকুম আর কারাকুম-দুই দিকে দুই মরুভূমির মাঝখানে আমুদরিয়া শিরদরিয়ার জলপুষ্ট শস্যশ্যামল উর্বরা একদা সমৃদ্ধ খোয়ারিজমের মরুদ্যান অঞ্চল এবং তার উত্তরে সাইবেরিয়ার সুবিস্তীর্ণ স্তেপভূমিই যে সমগ্র মানবসভ্যতার আদিলীলা ক্ষেত্র তার প্রমাণস্বরূপ ঐতিহাসিক ম্যাকগভর্ন পরিবেশন করেছেন যেমন বিচিত্র তেমনি চিত্তাকর্ষক এক তথ্য (১২)

অশ্ব :

ক্ষিপ্রগতি তেজস্বী আর বলশালী এই প্রাণীটি একদিন ছিল অরণ্যচারী। যেদিন মানুষ তাকে গৃহপালিত এবং পরম উপকারী বন্ধুর মতো তার সহচর করে তুলল, সেদিন মানবসভ্যতা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। বন্য অশ্বকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল এই মধ্য এশিয়ারই স্তেপভূমির আদিবাসীরা Wild horse was first domistecated on the steppes of central asia তাই মধ্য-এশিয়ার প্রাচীনতম এই মৃত্তিকার আর এক নাম—অশ্ব-সংস্কৃতির ভূমি (Land of horse culture)

ঘোড়ার পিঠে মানুষ তার নিজের এবং তার পণ্যের সওয়ার নিয়ে দ্রুতগতিতে দূরদূরান্তরে যাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানো, ভূমিকর্ষণের কাজে লাগানো, ইত্যাদি ঘোড়ার যাবতীয় শিক্ষা সহবৎ মধ্য-এশিয়ার এই স্তেপভূমি থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে।

শুধু অশ্বকে মানুষের সুখ দুঃখের সহচরে পরিণত করাই নয়, চিনে ঢালা

* ঋগ্বেদসংহিতায় আছে 'অক্ষু' বা 'বক্ষু' নদীর উল্লেখ।

আলখাল্লা কি জোব্বার বদলে চোঙ্গা ধরনের পাৎলুন, চামড়ার চপ্পল জাতীয় জুতোর বদলে বুট, অশ্বারোহণের সুবিধাজনক পোষাকেরও বিবর্তন শুরু হয়েছিল এই মধ্য-এশিয়া থেকে। এসব কথা বলে ম্যাকগভর্ন মন্তব্য করেছেন, মানব-সভ্যতায় এশিয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগের অবদান বিস্ময়কর।

এই রুশীয় অশ্ব যেমন তেমনি রুশীয় তলোয়ার উত্তরকালে ভারতের নৃপতি-দের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই দুটো পণ্যকে কেন্দ্র করেই দুই দেশের বাণিজ্যিক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাবে।

কিন্তু খোয়ারিজমের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র কোথায় ?

খোয়ারিজমের তাজাবাগিয়ার ধ্বংসাবশেষের ভেতরে ব্রোঞ্জের কবন্ধ নারী মূর্তি এবং আরও অন্যান্য জিনিস আর মহেঞ্জোদারোর ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে পাওয়া ব্রোঞ্জের নৃত্যরতা রমণীমূর্তি, তামার ও ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, তৈজস-পত্র দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন (১৩) সিন্ধুসভ্যতা তাজাবাগিয়াব সংস্কৃতি অর্থাৎ ব্রোঞ্জযুগের সমসাময়িক।

রাহুল তো প্রথম আর্যসভ্যতার আগমন প্রসঙ্গে রুশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাম্প্র-তিকতম গবেষণাকে ভিত্তি করে একটি চমকপ্রদ ও নতুন তথ্য শুনিয়েছেন Recent archaeological researches reveal that Aryans had their first encounter with Dravids in khwarism, and not in Indus Valley—সিন্ধু উপত্যকায় নয়, আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের সংঘাত হয়েছিল খোয়ারিজমে। তারপরেই তারা পামীর আর হিন্দুকুশ পেরিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এইখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন আর্যজাতি (মহান শ্বেতজাতির অন্তর্ভুক্ত সিদিয়ান—Scythian এবং মধ্য-এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের মহান পীতজাতির বংশসম্ভূত হুন—Hun, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন দেশ পার্থিয়ার অধিবাসীরা, সব মিলিয়ে এরাই আর্যজাতি, বলেছেন নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর ব্রেষ্টেড)।

তাঁর মতামতকে ভিত্তি করেই ম্যাকগভর্ন বলেছেন There can be no doubt that Aryans resided in heart of Asia. এই আর্যজাতিই যে গাঙ্গেয় উপত্যকার মাটিতে বিপুল গৌরবদীপ্ত আর্যসভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, রচনা করেছিল বেদ—সেসব বৃত্তান্ত বহুল প্রচারিত।

তারপর এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে এসেছে গ্রীক, (৩২৫ খৃঃ পূঃ) এসেছে,

পার্থীয়রা (২৫০ খৃঃ পূঃ) এসেছে কুষাণ (৪৫ খৃঃ পূঃ)। হাজার হাজার বছর ধরে মধ্যএশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন জাতি তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ধ্যান ও ধারণা দিয়ে পুষ্ট করে তুলেছিল ভারতের গরিমাময় আর্যসভ্যতা। তাই মনে হয়—

মনে হয়, ভারত ও আধুনিক সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার মৈত্রী বন্ধনের ইতিহাস যে আদিকালের তারই সুস্পষ্ট এবং ঐতিহাসিক ভিত্তি সমন্বিত প্রমাণ নিহিত আছে মহাকবির আবেগদীপ্ত সেই বিখ্যাত কবিতার ভেতরে—

হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা

(১) India and Cenral Asia. P. C. Bagchi— ১১৬

(২) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexander. ৪৮-৫৪

(৩) History of Central Asia Sankrityana Rahul. ১৪ (ভূমিকা)

(৪) Iranians & Greek in Sonth Russia. Rostovtzeft. M. ১

(৫) Archaeology in U.S.S.R. Mongait, Alexander. ৪৫-৫১

(৬) Iranians & Greek in South Russia. Rostovtzeft. M. ৯

(৭) Centarl Asia. Belinitsky, Alexander. ১৫

(৮) History of Central Asia. Sankrityana, Rahul. ভূমিকা

(৯) Ancient Civilisation. Tolstov. S. P. C As Quoted in Mongaits Archaeology ir U.S.S.R. ৩০৮

(১০) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexander. ১৪৭

(১১) As Quoted in Encyclopedea of Islam. —'Khawarism'

(১২) Early Empires of Central Asia. Macgovern. ২ ভূমিকা

(১৩) Decipherment of Proto-Dravidian inscriptions of Indus Civilisation Published by Scandinavian Institute of Asian Studies- ৪

দুই

প্রত্নতত্ত্বে রুশ-ভারত মৈত্রী

এবার মধ্য এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই দুটো দেশের স্মরণাতীত কালের সখ্যতাবন্ধনের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

এশিয়ার অনেক জাতির সংস্কৃতি আর ধ্যানধারণার পীঠস্থান এই ভূখণ্ডের মাটি। তাই আধুনিককালের সোভিয়েত পুরাতত্ত্বের পণ্ডিতদের সন্ধানী দৃষ্টি মধ্যএশিয়ার দিকে দিকে। আর্কিওলজি ইন ইউ, এস, এস, আর (Archaeology in U. S. S. R.) এর লেখক মনগেট জানিয়েছেন (১) এ, ওয়াই, ইয়াকুবভস্কি (A. Y. Yakubovsky), এম, ই, ম্যাসন, (M. E. Masson) এস, পি, টলষ্টভ (S. P. Tolstov) এবং এ, এন, বের্ণস্ট্যাম (A. N. Bernshtam) প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকদের নেতৃত্বেই বিগত পাঁচদশকব্যাপী পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান মূলত মধ্যএশিয়াকে ভিত্তি করে হয়ে চলেছে। উল্লিখিত প্রত্নতত্ত্ববিদদের পরিচালনায় কাস্পিয়ানের বালুচর থেকে তিয়েনশানের হিমবাহ এবং উত্তরে আলাই পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে পামীর প্রায় সমগ্র মধ্যএশিয়ার দশহাজার কিলোমিটার পরিমাণ জায়গাজুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যেসব নিদর্শনের ভেতরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট তাদের ইতিবৃত্ত এখানে বলা হলো।

আয়িরতাম।

আমুদরিয়ার দক্ষিণপাড়ে তেরমেজের (আধুনিককালের দক্ষিণ তাজিকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত) আট মাইল দূরে একটি শান্ত, নিভৃত গ্রাম। এই গ্রামেই সোভিয়েত সীমান্তরক্ষী আই, রিয়াসানভ (I Ryasanov) সতর্ক প্রহরায় ব্যস্ত থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল নদীর স্বচ্ছ জলের নীচে

নকসাকাটা ভাঙ্গা কার্ণিশের একটা টুকরো।

রিয়াসানভের কৌতূহল হলো। সে জলের নীচ থেকে সেই কার্ণিশের ভগ্নাংশ তুলে নিয়ে এসে পাঠিয়ে দিল উজবেকিস্থানের প্রাচীন মন্দির ও শিল্পসংস্কৃতি সংরক্ষণ কমিটির (Uzbekistan committee for the Preservation of monuments of antiquity and arts) কাছে।

এসব ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের কথা।

১৯৩৬ সালে এই কমিটি স্বনামধন্য প্রত্নতাত্বিক এবং মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ এম, ই, ম্যাসনকে (M. E. Masson) দিলেন আম্বিরতামে পুরাতাত্বিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব। এই প্রত্নতাত্বিক অভিযানে নদীর পাড়ের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল ঐরকমই কারুকার্যখচিত কার্ণিশের আরও সাতটি টুকরো।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—কার্ণিশের ওপরে নকসাটা কিসের? পাথরে তৈরী অ্যাকান্থার * (Acantha) পাতার ওপরে নিপুন হাতে খোদাইকরা বলিষ্ঠ যুবক যুবতী এবং মাল্যশোভিত কিন্নর কিন্নরীর অর্দ্ধাংশ। এই নরনারীর মূর্তির গঠনে গ্রীক এবং ভারতীয় শিল্পের সুস্পষ্ট প্রভাব ছাড়াও কুশানযুগের গান্ধার ** শিল্পের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাচীনদিনের কোন অতিকায় সৌধের সেই ভগ্নাংশগুলো (কার্ণিশের টুকরো) যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেই প্রত্নক্ষেত্রের মাটি খুঁড়তেই দেখা গেল, সুবিশাল এক বৌদ্ধমঠের ভগ্নস্তূপ। সেই মঠের গঠন সৌকর্যের এবং সেখানকার আরও অনেক প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনেও গান্ধার শিল্পের ছাপ দেখে পুরাতাত্বিকরা মনে করেন (২) প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের (Firts centuries B. C. to 1st Century A. D.) ভেতরেই অর্থাৎ কুশানযুগেই নিসন্দেহে গড়ে উঠেছিল এই বৌদ্ধ মন্দির।

* ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের এক ধরণের গাছের পাতা; এদের আকৃতি ভালুকের পায়ের মত।

** উত্তর ভারত এবং কাবুলের আশেপাশে কুশানশাসনের সমসাময়িককালের স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির, মঠ এবং রাজপ্রাসাদের গঠনবিন্যাসে ও কারুকার্যখচিত অলঙ্করণের যে শিল্পবৈশিষ্ট্য তারই নামকরণ করা হয়েছে স্থানীয় জনপদের নামে—গান্ধারশিল্প। আফগানিস্থানের একটি অঞ্চলের নাম ছিল কান্দাহার। কান্দাহার থেকে গান্ধার। মনগেট জানিয়েছেন—গ্রীক এবং ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল মধ্যএশিয়ার নিজস্ব এই গান্ধার শিল্প—Central Asian—Indian Variant of Hellenic art (Mongait. Archaeology in U. S. S. R.—P. 280,

বৌদ্ধধর্মের সূত্রেই বলা যায় আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে এই আমুদরিয়া উপত্যকায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৩৬-৩৮ সালে আম্বিরতামের কাছেই তেরমেজে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া গেল কুশানযুগের আরও অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই সূত্রেই নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ই. জি. পেশ্চিলেনের (E. G. Pchelina) তেরমেজের শহরতলীতে কারাটেপ এবং জেঙ্গিস টেপে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বৌদ্ধশ্রমনদের গুহা মঠ (Cavemonastery) আবিষ্কার। এই পার্বত্য প্রত্নক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তর এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পরীক্ষা করে পেশ্চিলেন জানিয়েছেন (৪) এই গুহামঠগুলো তৈরী হয়েছিল খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে।

তেরমেজের এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার পুরাতত্ত্ববিদ্যার সোভিয়েত পণ্ডিতদের মনে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দিল · আবিস্কৃত হলো আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র। সেইসব জায়গার চমকপ্রদ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার আর্কিওলজিতে যুগান্তর সৃষ্টি করল (৪)। আর আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগেই আমুদরিয়া নদী বিধৌত উপত্যকার সঙ্গে গাঙ্গেয়ভূমির নিবিড় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সখ্যতা যে গড়ে উঠেছিল—তারও পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেল।

তেরমেজ প্রত্নক্ষেত্রের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে সাম্প্রতিকতমকালের তথ্য পরিবেশন করেছেন সোভিয়েত ঐতিহাসিক বোর্লনির্তাস্কি এবং ইংরেজ ইতিহাসবিদ এডগার নোব্লক (Edgar knobloch)। পেশ্চলেনের অভিযানের দীর্ঘদিন পরে (১৯৬৪ ৬৬ সালে) প্রত্নতাত্ত্বিক বি. ওয়াই. স্ত্যাভিস্কির (B. Y. Stavisky) নেতৃত্বে তেরমেজে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে তাতে পাওয়া গিয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রাকারবেষ্টিত এক গ্রীক উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ (৫)। তার পাশেই রয়েছে বৌদ্ধমঠ এবং অতিকায় একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ। আর তার চারিদিকের প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে বৌদ্ধশ্রমনদের অস্থায়ী বাসগৃহের (Auxiliary buildings) ভগ্নস্তূপ। নোব্লক জানিয়েছেন কুশানযুগের বৌদ্ধমন্দির, মঠ এবং প্রাসাদের গঠনশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো —সৌধগুলো খণ্ড খণ্ড পাথর কেটে তৈরি এবং তার অলঙ্করনের চমকপ্রদ কারুকার্যে ভারতীয় শিল্পের গভীর এবং অসাধারন প্রভাব—Quite exceptionl

indian charactristic (৭)

আমুদরিয়ার তীরে প্রাচীন জনপদ তেরমেজের বৌদ্ধসংস্কৃতির নিদর্শন ছাড়াও এই অঞ্চলের চারিদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে অনেক ভগ্ন, জীর্ণ প্রাসাদের দেওয়াল চিত্রের (Wall Paintings) টুকরো, কারুকার্যখচিত পলেস্তারার ভগ্নাংশ এবং ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ। (৮)

১৯৩৭ সাল আবার সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

সুগদীয় উপত্যকার বুখারা শহরের উনিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যেখানে আজ গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে কিজিলকুম মরুভূমির অভিশপ্ত-বালির বিস্তার সেখানকার প্রায় দুইশো বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অসুরমুণ্ডের মত অসংখ্য উঁচু উঁচু ঢিবি। ১৯৩৭-৩৯ এবং ১৯৪৭-৫৩ সালে বহুদর্শী প্রত্নতাত্ত্বিক ভি, এ, শিশকিন (V. A. Shishkin) এই স্তূপগুলো খুঁড়ে আবিষ্কার করলেন অনেক নগর ও গ্রামের ধ্বংসাবশেষ, প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সুরম্য প্রাসাদের (Castal) বিচূর্ণিত ভগ্নস্তূপ। (৯) এমন কি গ্রামাঞ্চলের শস্যক্ষেত্রে জলসেচের প্রাচীন কলাকৌশলের চিহ্নও দেখতে পেলেন শিশকিন। তাঁর মনে হয়, ঘনবসতিপূর্ণ এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধ এক বিশাল জনপদের অস্তিত্ব ছিল এখানে।

এই এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র হলো—ভারাক্ষা (Varakhsha)। এখানে প্রায় বাইশ বিঘা পরিমাণ জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক বিশাল রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ। এই ধ্বংসজীর্ণ প্রাসাদের চারিদিকের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সূর্যের তাপে দগ্ধ সরু সরু ইষ্টকনির্মিত পরিখা। এই পরিখার কাছেই শিশকিন পেলেন ওই রাজপ্রাসাদেরই কোন সুরম্য কক্ষের নয়নাভিরাম বিবিধ চিত্রাবলী অঙ্কিত এবং চুনকামকরা পলেস্তারার ওপরে বলিষ্ঠ ও সুবেশ নরনারী, পশু-পাখি, গাছপালা ও দৈত্যদানবের মূর্তি খোদিত (Stucco Carving) দেওয়ালের একটি অতিকায় ভগ্নাংশ।

ভারাক্ষার এই এক্সক্যাভেশান প্রসঙ্গে-ই মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বেলিনিতস্কি (১০) জানিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক এই অভিযানের নেতা

শিশকিনের সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত এক আর্কিটেক্ট বা স্থপতি ভি, এ, নিলসেন। (V. A. Nilsen) মনোরম চিত্রাঙ্কিত এবং নানামূর্ত্তি খোদিত দেওয়ালের খণ্ডাংশ দেখে নিলসেনের মনে হলো—নিশ্চয়ই এই রকমের সুরম্য কক্ষ আরও আছে। মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল আরও তিনটি বিশাল হলঘরের (৩৯ ফিট × ২৬ ফিট) ভগ্নাবশেষ। প্রত্নতাত্বিকরা এই ঘরগুলোর অবস্থান অনুযায়ী নাম দিয়েছিলেন রেডরুম অর্থাৎ লালঘর, ইস্টরুম এবং ওয়েস্টরুম। শেষের এই পশ্চিমমুখী ঘরটির খননকার্য এখনও সমাপ্ত হয়নি। রেডরুম এবং পূর্বদুয়ারী ঘর দুইটির প্রতিটি দেওয়ালই আঠালো রক্তবর্ণে চিত্রিত। আর সেই রক্তিম পটভূমির ওপরে কালো, নীল, সবুজ, সাদা নানারঙে অঙ্কিত চিত্রের বর্ণাঢ্য সমারোহ। কোনখানে সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহন করে সপারিষদ চলেছেন রাজপুত্র মৃগয়ায়। আবার কোন চিত্রে দেখা যায় গভীর অরণ্যে ঘনসন্নিবদ্ধ নিবিড় সবুজ তরুশ্রেণীর নীলাভ ছায়ায় শিকারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন শিকারী আবার কোথাও মত্ত উল্লাসে আর হিংস্র আক্রোশে চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাতীর ওপরে।

মহাকাল দেওয়াল-চিত্রগুলোকে জীর্ণ করেছে। করেছে মলিন। তবুও চিত্রের বলিষ্ঠ ও কমনীয় নরনারীর দেহরেখা এবং সবুজ অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়াভাস ঘোষনা করছে বিস্মৃতকালের শিল্পীদের অসাধারন নৈপুণ্য!

কিজিলকুম মরুভূমির পূর্বপ্রান্তে ভগ্ন, বিলুণ্ঠিত এই বিশাল রাজপ্রাসাদের গঠনশৈলী এবং তার কারুকার্যমণ্ডিত অলঙ্করণ এবং বিবিধ নিদর্শন পরীক্ষা করে অধ্যাপক শিশকিন জানিয়েছেন, আরবিয় অভিযানের আগে (৭ এবং ৮ খৃষ্টাব্দ) বুখারা অধিপতি বা বুখারা খুদতসের এই প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল। আর আর্কিওলজি ইন, ইউ, এস, এস, আর গ্রন্থটির লেখক আলেকজান্দার মনগেট বলেছেন (১১) It (Varakhsha) was the Capital or Pre-Islam rulers of Bukhara regicn. শিশকিন প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদ্যার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মধ্যযুগে (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) সামানিদদের (আমুদরিয়া উপত্যকার এক প্রাচীন রাজবংশ,) আক্রমনে ধ্বংস হয়ে যায় ধনজনে সমৃদ্ধ এই সুবিশাল জনপদ। কালক্রমে মরুভূমির অন্তহীন বালুকারাশি গ্রাস করে একদা গৌরবোজ্জ্বল এবং অসংখ্য নরনারীর কলরবে মুখরিত ভারাক্ষা রাজ্য।

স্থাপত্যবিদ্যার পণ্ডিত নিলসেন জানিয়েছেন রাজপ্রাসাদটির গঠনসৌকর্য ও

বিচিত্র সাজসজ্জা ভারতীয় এবং পারসিক শিল্পের প্রভাব মিশ্রিত সুগ্দীয় (পারসিক সম্প্রদায়েরই আরও উন্নত সভ্যতার অধিকারী মধ্যএশিয়ার একটি প্রাচীন জাতির।) শিল্পের স্বাক্ষর। হিন্দুকুশের উত্তর সীমান্ত থেকে সমগ্র আমুদরিয়া উপত্যকা এবং হয়তো পারস্যের উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত—পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা বাস করতো) শিল্পশৈলীর এক চমকপ্রদ নিদর্শন: Wonderful monument of Sogdian art in which Considerable ties with the art of India and Iran (১২)

. মধ্যএশিয়ার প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে সুপ্রাচীনকালের মহানগর পেন্দাজিহি কেন্তেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

আধুনিককালের সমরখন্দের উপকণ্ঠের (চল্লিশ মাইল পূর্বে) মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় দুই হাজার বছর আগের বিশাল এক নগর পেন্দজিহিকেন্তের বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ।

১৯৪৬ সালে এখানে ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজি অফ দি সোভিয়েত একাডেমি অফ সায়ান্স (Institute of Archaeology of the Soviet Academy of Science), ইনস্টিটিউট অফ হিষ্ট্রি অফ দি তাজিক একাডেমী অফ সায়েন্স (Institute of the Tazik Accademy of Science) এবং হারমিটেজ মিউজিয়ামের (Hermitage Museum) যৌথ প্রচেষ্টায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এ, ওয়াই ইয়াকুবভস্কির (A. Y. Yakubovsky) নেতৃত্বে শুরু হয় পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। (১৩)

এখানে দীর্ঘদিনব্যাপী নিরলস খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়েছে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসজীর্ণ একটি পরিখা, পেন্দাজিহিকেন্তের এলাকার অন্তর্ভুক্ত ঘন-জনবসতিপূর্ণ নগর শাহিরিস্থানের এবং একটি সমাধিক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ।

আয়তকার এবং সরু সরু ইষ্টকনির্মিত এক একটা দ্বিতলগৃহের বিচূর্ণিত অস্থিপঞ্জর, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মহার্ঘ রক্তিমাভ প্রস্তরের কর্ণাভরণ, নীলকান্তমণির অঙ্গুরী, মূল্যবান মনিখচিত কণ্ঠহার এবং বলয় ইত্যাদি অলঙ্কার ও নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিঃসন্দেহে এখানকার অধিবাসীদের আর্থিকসমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে।

এখানকার নানাবিধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ধ্বংসজীর্ণ প্রাসাদের গঠন-বিন্যাস পরীক্ষা করে ইয়াকুবভস্কি এবং এই অভিযানে তাঁর সহযোগী স্থপতি

বিদ্যার বিশেষজ্ঞ ভি, এল, ভরোনিনা (V. L. Voronina) জানিয়েছেন ধনধান্যে সমৃদ্ধ এই মহানগরী খ্রীষ্টীয় পঞ্চম কি ষষ্ঠশতকের।

আর দুই হাজার বছর আগেও এই জনপদের অধিবাসীরা যে হিন্দুসংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা, ভারতীয় রূপকথা, লোকগাথার সঙ্গে পরিচিত ছিল তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাসাদের বিভিন্ন সুরম্য কক্ষের দেওয়ালে অঙ্কিত ধূর্ত সেই শশকের বাকচাতুরীতে মুগ্ধ হয়ে নিজের প্রতিবিম্বকে শত্রু মনে করে অত্যাচারী সিংহের কূপে ঝম্ফপ্রদান—পঞ্চতন্ত্রের সেই বিখ্যাত গল্প এবং জাতকের বিভিন্ন গল্পের নিখুঁত ও বর্ণাঢ্য চিত্র। (১৪)

শুধু যে ভারাক্ষা এবং পেন্দজিহিকেন্তের প্রাচীন এবং উন্নত ও সভ্য জনপদ জীবনের সঙ্গে-ই ভারতীয় সংস্কৃতির নিবিড় সখ্যতা বন্ধন ছিল তা নয়—মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের যাযাবর জাতির উদ্দাম ও স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর অজানা ছিল না যে হিন্দুকুশের ওপারে গাঙ্গেয়ভূমিতে বিবিধ মহার্ঘ রত্ন ও মণি মুক্তা এবং রক্তিমাভ বা নীলবর্ণ প্রস্তর ইত্যাদি বিলাসের সামগ্রীর অস্তিত্ব, তারও পাথুরে প্রমান পেয়েছেন বহুদর্শী প্রত্নতাত্ত্বিক এ, এন, বের্ণস্ট্যাম (A. N. Bernshtam)। (১৫)

১৯৫০-৫১ সালে বের্ণস্ট্যামের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দুর্লভ্যপামীরের একটী অঞ্চলে যাযাবর উপজাতিদের কবরভূমিতে থমকে দাঁড়ালো। সমাধিভূমির পাশেই তাদের বাসগৃহের ভগ্নস্তূপের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল—কতগুলো চমকপ্রদ ও বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—পাহাড়ের উপত্যকায় অজস্র পাথরের নুড়ি ছড়ানো তাদের গ্রামের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে পাওয়া গেল দেওদার কাঠের তৈরি তীক্ষ্ণধার তীর এবং ধনুক। হিন্দুকুশের দক্ষিণে পাহাড়ের ঢালুতে ছিল নিবিড় দেওদারবীথি। বের্ণস্ট্যাম মনে করেন—এখানকার অধিবাসীরা দেওদার কাঠ নিয়ে আসতো হিন্দুকুশ থেকে। কবরভূমিতে খননকার্যের ফলে দেখা গেল—প্রস্তরীভূত মৃতদেহের কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে মহার্ঘ ধূসর সবুজবর্ণ পাথরের পুঁতির মালা। আবার কারো বাহুতে, কারো কণ্ঠে কালের ব্যবধানকেও অগ্রাহ্য করে ঝকমক করছে হীরকখচিত রক্তিমাভ প্রস্তরের পুঁতির অলঙ্কার (ornaments of diamond-drilled Cornelian beabs)। স্টেটাইট বীডস (Steatite beads) বা ধূসর সবুজ প্রস্তরের পুঁতি আসতো বৈকাল-হ্রদের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আর ডায়মণ্ড-ড্রিলড কর্ণেলিয়ান বীডস নিয়ে

—২

আসতো ভারতবর্ষ থেকে। (১৬) এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে আভাস পাওয়া যায়, এই দুর্গম পার্ব্বত্য ভূখণ্ডের যাযাবর আদিবাসীদের সঙ্গে গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং আমুদরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ছিল নিবিড় যোগসূত্র।

কিন্তু এই যাযাবর কারা ? স্বভাবতই এ-সম্বন্ধে কৌতূহল হয়। উপরোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সূত্রেই বের্ণস্ট্যাম জানিয়েছেন, শুধু পামীরে নয়, আলতাই পর্ব্বতের পশ্চিম দিক থেকে পামীর মালভূমি এবং সেমিরিচ (Semirechye) অর্থাৎ বলখাসহ্রদের দক্ষিণে সপ্তনদীর দেশ থেকে পূর্ব তুর্কীস্থানের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে (৪০,০০০ কি, মি) বাস করতো যে যাযাবর সম্প্রদায় তারা—

শক। (১৭)

শকদের সঙ্গে কিছু জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ছিল সুগ্দীয়দের।

শক-অধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চলটিতেই পরবর্তীকালে এক্সক্যাভেশন করে বের্ণস্ট্যাম এবং তাঁর সহযোগী বি, এ, লিতভিনিস্কি পেলেন আরও অনেক চমকপ্রদ নিদর্শন—কারুকার্য মণ্ডিত মৃৎভাণ্ডের ভগ্নাংশ, অস্ত্রশস্ত্র, অ্যাকিনেক (সুগ্দীয় তলোয়ার) রনকুঠার (battle-axe) ব্রোঞ্জ, কিম্বা লৌহ বা কোন প্রাণীর অস্থি-নির্মিত তীরের ফলক। আবার গ্রীফিন অর্থাৎ ঈগল পাখির মত মস্তক ও পক্ষ কিন্তু সিংহতুল্য দেহ বিশিষ্ট রূপকথার সেই বিচিত্র কল্পিত প্রাণীর মূর্তি খোদিত ব্রোঞ্জ নির্মিত কলস এবং লৌহনির্মিত ছুরিকার হাতলে নিপুণ হাতে খচিত করা হয়েছে এক পাহাড়ী মেষের পূর্ণাবয়ব। (১৮)

এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিক বের্ণস্ট্যাম এবং তার সহযোগী পুরাতত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত বি, এ, লিতভিনস্কি (B. A. Litvinsky) জানিয়েছেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ভেতরে শক সম্প্রদায় কারুকার্যমণ্ডিত বিচিত্র শোভাময় লৌহ এবং ব্রোঞ্জের সম্ভার রচনার মত উন্নত এক শিল্পনৈপুণ্যও আয়ত্ত করেছিল। আর পামীর এবং তিয়েনশান গিরিমালার সহস্র গুহাকন্দরের যাযাবর আদিবাসীদের প্রস্তরীভূত মৃতদেহের আভরণে ভারতীয় রত্নের 'সমাবেশে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটি বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্য—প্রায় দুহাজার বছর আগে থেকে গাঙ্গেয়ভূমির সঙ্গে এখানকার অধিবাসীদের ছিল বাণিজ্যিক সখ্যতা। (১৯)

প্রথম অধ্যায়ে-ই আলোচিত হয়েছে, স্মরণাতীত কাল থেকেই হিমালয়ের পরপ্রান্তবর্তী মধ্যএশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম

ভারতের যোগসূত্র ছিল—The region beyond Himalayas was never isolated from india (২০), আবার মধ্যএশিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পামীরের পার্ব্বত্য অঞ্চল সন্নিহিত যাযাবর আদিবাসীদের সঙ্গে উত্তর ভারত তথা পাঞ্জাবের বাণিজ্যিক সখ্যতা ছিল সেই সিন্ধুসভ্যতার যুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে থেকে।

তারপরে কালে কালে এপার গঙ্গায় ওপার আমুদরিয়ায় যত স্রোত গড়িয়ে গিয়েছে, যত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে দুই সুপ্রাচীনকালের ভূখণ্ডের সৌহার্দ্যবন্ধন একটু একটু করে পুষ্ট হয়েছে। দৃঢ় হয়েছে।

স্বভাবতই মনে একটি প্রশ্ন জাগে, কবে প্রথম মধ্যএশিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। চীনা ইতিহাসে জানা যায়—The first country of Central Asia on the threshold of Indian culture was Tokharistan. (২১) আমুদরিয়ার বদ্বীপ থেকে দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন রাজ্য তোখারিস্থানেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম তথা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে—এবং ভারতবিদ্যার বিশেষজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত ফুশে (Foucher) এই তথ্যটি-ই জানিয়ে আরও বলেছেন The trade of tarnslator of saered texts and pedlar or maker of images was practised in the second and third centuries *B.* C. mainly by Bactrians and Sogdians (২২) অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকে ব্যাক্ট্রিয়ার (আধুনিক উজবেকিস্থানের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তর আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী প্রাচীন রাজ্য) এবং সুগদের (আমুদরিয়ার দক্ষিণসীমা থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মধ্যএশিয়ার প্রাচীন রাজ্য) * বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত অধিবাসীরা সুগদীয়, তুখার এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ করতে শুরু করেছিল। কারুশিল্পীরা নিপুণ হাতের ছন্দে যতিতে রচিত করেছিল এক একটি অপরূপ মূর্তি (বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক তথা ভগবান তথাগতের মূর্তি)।

দিনে দিনে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। সমগ্র মধ্যএশিয়ার মাটি প্লাবিত হয়ে যায় বৌদ্ধসংস্কৃতির বন্যায়। তাই সাম্প্রতিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নিদর্শনের ভেতরে একটা বড় অংশ জুড়ে

---

* খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্যাক্ট্রিয়া এবং সুগদ, দুইটী রাজ্যই তোখারিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রয়েছে বৌদ্ধ বিহার এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। One of the major events of Central Asian archaeology in the recent years has been the discovery of Buddhist shrines. (২৩)

১৯৫৩-৫৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক এল, আর, কিজলাসভ (L. R. Kyzlasov) আবিষ্কৃত আক-বেসিমের (২৪) (আধুনিককালের কিরঘিজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানী ফ্রুঞ্জের এগারো মাইল পশ্চিমে) খ্রীষ্টিয় সপ্তম এবং অষ্টম শতকের বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নস্তূপ ; এই মন্দিরের পাশেই আর একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ, (পুরাতত্ত্ববিদ এল, দি জিয়াব্লিন আবিষ্কৃত) (২৫) ; ১৯৫৭-৫৮ সালে ফেরগানা উপত্যকার (উজবেক) কুভায় (২৬) প্রত্নতাত্ত্বিক লেভিনা বুলাটোভা (Levina Bulatova) আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে বোধিসত্ত্বের একটি অতিকায় মূর্তি (যার বুড়ো আঙুল একটী পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের মত দীর্ঘ) আর নানাবিধ দেবদেবী ও দৈত্যদানবের ভগ্ন ও জীর্ণ কবন্ধ মূর্তি এবং মহাযান বৌদ্ধশিল্পের আরও অনেক নিদর্শন এবং ১৯৬০ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে উদ্‌ঘাটিত তাজিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আড়জিনা টেপে (২৭) (কুরগান তায়ুব শহরের এগারো মাইল পূর্বে ভক্ষ উপত্যকায়) ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতকের (খ্রীষ্টাব্দ) একহাজার বর্গফুট জুড়ে সভাকক্ষ, শ্রমনদের শয়নকক্ষ (Monk Cells) এবং বিশাল একটি স্তম্ভ সমন্বিত এক বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ নিঃসন্দেহে পাথুরে প্রমাণ বহন করছে রুশ ঐতিহাসিক বাটর্ ডোরজ বারাজভের (Baatr Dorj Barazov) এই উক্তি—All these··· go to prove that Bubbhism was widespread on territory of what is now Soviet Central Asia. where it had made its way from India in the early centuries A. D. (২৮)

কিন্তু শত শত বছর ধরে মধ্যএশিয়ার সহস্র গিরিগুহাকন্দরে, বিভিন্ন জনপদে পথেপ্রান্তরে বৌদ্ধ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন কি শুধু বৌদ্ধশ্রমণরা-ই ?

না। স্মরণাতীতকাল থেকেই বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের সঙ্গে উত্তুঙ্গ পর্বতের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে দিগন্তবিসারী মরুভূমির অন্তহীন বালুকাবিস্তার পেরিয়ে যেত আর এক শ্রেণীর দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী মানুষ—সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক।

উত্তর ভারতের সওদাগররা উট বা ঘোড়ার পিঠে পণ্যসম্ভার চাপিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে দূর-দুর্গম বক্ষুনদীর (আমুদরিয়া) দেশে পাড়ি দিতেন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যে গিরিগুহায় কিম্বা যে জনপদে তাঁরা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করতেন অথবা স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলতেন সেইখানেই হয়ে উঠতো ধর্মচর্চা এবং ব্যবসাকেন্দ্র। সেই জনপদেই ছড়িয়ে দিতেই নিজেদের শিল্প আর সংস্কৃতি, ধর্ম আর ধ্যান ধারণা। তাই দেখা যায়, একদা ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে-ই পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির অজস্র নিদর্শন। আর বৌদ্ধশ্রমণদের সহযাত্রী সার্থবাহদের আনাগোনার অকাট্য প্রমাণ হলো, ব্যবসা বানিজ্যে সমৃদ্ধ এক একটি নগরের এবং তার সন্নিহিত বৌদ্ধবিহারের ভগ্নস্তূপগুলো মধ্যএশিয়ার প্রধান বাণিজ্য-পথের (Trade route) দুই পাশে। এই পথটি ছিল ভূমধ্যসাগরবর্তী এশিয়ামাইনরের প্রাচীন রাজ্য সিলিসিয়া থেকে ইরানের ভেতর দিয়ে কাস্পিয়ানের দক্ষিণতীর ধরে আমুদরিয়া-সিরদরিয়ার অববাহিকায় তাসখন্দ সমরখন্দ পেরিয়ে তাকলামাকান মরুভূমির ওপর দিয়ে চীন পর্যন্ত প্রসারিত। এই ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথটির নাম গ্রেট সিল্ক রুট (Great silk route)। এই পথেরই একটী দক্ষিণমুখী শাখা তাসখন্দ থেকে দক্ষিণ পামীরের গিরিপথ বামিয়েনের ভেতর দিয়ে কাবুল উপত্যকা এবং খাইবারের ভেতর দিয়ে সিন্ধুপ্রদেশ হয়ে চলে এসেছিল তক্ষশিলা পর্যন্ত। (২৯)

বলাবাহুল্য, এই অধ্যায়ে আলোচিত আমুদরিয়ার তীরে তেরমেজ, কিজিলকুম মরুভূমিতে ভারাক্সা, সমরখন্দের উপকণ্ঠে পেন্দজিহিকেন্ত প্রায় প্রতিটি প্রত্নক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে সিল্করুটের সন্নিহিত অঞ্চলে। এইসব জনপদে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে কী প্রবলভাবে বৌদ্ধধর্মানুশীলন এবং কী সুষ্ঠু পন্থায় ধর্মপ্রচার হতো তার প্রমাণ পেন্দ-জিহিকেন্তে বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে পাওয়া গিয়েছে সুগ্দীয়, তুখারা, কুচীয় এবং অধুনালুপ্ত মধ্যএশিয়ার আরও অনেক আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের রাশিরাশি পাণ্ডুলিপি। (৩০)

শুধু পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি নয়। এই আমুদরিয়া উপত্যকার নানা জায়গায় বৌদ্ধভিক্ষুদের বিখ্যাত কেন্দ্রগুলোর ধ্বংসস্তূপের ভেতরে, ব্রাহ্মী-

লিপিতে লেখা শিলালিপি এবং তাম্রলেখও পাওয়া গিয়েছে। এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মীলিপি—গান্ধের উপত্যকারও প্রাচীন লিপি।

সেকালে ভারতবর্ষ থেকে মধ্যএশিয়ায় যাওয়ার সবচাইতে প্রশস্ত পথ ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার) থেকে কুভা (কাবুলনদী) পেরিয়ে কপিশা (আফগানিস্থান) হয়ে অতিক্রম করতে হতো হিন্দুকুশের গিরিপথ—বামিয়েন। (চীনা বিবরণে আছে—বাম-ইয়েন-না অথবা বামিয়েন)। যাতায়াতের পথের ওপর বলেই বামিয়েন হয়ে উঠেছিল যেমন হিন্দুকুশে উত্তরে সুগদ, পারশ্য, সমরখন্দের তেমনি ভারতীয় বণিক ও ধর্মযাজকদের স্থায়ী বা অস্থায়ী উপনিবেশ। আর এইখানে তারা ছড়িয়ে রেখেছিল ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধসংস্কৃতির অজস্র স্বাক্ষর। বামিয়েনে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পরে (১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে এইসব বিস্ময়কর নিদর্শন। (৩১) পূর্ব-পশ্চিম হিন্দুকুশে পর্বতগাত্রে নিপুণ ছন্দে যতিতে খোদাই করে নির্মিত করেছিল ১৫০ ফিট দীর্ঘ এক বুদ্ধমূর্তি। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বৌদ্ধভিক্ষুদের নির্জনে সাধনা ও অধ্যয়নের জন্য অসংখ্য গুহামন্দিরের প্রতিটি দেওয়ালে বিস্মৃতকালের শিল্পীরা অজন্তার অনুকরণে অঙ্কিত করেছিল হিন্দুর দেবদেবীর অপরূপ এক একটি মূর্তি। মন্দির গাত্রের চিত্রাবলীতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বিবিধ দেবদেবীর অঙ্কনবিন্যাসে, কারুকার্য এবং অলঙ্করণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে শক ও কুশান শিল্পশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব। সপ্তঅশ্ববাহী রথারূঢ় সূর্যদেবের দেহ সৌষ্ঠবে শক কুশানদের ছাপ; কিন্তু তাঁর পরিধানে উত্তরভারতের মত আজানুলম্বিত বুটিদার পোষাক যেমন আছে তেমনি আছে দেওয়ালে, কুলুঙ্গিতে তথাগত বুদ্ধমূর্তির ওপরে, নীচে, পাশে ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং নানাবিধ হিন্দুদেবতার বর্ণাঢ্য চিত্র।—এসব তথ্য জানিয়ে নোব্লক (Knobloch) জানিয়েছেন—Frescos and Statues on the walls of Bamian, which has a distinct Indian Influence can be dated as third to fourth centuries A. D. (৩২) আবার চীনের পশ্চিম সীমান্তে সহস্রবুদ্ধের গুহামন্দিরে (Caves of thousand Buddhas) এবং অজন্তার অনুরূপ বামিয়েনের প্রাচীর চিত্র ও ভাস্কর্য বলে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন—এখানকার শিল্প ও ভাস্কর্য পঞ্চম থেকে ষষ্ঠশতকে

গড়ে উঠেছিল।

শুধু শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন-ই নয়। ভারতীয় ধর্ম আর সংস্কৃতি আমুদরিয়ার দুই তীরের প্রাচীন জনপদ থেকে হিন্দুকুশের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র মধ্যএশিয়ার দূরবিস্তীর্ণ অঞ্চলেই যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার বাস্তবতম প্রমাণ হলো—১৯৩০ সালে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ আঁকা (Hackin) আবিষ্কৃত বামিয়েনের গুহামন্দিরের ব্রাহ্মী ও সংস্কৃত এবং সুগ্দীয়, খোটানী ইত্যাদি মধ্যএশিয়ায় তদানীন্তনকালে প্রচলিত ভাষায় লেখা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পুঁথি।

বামিয়েন ছাড়া মধ্যএশিয়ার উত্তরসীমান্তে প্রাচীন রাজ্য কুচীতে (Kuchi) কর্ণেল বোয়ের আবিষ্কৃত (১৮৯০ খ্রীঃ) কুচীয় ভাষায় অনূদিত ভারতীয় আয়ুর্বেদ গ্রন্থের ভগ্নাংশ, তুর্ফান, (তুর্কীস্থান) কুচী এবং কিজিলের ধ্বংসস্তূপে সুগ্দীয়, চীনা, সংস্কৃত, পারসিক এবং সিরিয়াক ভাষায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রুয়েনওয়েডেল আবিষ্কৃত); ১৯০৬-৮ খ্রীষ্টাব্দে অরেল ষ্টেইন এবং পল পেলিও আবিষ্কৃত দক্ষিণচীন সীমান্তে তুন্-হোয়াং-এর সহস্র বুদ্ধের মন্দিরের (cave of the thousand Buddhas) মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রায় ১৫০০০ পুঁথি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে সেই ঐতিহাসিক সত্য—হাজার হাজার বছর আগে মধ্যএশিয়ার এক একটি জনপদে কি গিরিগুহাকন্দরে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মযাজক এবং পণ্ডিতরা মিলিত হতেন। চলতো ধর্ম আলোচনা। সেই সঙ্গে চলতো স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদের কাজ (৩৩)। বলা বাহুল্য, তাদের কার্যক্রম শুধু বিদ্যাচর্চার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকতো না। তাদের সেই স্থায়ী বা অস্থায়ী উপনিবেশের চারিদিকে ছড়িয়ে দিতেন নিজেদের শিল্প আর ভাস্কর্য্য, সংস্কৃতি আর ধ্যানধারণা। যুগযুগান্তরব্যাপী শক, হূন, গ্রীক, সুগ্দীয় আরও অনেক জাতির শোনিত-সমন্বয় এবং সংস্কৃতিসমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মধ্যএশিয়ার নিজস্ব একটি শিল্প-সংস্কৃতি (৩৪)। এই তথ্যটি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত অনেক ধ্বংসজীর্ণ প্রসাদের এবং মন্দিরের গঠনসৌকর্য এবং কারুকার্য ও অলঙ্করণের বিস্তারিত আলোচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ভারত ও রুশ সভ্যতার ইতিহাস কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। বহুদর্শী সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিক এস, পি, টলষ্টভ (S. P. Tolstov) জানিয়েছেন (৩৫) আয়িরতাম-তেরমেজ, ভারাক্সা, পেন্দজিহিকেন্ট ইত্যাদি প্রত্নক্ষেত্রগুলোতেই বারে বারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিত্য নতুন আরও চমকপ্রদ নিদর্শন পাপয়া যাচ্ছে। যেমন ১৯৬৯ সালে প্রাচীন জনপদ তেরমেজের উপকণ্ঠে আয়িরতামে বা কারাটেপে স্ত্যাভিস্কি পেয়েছেন, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ ধরণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ (৩৬)।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের পদধূলিরঞ্জিত প্রাচীন নগর তেরমেজ সমরখন্দ থেকে বলাখ (ব্যাক্ট্রিয়া) হয়ে ভারত পর্যন্ত প্রসারিত পথের (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ সিল্করুটের অংশ) পাশে অবস্থিত ছিল এবং এখানে সুগ্দীয়, ভারতীয় এবং চীনা সওদাগরদের 'কাফিলা' (ক্যারাভান) যে ক্ষণকালের জন্য থেমে বিশ্রাম করতো তারও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত পুগাচেঙ্কোভা (১৯৬৭ সালে)। পেন্দজিহিকেন্তে প্রথম অনুসন্ধানের (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) ষোল বছর পরে আর এক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে বেলিনিতস্কি এখানকার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে নটরাজ শিবের মূর্তি অঙ্কিত দেওয়ালগাত্রের একটি ভগ্নাংশ (৩৭)।

আমুদরিয়ার দক্ষিণতীরে বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালির ভেতরে যেখানে পনে-জনে সমৃদ্ধ খোয়ারিজম রাজ্যের রাজপ্রাসাদের বিশাল ধ্বংসস্তূপ সেইখানে বহুদর্শী প্রত্নতাত্ত্বিক টলষ্টভ আবিষ্কার করেছেন ঘনকৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠদেহী সশস্ত্র যোদ্ধার মূর্তি। টলষ্টভ মনে করেন, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকে খোয়ারিজমের সম্রাটদের সৈন্যবাহিনীতে ভারতের দক্ষিণদেশের কিছু কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় অধিবাসীও ছিল—Khorezmian troops at that time included South Indians. (৩৮)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার নিষ্ঠাবান পণ্ডিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে নিরলসব্রতী টলষ্টভের বিশ্বাস (৩৯)—কিজিল-কুম, কারাকুম আর তাকলামাকানের মরু-ভূমির বালিতে, হিন্দুকুশ পামীরের গিরিগুহায় এমন অনেক ধ্বংসস্তূপ আছে যার খননকার্য এখনো শুরুই হয়নি; এমন অনেক শিলালেখ, তাম্রশাসন এবং প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে যার পাঠোদ্ধার করা যায়নি আজও—

এসব কাজ সম্পন্ন হলে যে শুধু ভারত ও সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার স্মরণাতীত কালের সৌহার্দ্যের আরও অনেক স্বাক্ষর পাওয়া যাবে তা নয়—আমাদের অতীতপুরুষদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফসল—অতুলনীয় শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্যের এবং আরও অনেক চমকপ্রদ কীর্তির নিদর্শন উত্তরকালকে প্রেরণা দেবে রচনা করতে—সুখ শান্তি-সৌহার্দ্য ভরা এক নতুন পৃথিবী—এক—নতুন সভ্যতা। (৪০)

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি	পৃষ্ঠ
(১) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexander.	২৬৩
(২) Ibid Ibid.	২৮০
(৩) Central Asia, Alexander Belinitsky.	৯৯
(৪) Beyond the Oxus. Edgar Knobloch.	১৮৭
(৫) Ibid — Ibid —	১৮৭
(৬) Ibid — Ibid —	১৮৭
(৭) Archaeology in Soviet Central Asia by Gregorie Frumkin in Central Asiatic Review (1970)	১১০
(৮) Beyond the Oxus. Edgar Knobloch.	১৮৮
(৯) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexander.	২৮৭-৮৯
(১০) Central Asia. Belinitsky. Alexr.	১৪২-৪৪
(১১) Archaeology in U.S.S.R. Mongait. Alexr.	২৮৮
(১২) Ibid — Ibid —	২৮৯
(১৩) Archaeology in U.S.S.R by G. Frumkin in C.A.R. (1970)	৭৬-৭৭
(১৪) Central Asia. Belinitsky Alexr.	১৫৪-৮৮
(১৫) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexr.	২৯৯
(১৬) Ibid — Ibid	৩০০
(১৭) Bernshtam. A.N. Results of excavations in Tien-shan Pamir' Altai. as quoted in Mongait's Archaeology in U.S.S.R.	৩০৯

(১৮) Central Asia. Belinitsky Alexr. ৫৬-৫৭

(১৯) Archaeology of Central Asia.—The Deltas of the Oxus and Jaxartes. G. Frumkin in C.A.R. (1965) ৭৩

(২০) India and Central Asia. P. C. Bagchi. ১১৬

(২১) India and Central Asia. P. C. Bagchi. ১৯

(২২) Buddhism in Afganisthan and Central Asia. Simmone Gaulier, Robert Bezard and Monique Maillard. ৩৪

(২৩)-(২৬) Central Asia. Belinitsky Alexr. ১৩৭-১৩৯

(২৭) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ১৯২-৯৩

(২৮) Buddhism in U.S.S.R. Baatri Dorj Barazov. ২১

(২৯) Erythraean Sea. Periplus. ২৬৮

(৩০) Central Asia. Belinitsky Alexr. ১৮৫

(৩১) Beyond the oxus. Knobloch Edgar. ২৮৩

(৩২) Ibid — Ibid — ২৪১

(৩৩) ভারত ও চীন, প্রবোধ বাগচী ১০-১১

(৩৪) Central Asia. Belinitsky Alexr. ২১৬

(৩৫) Archaeology in U.S.S.R.—Deltas of Oxus. G. Frumkrin in C.A.R. (1965) ৬৯-৭৩

(৩৬) Archaeology in U.S.S.R. G. Frumkin in C.A.R. (1970) ১১১-১২

(৩৭) Ibid — Ibid — ১১০

(৩৮) Archaeology in Soviet Central Asia. G. Frumkin in C.A.R. (1965) ৭৮

(৩৯) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexr. ৩০৮

(৪০) Archaeology in Soviet Central Asia. G. Frumkin in C.A.R. (1965) ৭০-৭১

তিন

ডেরিয়াস : ভারত-রুশ মৈত্রীর প্রথম পথিকৃত

শুধু ভারত-রুশ নয়। যে কোনো দুটো দেশের সখ্যতাবন্ধনের ইতিহাস রচনা করতে হলে, আমার মতে সে-দুটো দেশের মানুষের পরস্পরের ভেতরে সামাজিক সম্পর্কের কথা আগে ভাবতে হয়।

একথা অনস্বীকার্য, এক দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা আর এক দেশে নিয়ে গিয়েছে প্রাচীন দিনের বণিকরা। আর প্লিনি থেকে শুরু করে হেরোডাটাস, পৃথিবীর স্বনামধন্য প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকরা অন্তত এই একটি বিষয়ে একমত হবেন যে—মানব সমাজের ইতিহাসের শুরু (মাত্র খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০০ বছর আগে)* থেকে মানুষের আদিমতম জীবিকা হলো ব্যবসা। তাই আমুদরিয়া উপত্যকার প্রাচীন দিনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এডগার নো ব্লক স্পষ্টই বলেছেন (১)—Long before the Frist Caravan set out to exchange the products of one established and settled civilisation for those of another, the nomad hardsman of North had been trading in the same way…সেই সুদূর স্মরণাতীত কাল থেকে একটা সভ্যদেশের পণ্যবাহী প্রথম যে 'কাফিলা' (ক্যারাভান) আর একটা দেশের সঙ্গে পণ্যের আদান-প্রদান করেছিল তার বহু-বহু যুগ আগে উত্তরের (সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি) সেই রাষ্ট্রহীন, গৃহহীন যুথচারী মানুষও ব্যবসা করতো।

---

* Man started writing only 6000 B.c. age. অর্থাৎ মানুষ লিখতে শুরু করেছে মাত্র খ্রীষ্টের জন্মের ছয় হাজার বছর আগে। এই সময় থেকেই মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ। তার পূর্বকালটা হলো প্রাগৈতিহাসিক—Mazour, Anatola. Man and Nations. World History. P-12

মানুষের সর্ববিধ জীবিকার ভেতরে ব্যবসা যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তারও আরও ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। প্রমাণ আছে—স্বার্থবাহদের (বণিক) সহযাত্রী হয়েই দুঃসাহসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরা, অন্যান্য ধর্ম প্রচারকরা, পরিব্রাজকরা, বিপদসঙ্কুল দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করতো। সুদীর্ঘ সেই পথের মাঝে মাঝে সমৃদ্ধিশালী জনপদের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে তারা কিছুকালের জন্যে অবস্থান করতো, করতো তাদের পণ্যের আদান-প্রদান। কোনো কোনো সময় বণিকরা সেই ব্যবসাকেন্দ্রের শহরে স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে তুলতো। বণিক, ধর্মপ্রচারক, পরিব্রাজকদের সঙ্গে শিল্পীরাও যেত সেই দূরদূরান্তরের বিভিন্ন দেশে।

বলাবাহুল্য সেই দুঃসাহসী সওদাগরদের পণ্যবাহী 'কাফিলা' এবং তাদের সহযাত্রী বৌদ্ধভিক্ষুরা বা ধর্মযাজকেরা দিগন্তবিসারী মরুভূমির বালুকাপ্রান্তর ও উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণীতে কণ্টকাকীর্ণ সেই দুর্গমপথে চলার ক্লান্তিতে, অবসাদে তীব্র আকণ্ঠ তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়তো। তখন তারা ব্যাকুল হয়ে ভাবতো—দূরে—আর কতদূরে গেলে পাওয়া যাবে মরুদ্যানের স্নিগ্ধ নীলাভ ছায়ায় ঘেরা জনবসতি, যেখানে আছে মিষ্টি জলের কুয়ো, আছে একটু হাত-পা ছড়িয়ে জিরানোর জন্য পান্থশালা বা ক্যারাভানসরাই।

ভারত থেকে হিন্দুকুশ ও পামীর ডিঙ্গিয়ে আমুদরিয়া উপত্যকার দেশগুলিতে যেতে শিরদরিয়ার জারাফশানের (আমুদরিয়ার উপনদী) ভাটিতে আমুদরিয়ার উপত্যকায় এবং তাকলামাকান কিম্বা গোবি মরুভূমির উত্তরে দক্ষিণে মরুদ্যানের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় সমৃদ্ধ অনেক জনপদ ছিল, এইসব জায়গায় ছিল কুয়ো—ছিল ক্যারাভানসরাই। এই 'ওয়েসিস' বা মরুদ্যান অঞ্চল প্রসঙ্গে নোরক জানিয়েছেন (২)—These (oasis) Provibed nccessary halts with wells and Caravanserais…

একথা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য, মরুদ্যানের সন্নিহিত অঞ্চলের জনপদগুলি হয়ে উঠতো ব্যবসাবাণিজ্যে জনবহুল এক একটা নগর। সেই সুপ্রাচীনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই এই শহরগুলো ছিল এক একটা Trade Center বা ব্যবসাকেন্দ্র। এই ট্রেড সেন্টারগুলো ছিল সে যুগের Embassy দূতাবাস এবং ইনফরমেশান সার্ভিস। তার কারণ, দেশদেশান্তরের বণিকদের তাদের পণ্যের আদানপ্রদানের জন্য দীর্ঘদিন

একই সরাইখানায় পাশাপাশি বাস করতো হতো একমাস কি দুইমাস। সময়-সময় দুই তিন বছরও পেরিয়ে যেত।

এই সময় পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি আর ধ্যানধারণারও আদানপ্রদানও যে হতো—এটা নিশ্চয়ই দুরবিসর্পিল কল্পনা নয়।

তাই প্রাচীন মধ্যএশিয়ার তথা পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বাণিজ্যপথ নিয়ে যিনি গবেষণা করেছেন সেই স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ইউজেনী ভ্যান ক্লীফ (Eugeni van cleef) বলেছেন (৩)—Trade centers are dyamic elements expressive of the world's cultural and economic structure. They are an index to ihe level of a nation's civilisation. As such the trade centers may be viewed as organisms of society, rooted to the earth. অর্থাৎ ব্যবসাকেন্দ্রগুলো হলো পৃথিবীর সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ভাব-বিনিময়ের গতিশীল এক একটা সংস্থা। যে-কোন জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাপকাঠি হলো তার ব্যবসাকেন্দ্রগুলো। যে কোন দেশের, যে-কোন সমাজের প্রাণকেন্দ্র হলো তাদের গঞ্জ বা হাটবাজারগুলো।

এই সূত্র অনুযায়ী-ই ইউজেনী ভ্যান ক্লীফ আরও জানিয়েছেন (৪)—সুপ্রাচীনকালের ফিনিসিয়ার বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র টায়ারের (Tyre) অসাধারণ সমৃদ্ধি ছিল ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত সমস্ত দেশের বিস্ময়। আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আমুদরিয়া উপত্যকা থেকে ইউরোপে চীনে এবং ভারতে যাওয়ার ক্যারাভান রুটের বা বাণিজ্য পথের ওপরে অবস্থিত তেহরান, মার্ভ, বুখারা এবং বুখারা ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বিপুল খ্যাতিলাভ করেছিল। আর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডি-গামার প্রাচ্যদেশের জলপথের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার পর্যন্ত তাদের খ্যাতি ছিল অম্লান।

দেশ-দেশান্তরের বণিক, ধর্মযাজক এবং ব্যবসা ও জীবিকার সূত্রে অনেক লোকের সমাগমে বাণিজ্যপথের সন্নিহিত অঞ্চলের জনপদ যেমন বহিরাগত মানুষের ধ্যানধারণা ও কৃষ্টিতে প্রভাবিত হয়, তেমনি তারাও (বিদেশীরা) প্রভাবিত হয় স্থানীয় জীবনচর্চা আর সংস্কৃতিতে। দূর বিদেশের বিভিন্ন জাতির নতুন চিন্তাধারা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রনে সেই জনপদের মাটিতেই

সৃষ্টি হয় নতুন একটা সংস্কৃতি, নতুন একটা কৃষ্টি। আর সেই ব্যক্লাকেন্দ্রেক শহরটিও বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, শিল্পে ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সমাজবিজ্ঞানের এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের এক প্রতাপশালী, প্রজানুরঞ্জন আর বিচক্ষণ নৃপতি— ডেরিয়াস বা দরায়ুস (৫২১-৪৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ)। পারশ্যের প্রাচীন অ্যাকামেনিদ (Achamenid কিম্বা Achamenida) রাজবংশোদ্ভূত সম্ভবত সম্রাট সাইরাসের (Cyrus) পুত্র।

কিন্তু রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় ডেরিয়াসের প্রসঙ্গ কেন এল—তার গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে বলা যায়, আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার সমগ্র ভূভাগ এবং ভারতের পশ্চিমসীমান্তের সিন্ধুনদ সন্নিহিত অঞ্চল ও সম্পূর্ণ পাঞ্জাব একদা তাঁর শাসনাধীন ছিল। ডেরিয়াসের বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্ত সংক্রান্ত তথ্যটিরও পাথুরে প্রমান পাওয়া গিয়েছে বিগত শতকের চল্লিশের দশকে।

বাগদাদ শহরের ১৭৫ মাইল পূর্বে প্রায় ১৭০০০ ফিট উঁচু একটা পাহাড়। বেহিস্তান। তাঁর চুড়োয় সাদা মেঘের মত বরফের মুকুট। এই পাহাড়ের গায়ে পারসিক কীলকাকার অক্ষরে (Persian Cuneiform letters) ডেরিয়াস নিজেই উৎকীর্ণ করে রেখেছেন এক লিপি। (৫) ১৮৪৪ সালে মেজর রাওলিনসন (Major Rawlinson) এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের এই শিলালিপিতে লেখা আছে—পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তিব্বত এবং সিন্ধুনদ সন্নিহিত অঞ্চল ও পাঞ্জাব থেকে সুদূর আফ্রিকার ত্রিপলী আর পশ্চিমে ইজিয়ান সাগরের দেশ এবং তুরস্ক—আহুর মাজাদার (পারসিকদের দেবতা) কৃপায় আমি—নৃপতি ডেরিয়াস এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হয়েছি।

বলাই বাহুল্য, ডেরিয়াসের শাসনকালেই যে মধ্যএশিয়ার ভূখণ্ডের সঙ্গে গাঙ্গেয়ভূমির স্মরণাতীতকালের সম্বন্ধ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল তার আভাসও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বেহিস্তান শিলালেখতে এই রাজকীয় ঘোষণায়—আমি (ডেরিয়াস) আমার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের নানা জাতির মানুষকে শ্রম এবং সদাচার ও ধর্মীয় চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে একসূত্রে একতাবদ্ধ করেছি—

এই মহৎ, উদার ও বলিষ্ঠ ঘোষণার প্রসঙ্গে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক এবং প্রাবন্ধিক জেনোফোন (Xnephon, ৪৩৪-৩৫৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ) মন্তব্য করেছেন (৬)—অসাধারণ সততা ও গভীর ধর্মবিশ্বাসে সঞ্জীবিত মানসিকতার জন্যেই ডেরিয়াস মিশর থেকে ককেশাস এবং দানিয়ুব থেকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে সুশাসনের আদর্শ অনাগত ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শুধু শাসনব্যবস্থাই নয়। বেহিস্তানের এই পারসিক লিপির গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, অ্যাসিরিও এবং ব্যাবিলনের অনুরূপ প্রাচীন পারসিক কীলকাকার বর্ণমালা থেকে-ই গান্ধেয়ভূমি পেয়েছিল তার প্রাচীনতম বর্ণমালা—বেহিস্তান শিলালিপির গবেষক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিতেরা স্পষ্টই বলেছেন (৭)—Through this channel (Behistum Rock Inscription) India reecived her script......প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষজ্ঞ বুহলার (Buhler) জানিয়েছেন (৮)—ভারতের নাগরী খরোষ্ঠীর লিখন পদ্ধতিতে ডেরিয়াসের বেহিস্তান লিপির বর্ণমালার প্রভাব আছে। জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ল্যাসেন (৯) (Lassen) এই প্রাচীন পারসিক লিপির কতগুলো চিহ্নে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর ডি. বি. স্পুনারের (D. B. Spooner) একটি প্রবন্ধে দেখছি পাটনার উপকণ্ঠে কুমরাহার গ্রামের মাটি খুঁড়ে কর্ণেল ওয়াডেল (Colonell waddell) পেয়েছেন অনেকগুলো বিচূর্ণিত স্তম্ভের ভগ্নাংশ। ওয়াডেলের অনুমান, এখানকার মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে মিশে রয়েছে অশোকের রাজধানী একদা ধনেজনে সমৃদ্ধ পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ। সেই বিলুণ্ঠিত স্তম্ভের খণ্ডাংশের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের কারুকার্যে রয়েছে ডেরিয়াসের রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য শিল্পের অনুরূপ শিল্পনিদর্শন। (১০)

মহেঞ্জোদায়ো-হরাপ্পাখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জনমার্শাল জানিয়েছেন মৌর্যনৃপতি চন্দ্রগুপ্তের (৩২১ খৃঃ পূঃ—২৭২ খৃঃ পূঃ) শাসনপদ্ধতিতে, পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের (২৭২ খৃঃ পূঃ—২৩১ খৃঃ পূঃ) রাজকীয় অনুশাসনে এবং সারনাথের বিভিন্ন সৌধাবলীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ডেরিয়াসের-ই সমসাময়িককালের পারসিক শিল্পসংস্কৃতি এবং রাজ্যশাসন প্রণালীর

প্রভাব। (১১)

খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বুখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ তথা আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার অধিপতি, জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী, পুণ্যবান মহান নৃপতি ডেরিয়াসের কাছে ভারত পেয়েছিল তার বর্ণমালার লিপি, পেয়েছিল প্রজানুরঞ্জন শাসনপদ্ধতি, পেয়েছিল শিল্প ভাস্কর্যের অপরূপ বিন্যাস তাই—ডেরিয়াসকে সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই বলা যায় রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রথম পথিকৃত।

সমরখন্দের উপকণ্ঠে খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়েছে ডিরিয়াসের আমলের বহু স্বর্ণমুদ্রা। তাঁর শাসনের ভেতরে আছে অনেক বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত—ডেরিয়াস-ই বিশ্বের প্রথম নৃপতি যিনি নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তার আগে নানা চিহ্নযুক্ত ধাতুর পাত মুদ্রার কাজে ব্যবহার করা হতো। ডেরিয়াসের প্রায় দুইশত বৎসর পরে আলেকজান্দারের সময়ে (৩২৫ খৃঃ পূঃ) গ্রীক মুদ্রার ওপরে কারুকার্যের যে মনোহর শোভা পরিলক্ষিত হয়—তার প্রায় দুইশো বছর পর কুশান বা ইন্দোসিদিয়ান (Indo-Scuthian) সম্রাটেরা এবং চতুর্থ শতকে ভারতের গুপ্তনৃপতিরা যে রাজমূর্তি লাঞ্ছিত মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন তার ভেতরে রয়েছে ডেরিয়াস প্রবর্ত্তিত মুদ্রানীতির সুস্পষ্ট প্রভাব—সে বিষয়ে কোন ঐতিহাসিকের কোন দ্বিমত নেই। (১২)

শুধু স্বর্ণমুদ্রার প্রথম প্রতর্তক হিসেবেই নয়, সুশাসক ডেরিয়াসের নাম মানবসভ্যতার ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের ব্যবধানকেও এড়িয়ে যে সোনার লেখার মত জলজল করেছে তার কারণ পেশোয়ার (পুরুষপুর) থেকে সুগদ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'সুশাসন' শব্দটির ভেতরে, বলাবাহুল্য, দেশের প্রতিরক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

ডেরিয়াস যে ব্যবসাবাণিজ্যের কত বড় উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর দুটো নজির দিয়েছেন খ্রীঃষ্টের প্রথম শতাব্দীর সেই অজ্ঞাতনামা সওদাগর তাঁর পেরিপ্লাস অফ এরিথ্রেরিয়ান সী (Periplus of Erythraean Sea) বা লোহিতসাগর বিবরণীতে—

(ক) খৃষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে (১৯০০ খৃঃ পূঃ) মিশরের নৃপতি দ্বিতীয়

সেসোষ্ট্রিসেস একটি খাল খনন করে নীলনদকে লোহিতসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তার প্রায় দেড় হাজার বছর পরে রোমের সম্রাট ফিলাডেলফাস দ্বিতীয় টলেমি Philadelphus Ptolemy II. (২৮৬-২৪৬ খৃঃ পূঃ) এই খালটির সংস্কার করে পণ্য সরবরাহের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। এই খালটিকেই টলেমির দেড়শো বৎসর আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য ডেরিয়াস সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

(খ) ত্রিবাঙ্কুরের ঘন অরণ্যে তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারতের ভিজে স্যাঁত-সেঁতে মাটিতে উৎপন্ন হতো অপর্যাপ্ত গোলমরিচ। ভারতীয় বিবিধ মশলার সঙ্গে এই গোলমরিচ সর্বপ্রথমে মিশরে গিয়েছিল সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যমে টলেমির সমসাময়িককালে (২৮৫-২৪৬ খৃঃ পূঃ), সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল এই লঙ্কা টায়ারের (ফিনিসিয়া) সওদাগরেরা। আর পাঞ্জাব এবং সমগ্র সিন্ধু-উপত্যকাকে তাঁর রাজ্যের সীমানাভুক্ত করে ডেরিয়াসের-ই সক্রিয় উদ্যোগে পারশ্যের বাজারে প্রচলন হয়েছিল গোলমরিচের।

ব্যবসাবানিজ্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক বলেই ইতিহাসে (১৩) আছে on account of industry and trade, he (Darius) was called Huckster (onewho produces advertising material for Commercial Clients)। এইরকম একজন বিচক্ষণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতার প্রতি সহানুভূতিশীল নৃপতি যে বণিকদের পণ্যবাহী 'কাফিলা' নিয়ে নিরাপদে যাতায়াতকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি দীর্ঘ প্রশস্ত পথের প্রয়োজন অনুভব করবেন—তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই ভারত থেকে হিন্দুকুশ ডিঙ্গিয়ে আমুদরিয়া উপত্যকার দেশগুলোতে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। ঐ ঐতহাসিক লিখছেন (১৪) It was he, who first constructed highways to connect his capital Macedonia, Central Asia and India and also provided post-horses that always stood in readiness…ভাবতেও অবাক লাগে, খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে, ভারত ও মধ্য-এশিয়ার তথা সোভিয়েত এশিয়ার যোগাযোগের বা বলা যায় দুটো দেশের মৈত্রীবন্ধনের সেতু তৈরী ক'রেছিলেন নৃপতি ডেরিয়াস। শুধু তাই নয়, সদাসতর্ক অশ্বারোহী সৈন্যদের সেনা-নিবাসও স্থাপিত ক'রেছিলেন। সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিক টলস্টভ আধুনিক-

কালের উজবেকিস্তানের মাটি খুঁড়ে এই সেনানিবাসগুলোর ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

১৯৫৮ সালে সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যারোবিয়েতা (Varobyeta) খোয়ারিজমের মরুভূমিতে পেয়েছেন ডেরিয়াসের সমসাময়িক কালের জল-সেচের প্রাচীন কলাকৌশলের নিদর্শন। ১৯৬৪ সালে এম, ই, ম্যাসন (M. E. Masson) এখানেই পেয়েছেন ডেরিয়াসের অ্যাকামেনিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক ধনে জনে সমৃদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান আধুনিককালের উজবেকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এই খোয়ারিজমে-ই ছিল ডেরিয়াসের ষোল নম্বর প্রদেশ বা সাট্রাপ!

তাঁর শাসনব্যবস্থা এতো বেশি সমৃদ্ধ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে পরবর্তী-কালে গ্রীকবীর আলেকজান্দারও তাঁকে অনুসরণ ক'রেছিলেন। ডেরিয়াসের শাসনপ্রণালী অনুসরণ ক'রেছিল মৌর্য নৃপতিরাও—একথা আগে বলা হয়েছে। মৌর্য নৃপতিদের সেই সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথের দু-পাশে নিবিড় সবুজ তরুশ্রেণীর সমারোহ; সেই পথশ্রান্ত পথিকের জন্য পান্থশালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি সুব্যবস্থার চিরস্মরণীয় কৃতিত্বের ভেতরে সেই বিচক্ষণ দূরদর্শী ও সুদক্ষ শাসক ডেরিয়াসেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

কিন্তু পেশোয়ার থেকে কাবুল উপত্যকা হয়ে দুর্গম হিন্দুকুশ আর পামীর অতিক্রম ক'রে শিরদরিয়া-আমুদরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কেন করেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগের এক বিদেশী নৃপতি? তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন, মানুষের আদিমতম জীবিকা হলো ব্যাবসা বা পণ্যের আদান-প্রদান।

ডেরিয়াস যখন আমুদরিয়া উপত্যকার দেশ থেকে ভারত পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্যপথ তথা ভারত-রুশ সমন্বয়ের সেই সেতু—সিল্ক রুট তৈরী করেন নি, কোন সভ্যদেশের কোন পণ্যবাহী 'কাফিলা' অন্য কোন দেশে গিয়ে পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির ও ধ্যান ধারণার আদান প্রদান করেনি তখন—ভল্গার উত্তরের যাযাবর উপজাতিরা পশ্চিমে দানিয়ুব নদীসংলগ্ন ভূখণ্ডে এবং পূর্বে পাতনদীর দেশে তাদের পণ্য নিয়ে গিয়েছে এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার ধারা ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু—কেমন করে?

সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নোব্লক (১৫)—এই উপজাতিরা বলশালী অশ্ব, চর্ম, আর পশম নিয়ে আসতো উত্তর থেকে মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়া শিরদরিয়ার উর্বর উপত্যকায় অর্থাৎ তাসখন্দে, সমরখন্দে আবার এখান থেকেই পশ্চিমী সওদাগররা তাদের পণ্য কিনে নিয়ে যেতো রোমে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে। যাযাবর সওদাগররা চলে যেতো চীনেও। এমনি ক'রেই পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে দানিয়ুব থেকে শুরু ক'রে পীতনদী (হোয়াংহো) পর্যন্ত ধ্যান-ধারণা সাংস্কৃতিরও ভাব বিনিময় ক'রেছিল সুপ্রাচীন দিনের ব্যবসায়ীরা।

সওদাগররাই আদিকালের সাংস্কৃতিক দূত। তাদেরই যাতায়াতের পথ যদি দুর্গম হয়, যদি মরুদস্যু আর পাহাড়ী রহজান তাদের কাফিলার ওপর অতর্কিতে নেকড়ের মতো হানা দিয়ে লুটে নেয় তাদের পণ্যসম্ভার তাহলে তারা বাণিজ্যের কাজ করবে কি ক'রে?

বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক বিচক্ষণ নৃপতি ডেরিয়াসের অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারত ও মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন পথের দুর্গমতা কতো ভয়াবহ ছিল—আশা করি সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দক্ষিণে ইয়ারকন্দ, খোটান, উত্তরে মরালবাশি, কুচার, কারাশর ও তুর্ফাণ। এই দুই সীমান্ত বেয়ে দুইটি প্রধান পথ চীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমদিকে এই দুটো পথ মিলিত হয়েছে কাশগরে আর পূর্বপ্রান্তে একেবারে চীনদেশের সীমান্তে ইউ মেন কোয়াং গিরিপথে। আর একটি ছোট পথ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ইয়ারকন্দ দরিয়ার ধারা বরাবর উত্তর দিকের পথের সঙ্গে মিশেছে। এই দুই পথেই স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত ও মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। ইরাণ, আফগানিস্থান, বুখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদের সঙ্গে এই পথেই সেকালে মধ্যএশিয়া অর্থাৎ আধুনিক-কালের সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল।

এই সব পথের দুর্গমতার ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (৩১৯ খৃষ্টাব্দ) বিবরণে (১৬)—

"এই সব মরুপথ ও গিরিপথে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এ-পথে দরিয়া পার হওয়া আর মরুভূমি অতিক্রম করা যে কী

প্রাণান্তকর ব্যাপার তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তারপর অনেক দুরারোহ পর্বত ডিঙিয়ে অনেক গভীর পার্বত্যনদী অতিক্রম ক'রে দরদ (দারেল) উপত্যকায় এসে পৌছলাম। দরদ থেকে সিন্ধু উপত্যকা দিয়ে ভারতে প্রবেশের পথ। এ-পথে নদী পার হতে হয় ঝুলানো দড়ির সেতু বেয়ে। সে দেশে শৈলদা নদী অতিক্রম করতে হলে পরপারের বাঁশ যখন বাতাসে কট্ কট্ শব্দ ক'রে হেলে পড়ে, তখন সেই বাঁশের ডগা ধরে নদীর অন্য পারে অবতীর্ণ হতে হয়।

কিন্তু তাশ-কুরগান্ হয়ে পশ্চিমে বাদাখশান না গিয়ে অন্য গিরিপথ দিয়ে দক্ষিণ পূর্বে গিলগিট নদীর উপত্যকা হয়ে সিন্ধুনদের তীরে পৌছানো যায়। এই পথ আরো দুর্গম। এখানে আছে জঙ্ঘাপথ, যে পথ জানু দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, পায়ে চলা যায় না; আছে 'অজপথ' ও মেন্টপথ অর্থাৎ যে সব পথ শুধু ছাগল ও ভেড়াই পার হতে পারে; আছে বংশপথ অর্থাৎ যে সব পথ বংশ-দণ্ডের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে পার হতে হয়।"

পাহাড়ের পরই মরুভূমি। মরুভূমির বিপদ আরো অনেক বেশি। সে বিপদ যে কী ভয়াবহ আর সর্বনাশা তা ভারত মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার স্মরণাতীত কালের নিবিড় আত্মীয় বন্ধনের সেতু—Silk Road-এর লেখকের জবানীতেই শুনুন (১৭) In the deserts, there would be voices and apparitions, terrestial sirens, to lead him (Merchant astray and lope him forever in the interminable sands. There would be avalanches, bloodthirsty tribes to ambush him in the mountain passes, deadly vapours rising from the marshland. Yet men passionately sought for this endless road to the East and the mysterious land of Seres (Silk, i, e, China) অর্থাৎ মরুভূমিতে শোনা যায়, কার যেন কণ্ঠস্বর আবার থেকে থেকে দূর থেকে ভেসে আসে মেয়েলী গলার মিষ্টি গানের সুর। যে সওদাগর সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে যায়, সে আর ফিরে আসে না। হিমবাহ তো আছেই, তাছাড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ গিরিপথের অন্ধকার কোণে কোণে লুকিয়ে থাকে হিংস্র রক্তপিপাসু দস্যুর দল। রাস্তার পাশে নিচু জলা জমি থেকে ওঠে বিষাক্ত গ্যাস। তবুও—তবুও বণিকরা এই অন্তহীন দূর-দুর্গম পথে

পথে যেতো ; যেতো রহস্যময় সেই সুদূর পূর্বসীমান্তের দেশে।

এখানে উল্লেখযোগ্য—এই সিল্ক রোডই যে ডেরিয়াস নির্মিত ভারত ও মধ্যএশিয়ার যোগাযোগকারী সেই আড়াই হাজার বছর পূর্বের বাণিজ্য পথকে অনুসরণ ক'রেছিল তারও প্রমাণ আছে রাহুল সংকৃত্যায়নের লেখা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'History of Central Asia-তে—আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারত ও মধ্যএশিয়ার প্রাচীন দিনের ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে অজ্ঞাতনামা এক লেখকের লেখা আকরগ্রন্থ 'Periplus of the Erythraean Sea'-তে (খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে লেখা)। পেরিপ্লাস বলছে (১৮)—We do not know exactly when the great trade routes between Central Asia and India were opened. But we can safely assume if Alexander visualised several towns and trade centres on this route ; so this road was in existence long before Alexander (325 B. C.). তাই সহজেই অনুমান করা যায়, ডেরিয়াসেরও পূর্বে ভারত ও এশিয়ার ভেতরে যোগসূত্র ছিল এই বাণিজ্যপথ।

আগেই বলা হয়েছে, ডেরিয়াস ছিলেন বাণিজ্য ও শিল্পের এক উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। তাই অনায়াসেই কল্পনা করা যায়, হয়তো ডেরিয়াস স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দুই দেশের সওদাগর এবং ধর্মপ্রচারকদের সেই বিপদসঙ্কুল পথে অভিযানের অপরিসীম কষ্ট। আর তখুনি প্রয়োজন অনুভব ক'রেছিলেন, গান্ধার (পেশোয়ার) থেকে কাবুল উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিন্দুকুশের গিরিপথের ভেতর দিয়ে সুদূর খোয়ারিজম পর্যন্ত বিস্তৃত সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা সুরক্ষিত একটা প্রশস্ত রাজপথের।

আড়াই হাজার বছর আগের এই রাজপথের ওপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে ধর্মের আকর্ষণে, ব্যবসার নেশায় দুই দেশের দুঃসাহসী মানুষের অবিশ্রাম যাতায়াতের ভেতরই একটু একটু ক'রে রচিত হয়েছিল আজকের ভারত-রুশ মৈত্রীর সুদৃঢ় বনিয়াদ।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী পৃষ্ঠা

(১) Beyond the oxus. Edgar Khobloch. ১৭
(২) Ibid Ibid ১৬
(৩) Trade Centers and trade routes. Eugene Van Cleef. ১-৩
(৪) Ibid Ibid ৪
(৫) Rock records of Darius the Great.
Pithwala, Maneck B. ১৫
(৬) Introduction of Rock records of Darius the Great.
Rawlinson H. G. ৮
(৭) Rock records of Darius the Great.
Pithwala, Maneck. B. ৮
(৮) Iranian people in Indian History Spooner D. B.
in Journal of the Royal Asiatic Society 1915. ৭০-৭১
(৯) Rock reccrds of Darius the Great.
Pithwala, Maneck. B. ২৫
(১০) Iranian people in Indian History. Spooner. D. B.
in J.R.A.S (1915) ৬৪-৬৫
(১১) Ibid Ibid ৬৭
(১২) History of Central Asia. Sankrityayana, Rahul. ৭৯
(১৩) Encyclopedea Britanica. DARIUS
(১৪) History of Central Asia. Sankrityayana, Rahul ৭৯
(১৫) Beyond the oxus. Knobloch, Edgar. ১৭
(১৬) Travels of Fa-Hisen. Gills, H.A. ed. ১৮-২০
(১৭) Silk Road. Boulnois. ৬১
(১৮) Periplus of Erythraean Sea. ২৭৪

চার

কনিষ্ক : রুশ-ভারত সখ্যতা

ভারত ও সোভিয়েত মধ্যএশিয়া।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রজানুরঞ্জন নৃপতি ডেরিয়াসের সময়ে এই দুটো প্রাচীন ভূখণ্ডের সখ্যতাবন্ধনের যে সূত্রপাত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে কনিষ্কের রাজত্বের সমসাময়িককালে। ভারতীয় সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা ও জীবনচর্যা আমুদরিয়া উপত্যকার মাটির গভীরে প্রবেশ করেছিল শিরদরিয়া বা জাক্সার্টিসের (Jaxartes) পরপারবর্তী এক যাযাবর সন্তান কনিষ্কের উদ্যোগে। তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত জানিয়েছেন (১) Cultural colonisation of Central Asia took place during the reign of Kanishka. মহামতি অশোক যেমন সমগ্র ভারতে এবং সিংহলে তেমনি গান্ধার বা কান্দাহার থেকে শুরু করে কাশ্মীর পেরিয়ে মধ্যএশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে কনিষ্ক-ই বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

শুধু ধর্ম ও সংস্কৃতি-ই নয়। পূর্বে চীন ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী সিলিসিয়া প্রায় সমগ্র এশিয়া জুড়েই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে পরিপুষ্ট করে তাঁর সাম্রাজ্যের বনিয়াদ যেমন দৃঢ় করেছিলেন তেমনি বুখারা, সমরখন্দ আর তাসখন্দের সঙ্গে সুদূর গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন নগর বারাণসী আর মথুরার ভেতরে বিদ্যা আর সংস্কৃতি, শিল্প আর ভাস্কর্য ও বাণিজ্যের সূত্রেই গড়ে তুলেছিলেন গভীর আত্মীয়তা।

এই তথ্যটি যে যথার্থ এবং মধ্যএশিয়ার খাঁটি এই দেশজ সন্তান যে প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা খরোষ্ঠী লিপির লিখনপদ্ধতিতে, স্বর্ণমুদ্রার গঠনবিন্যাসে,

ধর্মীয় চিন্তাধারায় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের গুপ্তযুগকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল তার আভাস পাওয়া যায় ভারত-বিদ্যার পণ্ডিত বুহলার (Buhler) এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ভি, এ, স্মিথের (V. A. Smith) এই উক্তিতে (২)—Kushan period is brought quite close to that period of the Guptas.

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, যাঁর শাসনকালকে ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্ময়কর সমৃদ্ধিতে, বহুদূরবিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসারতায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐতিহাসিকেরা বলেছেন outstanding achievement, সেই কনিষ্কের রাজত্বকালের সময় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের পরস্পরবিরোধী এক একটা সময়ের সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি-তর্কের ঝড়ের ভেতরেও খুব বেশি শোনা যায় দুইটি তারিখ (৩)

৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ (সর্বপ্রাচীন)।

২১৮ খৃষ্টাব্দ (সর্বাধুনিক)।

আবার প্রখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এবং ভারত বিদ্যার অধ্যাপক লুডার (Luder) জানিয়েছেন (৪)—কনিষ্ক নামে দুইজন কুশান নৃপতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ বিবরণী সি-উ-কি (Se-Yu-Ki) থেকে জানা যায়, (৫) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অভিধর্মমহাবিভাস শাস্ত্রে দুইজন কনিষ্কের উল্লেখ আছে। 'সম্যুক্তরত্ন-পিটক সূত্রে', সূত্রালঙ্কার শাস্ত্রে প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থেও দুই কনিষ্কের আভাস আছে। এবং দুই কুশান নৃপতি কনিষ্ক-ই যে বিদ্যা আর সংস্কৃতির অনুরাগী ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক—এই তথ্যটির প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভগবান তথাগতের মৃত্যুর চারশো বছর পর চতুর্থ বৌদ্ধমহাসম্মেলনের সময় কনিষ্কের উদ্যোগে বৌদ্ধভিক্ষুদের রচিত এবং হিউয়েনসাঙ কর্তৃক অনূদিত ওই অভিধর্মমহাবিভাসশাস্ত্রের-ই পরিশিষ্টে আছে—'এই কনিষ্ক—প্রাচীনদিনের কনিষ্ক (৬)—Kanishka of ancient times.

আবার 'সম্যুক্তরত্নপিটকসূত্র' বলছে, (৭)—কনিষ্ক তাঁর সভাসদ হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তিনজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবি—অশ্বঘোষ, মথুরা এবং চরক।

আর এখানে বলা হয়েছে, এই অশ্বঘোষ ছিলেন দ্বিতীয় কনিষ্কের সমসাময়িক।

কিন্তু দুই কনিষ্ক এবং তাঁদের রাজত্বকালকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের অনেক মতভেদ থাকলেও ভারতে কুশান শাসন প্রসঙ্গে যে তথ্যটি সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র দ্বি-মত নেই, সেটি হলো (৮)—কুজুল কদফিস, ভীম কদফিস, কনিষ্ক, হুবিস্ক এবং বাসুদেব—এই পাঁচজন কুশান নৃপতি প্রায় দুইশত বৎসর ব্যাপী আমুদরিয়া-শিরদরিয়া উপত্যকা থেকে গাঙ্গেয়ভূমির বারাণসী এবং মথুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন এবং হিন্দুকুশের পরপারবর্তী দুই দেশের ভেতরে গড়ে তুলেছিলেন নিবিড় সৌহার্দ্যবন্ধন।

কিন্তু কোন দুইশত বৎসর? এই প্রসঙ্গে বহু পরস্পরবিরোধী সন-তারিখে কন্টকিত দীর্ঘ সেই আলোচনায় না গিয়ে শুধু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ দুই প্রখ্যাত গবেষকের তথ্য এখানে দেওয়া হলো—

(১) কুশান শাসনকাল ৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল পর্যন্ত কনিস্কের রাজত্বকাল—১৬২-১৮৫ খৃষ্টাব্দ [—ভিনসেন্ট স্মিথ]

(২) কুশান শাসনকাল ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ২১৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল পর্যন্ত কনিস্কের রাজত্বকাল—১৯১ থেকে ২১৪ খৃষ্টাব্দ [—প্রত্নতত্ত্ববিদ কেনেডি এবং অধ্যাপক র‍্যাপসন]

দুইটি হিসাবেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—মধ্যএশিয়া থেকে ভারতভূমির গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী কুশানশাসন অব্যাহত ছিল।

কেনেডি এবং র‍্যাপসন তাঁদের তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন দুইটি প্রাচীন চীনা ইতিহাস (৯)—

২৫-২২০ খ্রীষ্টাব্দের চীনের ইতিহাস-সম্বলিত ফ্যান-ই (Fan-Ye) লিখিত হিয়োউ-হান-চাওউ (Heou-Han-Chou) এবং ২৩৯ থেকে ২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের চীনা-ইতিহাস সমন্বিত উ-হুয়ান (Yuo Houan) লিখিত উই-ই-লিও (Wei-Lio) বলছে—চীন থেকে যে তিনটি বাণিজ্যপথ পশ্চিমে তা-হিয়া (Ta-hia) অর্থাৎ ব্যাক্ট্রিয়া, দক্ষিণে কিপিন (Kipin) অর্থাৎ কাশ্মীর, কা-ও-ফু (Kao-Fu) অর্থাৎ কাবুল এবং তিয়েন-তিচাউ (Tien-Techou)

বা ভারতবর্ষ প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল সেই তিনটি পথ এবং তৎসন্নিহিত সমগ্র অঞ্চল এই সময়ে ইউ-চি বা কুশান শাসনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এখানে 'এইসময়' অর্থে বলাবাহুল্য গ্রন্থদ্বয়ের আলোচ্যকাল তৃতীয় খৃষ্টাব্দের বিশ বা ত্রিশ দশকের ইঙ্গিত করছে। এই দুটো গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদক এবং ভারতবিদ্যার অধ্যাপক এম, এড, চাভানিজও (M. Ed. Chavannes) মন্তব্য করেছেন (১০)—At the middle of the 3rd century of our era, the power of kushan kings was at its height···

ভারতবিদ্যাবিশেষজ্ঞ লুডার সম্পাদিত এবং তক্ষশিলার বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারলতার লেখা সূত্রালঙ্কারের একটি অধ্যায় কল্পনামন্দিতিকায় আছে (১১)—কুশানযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কনিস্ক খোটান, কাশগর থেকে অভিযান শুরু করে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় বারাণসী এবং মথুরা পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পুরুষপুর বা পেশোয়ারে। এই পুরুষপুর এবং তক্ষশিলায় কনিস্ক এমন অনেক বৌদ্ধবিহার, মঠ এবং স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন যাদের গঠনশৈলী ও অপরূপ কারুকার্য ছিল তদানীন্তনকালে পৃথিবীর বিস্ময়।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিনায়ক জন মার্শাল, জেনারেল কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্নবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টায় অনেক কক্ষ সমন্বিত অতিকায় এক একটি বৌদ্ধবিহারের ভগ্নস্তূপ পাওয়া গিয়েছে আধুনিক কালের রাওলপিণ্ডির কুড়িমাইল উত্তর-পূর্বে একদা ধনেজনে সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ তক্ষশিলার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষে। আরও অনেক ভূলুণ্ঠিত এবং জীর্ণ বৌদ্ধমঠের অস্থিপঞ্জরের নিদর্শনে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, (১২) এখানে দুই থেকে তিনহাজার বৌদ্ধশ্রমণ স্থায়ীভাবে বাস করতেন।

কনিস্কের রাজত্বকালের প্রায় দুইশত বৎসর পর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র তক্ষশিলায় এসেছিলেন (৪০০ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁর ভ্রমণবিবরনী (১৩) থেকে আভাস পাওয়া যায়—বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতি অনুশীলনের সুবৃহৎ কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলার সেই গৌরব তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল।

শির-দরিয়ার পরপারবর্তী কাশগর ও খোটান থেকে আগত যাযাবর সন্তান কনিস্ক ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ধ্যানধারণাকে সমগ্র মধ্যএশিয়ার

প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রসারিত করে দিয়েছিল বলেই বলা যায়—এই দুটো মহান দেশের সখ্যতাবন্ধনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের আর এক মহানায়ক কনিষ্ক। ভারত ও মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার শোণিত সমন্বয় এবং সংস্কৃতি সমন্বয়ের সুদীর্ঘকালের বিচিত্র ইতিবৃত্তে কুশানবংশীয় সেই প্রজানুরঞ্জন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিশ্ববিশ্রুত নৃপতি কনিষ্কের অবদান যে অবিস্মরণীয় তার আভাস পাওয়া যায় প্রখ্যাত রুশ প্রত্নতত্ত্ববিদ এন, টি, টলস্তভের (N. T. Tolstov) এই উক্তির ভেতরে (১৪)—**Kushan Kingdom, a huge empire, extending from Aral sea to Benaras, on the Ganges and from the Southern Karakum to Takla-Makan desert was ruled by Kanishka, most outstanding of Kushan Kings.**

খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬ সালে হুনদের কাছে থেকে তাড়া খেয়ে ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের দিকে আসতে শুরু করেছিল। যাযাবর জীবনের বহু দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের (শক, পহ্লব ইত্যাদি মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতির সঙ্গে) ভেতর দিয়ে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ইউচিরা জীবনধারণের জন্য অনুকূল আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে আমুদরিয়া (oxus)—শিরদরিয়ার জলবিধৌত ফেরগানা উপত্যকার মাটিতে বসতি স্থাপন করে খুব সম্ভবত যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করেছিল। ফেরগানা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হতে হতে তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

তার ভেতরে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে সুদূর মধ্য-এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল তাদের নাম—কুশান।

কুশানদের দলপতি কুজুল কদফিস (Kujul Kadphises) (১৫) বাদবাকি চারটি ইউ-চি জাতিকে পদানত এবং একতাবদ্ধ করে যখন নিজেকে 'ওয়াং' বা রাজা বলে ঘোষণা করেছিল তখন উত্তরপশ্চিম ভারতে তথা মধ্য-এশিয়ার গ্রীকশক্তি অস্তমিত। তাই কুজুল অনায়াসেই গ্রীক নৃপতি হারমিউজ (Hermues) কে পরাস্ত করে বহ্লীক (ব্যাকট্রিয়া), কপিশা ও গান্ধার দখল করেছিল (২৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তার সময়েই মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস কদফিস বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফিস (৫০-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) যে শুধু কপিশা (আফগানি-

স্থান), গান্ধারের (পাঞ্জাব) এলাকা ছাড়িয়ে পূর্বে যমুনার তীরে পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল তা নয়—ভারতে সর্বপ্রথম শিবমূর্তি-লাঞ্ছিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে স্ফীত করে তুলেছিল।

অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই সওদাগরদের 'কাফিলা' (Caravan) ভারতীয় পণ্যসম্ভার বহন করে নিয়ে যেত মধ্য-এশিয়ায়, যেত চীনে। ব্যবসাবাণিজ্যে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের ফলে দুরদুর্গম পথে পণ্য বহন করে না নিয়ে গিয়েও বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে সওদা আমদানী করা সম্ভব হলো।

বুদ্ধের পূজারী প্রথম কদফিস এবং মহাদেবভক্ত দ্বিতীয় অথবা ভীম কদফিসেরই সুযোগ্য ও সার্থক উত্তরাধিকারী বিশ্ববিশ্রুত কনিস্ক। কাজেই কনিস্কের ভারত-প্রীতি আকস্মিক নয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের ভারতের ধর্ম, ভারতের জ্ঞান গরিমার প্রতি গভীর অনুরাগের সেই ঐতিহ্যই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর যাযাবর রক্তে।

আমুদরিয়ার অববাহিকা থেকে সুদূর গাঙ্গেয় উপত্যকার সারনাথ (বারাণসী) বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কনিষ্ক যেমন অনেক বৌদ্ধ মঠ, চৈত্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যও প্রতিবেশী চিরশত্রু চীনকে প্রতিহত করার জন্য তৈরী করেছিলেন বহু দুর্গনগরী। আয়িসকালা (Ayeskala), জিলডিক (Jildik) আর টোপরাক-কালা (Topruk-Kala) খোয়ারিজমের মরু অঞ্চলের এই তিনটি জনপদের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে আবিস্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে—(১৬)

কনিষ্ক যে বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুরাগী, পুরুষপুর অর্থাৎ তাঁর রাজধানী আধুনিককালের পেশোয়ারে তিনি যে বিশাল বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন; কাশ্মীরে মতান্তরে জালান্ধরে যে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি (মহাসম্মেলন) আহ্বান করেছিলেন—এ সব তথ্য আজ বহুল প্রচারিত।

কিন্তু কনিস্ক যেমন বৌদ্ধধর্মের তেমনি ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারতারও একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলেই রুশ-ভারত মৈত্রীর ইতিহাসে তাঁর অবদান বিস্ময়কর।

ভারত ও মধ্য-এশিয়া—এই দুটো দেশের জীবনসরণী—এই দুটো ভূখণ্ডের মৈত্রীবন্ধনের সেতু স্মরণাতীতকালের সেই সিল্ক রুটটিকে আরও সুরক্ষিত করে আদি যুগের সাংস্কৃতিক দূত সেই দুঃসাহসী বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের যাতায়াতকে আরও সুগম ও আরও নিরুপদ্রব যে করতে সক্ষম হয়েছিল—মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস-গবেষক রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই উক্তির ভেতরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—Kaniska's control extended not only over the fertile valley of Fargana, but over the whole of 'Silk route' from the eastern borders of Sinkiang to the Iranian frontier. (১৭)। চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের সীমান্ত থেকে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ এই সিল্ক রুটটি ছিল চীনাদের অধীনে। শুধু তাই নয়, উত্তরে বরফাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে অতর্কিতে নেকড়ে বাঘের মতো বেরিয়ে এসে বহু মূল্যবান পণ্যসম্ভার বোঝাই কাফিলাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিত দুরন্ত শ্বেতহুন রাহজানদের দল। কঠোর হস্তে সেই দস্যুদের অত্যাচার দমন করে, এবং চীনাদের কবল থেকে মুক্ত করে সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত সিল্করুটে কনিষ্ক তাঁর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কনিষ্ক যে এই সিল্কের সওদাগরদের অভিযান কতটা বিপদমুক্ত, কতটা নিরুদ্বেগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'সিল্ক রোডে'র ইতিহাসের লেখক বুলনয়েসের জবানীতেই সেটা শুনুন—

'মহারাজাধিরাজ কুশান নৃপতি কনিষ্কের রাজত্বকালেই গ্রীসের সেই রেশমের কারবারী ম্যাস্বিস টিটিয়ানাস (Maes Titianus) তাসখন্দ থেকে পূর্বে রেশমের দেশ চীনে অভিযান করেছিল। তাদের গন্তপথ ছিল তারিম উপত্যকার বিস্তীর্ণ ভয়াল মরু-অঞ্চলের মাঝে মাঝে মরুদ্যানের ভেতর দিয়ে। কিন্তু পশ্চিমে ফেরগানার সমভূমি (আমুদরিয়ার বদ্বীপ অঞ্চল) থেকে পূর্বে চীন সীমান্ত সিল্করুটের এই এলাকাটুকুর মাঝখানে হিংস্র যাযাবর এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্রও একদা সওদাগরদের ত্রাসের কারণ ছিল। তাদের এবং হুন দস্যুদের প্রতিরোধের জন্যই সুদীর্ঘ এই পথের মাঝে মাঝে আধুনিককালের পুলিস ফাঁড়ির মতো এক একটি গ্যারিশন (Garrison) অর্থাৎ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীপূর্ণ দুর্গ তৈরী করেছিল কনিষ্ক। যার ফলে দস্যুর অত্যাচারের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল। সংক্ষেপে-

কণিষ্কের রাজত্বকাল ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়—Higly favourable period for trade...... (১৮)

দেশ-দেশান্তরের সওদাগরদের কাফিলার যাতায়াতের পথ সেই সিল্করুটের ওপরেই আজ রেলওয়ে লাইন তৈরী হয়েছে। সেই ঝকঝকে দূর বিসর্পিল রেললাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হাজার হাজার বছর আগে একজন শুধু তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতায় এই পথকে সুরক্ষিত করে দুটি দেশের সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করেছিলেন।

শুধু ভারত ও আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার উপত্যকার দেশের ভেতরেই সখ্যতাবন্ধন নয়। এই দুই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা নানা ধর্মের ভেতরেও যে বিস্ময়কর সমন্বয়সাধন করেছিলেন কনিষ্ক তার কয়েকটি সাম্প্রতিকতম প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন (১৯) এখানে বলা হলো—

(ক) ১৯৫০-৬০ সালে তেরমেজের ছাব্বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে জার-টেপের (Zar-Tepe) মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্বিক এল, অ্যালবাউম (L. Albaum) পেয়েছেন গ্রীক অধ্যুষিত ব্যাক্ট্রিয়া বা গ্র্যাসো-ব্যাক্ট্রিয়ান কারুকার্য মণ্ডিত এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্রধর্মীয় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি লাঞ্ছিত কনিষ্কের যুগের রাশি রাশি মুদ্রা।

(খ) ১৯৬২ সালে তেরমেজের ত্রিশ মাইল উত্তরে জ্যাঙ-টেপে (Zang Tepe) অ্যালবাউম আবিষ্কার করেছেন প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধশিল্পের কারুকার্য প্রভাবিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। আর পেয়েছেন খোয়ারিজম বা আধুনিককালের উজবেকিস্তানে দুই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা যে কত প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন—বার্চ গাছের এক মিলিমিটার পুরু ছালের ওপরে সংস্কৃত ভাষায় এবং মধ্য এশিয়ার ব্রাহ্মী লিপিতে (Central Asian Brahmi script) লেখা অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। সম্প্রতি এই গ্রন্থগুলোর পাঠোদ্ধার করেছেন মিসেস ভারোবিইভ ডেস্যাতোভস্কিয়া (Varobyeve Desyatovskaya)।

(গ) এই জ্যাঙ-টেপেই মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের স্তূপ অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন সমন্বিত কোন সৌধের রাশি রাশি ভগ্নাবশেষের ভেতরে অ্যালবাউম পেলেন ৮.৫ মিলিমিটারের মাটির তৈরী একটা মেডেল। তার ওপরে উৎকীর্ণ

করা রয়েছে মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত কুশান সম্রাটের অনুরূপ দুইটি তেজস্বী সিংহের মাঝখানে এক সিংহাসনে সমাসীন হয়তো কোন স্থানীয় নৃপতির প্রতিকৃতি। তার পরিধানে ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের মত পোষাক। কিন্তু তার মাথায় কুশান স্টাইলের খুব উঁচু সুচালো টুপী (High pointed cap)।

আমুদরিয়ার উপনদী সুরখানদরিয়ার তীরে এই জ্যাঙ-টেপেই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কারুকার্যখচিত তক্ষশিলা টেরা-কোটা, বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি এবং উপরোক্ত মৃত্তিকা নির্মিত পদকটির গঠন বিন্যাসের প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ববিদ ড্যানিয়েল স্লাম বার্জার (Schlumberger) মন্তব্য করেছেন—কুশান যুগের গান্ধার শিল্পশৈলীর চমকপ্রদ নিদর্শন —Remarkable artistic activity (Gandhar school) of Kushan empire (২০)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত আয়িরতামে, তেরমেজে, ভারাক্ষা, পেন্দজিহিকেন্টে এবং আমুদরিয়া উপত্যকার প্রাচীন জনপদের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনেও আমরা কনিস্কের সমসাময়িককালের (দ্বিতীয় বা মতান্তরে তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এই গান্ধারশিল্পেরই সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু এই গান্ধারশিল্প কি এবং কেমন করে তার জন্ম হলো? তার জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্বিক জন মার্শাল, জেনারেল কার্নিংহাম জানিয়েছেন এক চমকপ্রদ তথ্য (২১)—ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে (৪১০ খৃ: পূ:) ডেরিয়াসের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এল পারসিক শিল্পসংস্কৃতি। তার প্রায় একশো বছর পরে (৩২৬ খৃ: পূ:) আলেকজান্দার বহন করে নিয়ে এলেন গ্রীক বা হেলেনিস্টিক শিল্পশৈলীর ধারা। এই সিন্ধু উপত্যকাতেই সমৃদ্ধ মৌর্যচন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের (৩১৭ খৃ: পূ:) শান্তিপূর্ণ পরিবেশে-ই ভারতীয় বা বৌদ্ধ শিল্প-ভাস্কর্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পারসিক ও গ্রীক শিল্পের। বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতিতে প্লাবিত ব্যাকট্রিয়াতেই গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস (৩০৩ খৃ: পূ:) এবং পরবর্তীকালে ডিমিট্রিয়াস (১৯০ খৃ: পূ:) রাজ্যস্থাপন করেছিলেন এবং বলাবাহুল্য গড়ে উঠলো গ্রাসো-ব্যাকট্রিয়ান আর্ট (Graco-Bactrian Art)। শোনা যায়, সম্রাট অশোক (২৭৩ খৃ: পূ:) ব্যাকট্রিয়া থেকে শিল্পীদের নিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন পাটলি-

পুত্রের রাজপ্রাসাদ। পারসিক গ্রীক এবং বৌদ্ধশিল্পশৈলীর সংমিশ্রণে কনিষ্কের সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল কুশানযুগের শিল্প—

গান্ধারশিল্প।

গান্ধার শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসের ভেতরে যেমন তেমনি প্রাচীন ভারতের খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী লিপির জন্মকাহিনীর ভেতরেও আভাস পাওয়া যায়—ভারত ও মধ্যএশিয়া বা আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার—এই দুই প্রাচীন ভূভাগের মৈত্রীবন্ধনের সার্থক অগ্রদূত এই—

কনিষ্ক।

জার্ণাল অফ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীতে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এফ, ডবলিউ, থমাস (F. W. Thomas) লিখিত প্রবন্ধে (২২) জানা যায়, কনিষ্কের মুদ্রায় ছিল গ্রীক উপকথার নিখুঁত নক্সা আর উৎকীর্ন করা ছিল খরোষ্ঠী লিপি। কিন্তু সেই খরোষ্ঠী লিপি খৃষ্টপূর্ব পাঁচশতকে ডেরিয়াস হিস্টাসপেচ (Hystaspes) বা অ্যাকামেনিদ সাম্রাজ্যের সমসাময়িক খরোষ্ঠী নয়। কনিষ্কের খরোষ্ঠী লিপি টানা হাতে লিখিত বা 'কারসিভ'। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক গার্ডেনার পেয়েছেন কনিষ্কের খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ন সিদিয়ান (Scythian) উপকথাসমন্বিত বিশটি মুদ্রা। প্রত্নবিদ্যার পণ্ডিত অধ্যাপক নো (Know) চাইনীজ তুর্কীস্থান থেকে আবিষ্কার করেছেন মধ্যএশিয়ার একটি প্রাচীন এবং অজানা ভাষার ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ কয়েকটি মুদ্রা। তাই কেনেডি সিদ্ধান্ত করেছেন—যে সব ভাষায় খোদিত কনিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল—সে-সব ভাষা তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

ডক্টর ফ্লীট, কেনেডি এবং গার্ডেনার কুশান-ইতিহাসের গবেষকরা জানিয়েছেন, পশ্চিমের দেশে (ইউরোপে) ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রসারিত করার জন্যই কনিষ্কের মুদ্রায় থাকতো 'গ্রীক লিজেন্ড'। আর গাঙ্গেয়ভূমি থেকে আমুদরিয়া উপত্যকা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের দেশ দেশান্তরের ভেতরে বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক সখ্যতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন ভাষাতেও তার মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

আর কনিষ্কের খরোষ্ঠী যে ভারতের প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্যভারতীয়

ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল তার আভাস পাওয়া যায় ভাষাবিশেষজ্ঞ সুকুমার সেনের এই উক্তিতে (২৩)—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ভেতরে (কনিষ্কের রাজত্বকাল) প্রাপ্ত যাবতীয় বৌদ্ধসংস্কৃত এবং শিলালেখ খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত।

মুদ্রার নক্সা ও বিবিধ কারুকার্য সম্বন্ধে জানা যায়, বৌদ্ধ, হেলেনীয় বা গ্রীক, হিন্দু, জরথুস্ত্রীয় ধর্মের দেবদেবীর খোদিত মুদ্রার প্রচলন করে কনিষ্ক তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাই ঐতিহাসিকরা তাঁকে তাঁর প্রায় দেড়হাজার বছর পরের যে ভারতীয় সম্রাটের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি হলেন—আকবর (২৪)।

কনিষ্কের অজস্র কীর্তি-ই হাজার বছরের ওপার থেকে নিশব্দে ঘোষণা করছে—সোভিয়েত মধ্যএশিয়া ও ভারতের মৈত্রীবন্ধনের তিনি-ই সর্বসার্থক মহানায়ক।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি — পৃষ্ঠা

(১) Forward of the book 'Buddhism and Buddhist literature in Central Asia' by Kshanika Saha.
—Nalinika Dutta.

(২) Date of Kanishka, Dr. Ramesh Majumdar. in Indian Antiquary vol. 46. 1917 — ২৭২

(৩) Date of Kaniska. R. Kimura. in Indian Historical Quarterly. Vol. 1 No. I. ৪১৬

(৪) Scythian period of Indian history in Indian Antiquary Vol. 37 (1908).
Rakhaldas Bandyopadhya ৪১

(৫) Same as. (৩)

(৬) Catalogue of the Chinese Buddhist Tripika No. 1182. Nanojio Buniya. ২১৬

(৭) Ibid Ibid No. ১৩৮২ ২৯৬

(৮) Oxford history of India. V, A. Smith ১৪৬ (পাদটীকা)

(৯) Date of Kanishka. Ramesh Majumdar in Indian Antiquary Vol. 46. (1917) ২৬৪-৬৪

(১০) Ibid Ibid ২৬৫

(১১) Kalpanamanditika—des Kumarlata by Btuchstucke Der. As Quted in.

(১২) Annual Reports of the Director General of Archaeology 1912. Pt-1. ৮-১৭
Pt-2. ১-৫২

(১৩) Travels of Fa.Hien [400] Beal Samuel As Quoted in R. C, Majumdar's article : 'Date of Kanishka' in Indian Antiquary Vol. 46. (1917) ১৭২-৭৩

(১৪) Archaeology in U.S.S.R. Mongait Alexadner. ২৬৮

(১৫) Oxford history of india. V. A. Smith ১৪৬-৪৯

(১৬) History of Central Asia. Rahul Sankrityana. ১০৭

(১৭) Ibid Ibid ১০৮

(১৮) Silk Road. Boulnois L. ৬৭

(১৯) Archaeology in Soviet Central Asia in
Cental Asiatic Review Vol 13. (1965) ২৪৩-৪৫

(২০) Ibid Ibid—G, Frumkin. ২৪৫

(২১) A Guide to Taxila. Marshall John, ২৩

(২২) 'Date of Kanishka'. In Journal of Royal
Asiatie Society. 1913. ৬৩৮-৪৪

(২৩) ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন ২৩

(২৪) 'Date of Lanishka'. In Journal of Royal
Asiatic Society 1913. ৬৪৬

পাঁচ

আমুদরিয়ার দেশে ভারতীয় সন্ন্যাসী

রুশ-ভারত মৈত্রীর সুদীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাসে পারস্যের মহান নৃপতি ডেরিয়াসের যেমন, খ্যাতিমান কুশান সম্রাট কণিষ্কের অসামান্য অবদান আছে তেমনি আছে এপার গঙ্গা ওপার আমুদরিয়ার অগণিত বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের।

সার্থবাহরা দূরদেশে পাড়ি দিয়েছে ব্যবসার আকর্ষণে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গিয়েছেন ধর্মের দুর্বার পিপাসায় আর কেমন করে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণাকে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন—সেসব বিশদ আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে।

এইবার দুই দেশের কয়েকজন বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণের ইতিবৃত্ত এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তোখারিস্থানে বা তুর্কীস্থানে অর্থাৎ আধুনিক কালের আমুদরিয়ার পরপারবর্তী দেশ বা ট্রান্সঅক্সানিয়া, তিয়েনশান পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে 'সেমিরিচ' বা সপ্তনদীর দেশ এবং শিরদরিয়ার সংলগ্ন ফেরগানা উপত্যকায় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস, সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ) প্রচেষ্টাতেই মধ্যএশিয়ার এই অঞ্চলে এই বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা উল্লেখ করেছেন একটি পাথুরে প্রমাণের—অশোকের একটি অনুশাসনে আছে—

"গান্ধার (কাবুল), কম্বোজা (তোখারিস্থান) এবং যোনার (ব্যাক্ট্রিয়া বা বলাখ) অধিবাসীদের ভেতরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।"

অশোকের প্রায় ১৬৪ বছর পূর্বে আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার দেশে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন শুরু হয়েছিল দুই বৌদ্ধশ্রমণের সক্রিয় উদ্যোগে।

দুই বৌদ্ধভিক্ষু।

ট্রাপুস আর বল্লীক বা বাহ্লিকা।

ট্রাপুস তোখারিস্থানের আর বল্লীক বলাখের বা ব্যাক্ট্রিয়ার অধিবাসী তারা নাকি ভগবান তথাগতের বোধিলাভের কিছুকাল পরে ভারতে এসেছিল ব্যবসা করতে।

ব্যাক্ট্রিয়া থেকে বৌদ্ধভিক্ষু অধ্যুষিত বানিয়েন গিরিপথ ডিঙিয়ে কুভা নদী পেরিয়ে তারা এসেছিল পুরুষপুরে অর্থাৎ পেশোয়ারে। পেশোয়ার থেকে তক্ষশিলা। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে শত শত বৌদ্ধশ্রমণের সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধের তৎকালীন নিবাস বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার প্রবল বাসনা হয়েছিল তাদের মনে।

তারা যখন এল—এল বুদ্ধদেবের পদধূলি রঞ্জিত সেই বুদ্ধগয়ায়, তখন কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের সেই মোহাচ্ছন্ন অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে তিনি বোধির প্রসন্ন আর অবারিত আলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন। বটবৃক্ষের নীলাভ ছায়ার নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছেন। দূর বিদেশের বণিকদের মনে হলো, স্বর্গ থেকে যেন নেমে এসেছে এক দেবদূত। কেমন কেয়া ফুলের মতো দীর্ঘ আর সোনার মতো গায়ের রঙ। শান্ত সৌম্য মুখাবয়বে কী গভীর প্রশান্তি! জরা ব্যাধিতে জীর্ণ, গভীর দুঃখশোকে বিপর্যস্ত শত শত নরনারী তার কাছে আসছে শান্তির আশায়। তারা কেউ তথাগতকে দিচ্ছে ফল, কেউ দিচ্ছে মিষ্টান্ন। ভিনদেশী দুই বণিক আর কি দেবে? তন্দুরের দুটো মোটা মোটা রুটি, আপেল আখরোট আর বলাখের অরণ্যের মধু নামিয়ে রাখল তাঁর পায়ের কাছে—

গভীর অকৃত্রিম ভক্তি, নিবিড় ধর্মবিশ্বাস তাদের প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠ শিষ্যে পরিণত করেছিল। কিন্তু একদিন তথাগত তাদের বললেন, শোন, ধর্ম-প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে যেতে হবে আমাকে—একটু থেমে বল্লীক আর ট্রাপুসের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, আমি চাই তোমরাও তোমাদের দেশে ফিরে গিয়ে আমার বাণী প্রচার করবে—

কিন্তু প্রভু, আমরা যে তোমার শিষ্য তার কি অভিজ্ঞান নিয়ে যাবো ?

কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন। বললেন, বেশ আমার মাথার কয়েকটা চুল আর হাতের নখ নিয়ে যাও—

যারা গিয়েছিল বণিক হয়ে তারা ফিরে এল শ্রমণ হয়ে। আর এসেই দেশের মাটিতে বুদ্ধের দেহের চিহ্ন দুটো পুঁতে তার ওপর গড়ে তুলেছিলেন বৌদ্ধ মহাবিহার নব সংঘারাম।

সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে * বর্ণিত এই কিংবদন্তীর ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটা সত্য, ভারত থেকেই বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য-এশিয়ায়।
দুই ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু।

কাশ্যপ মাতঙ্গ আর ধর্মরত্ন। (১) যতদূর জানা যায়, তাঁরা ছিলেন মধ্যভারতের অধিবাসী। আনুমানিক ৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা গিয়েছিলেন কুশান রাজ্যের অন্তর্গত ইউ-চি অর্থাৎ তুখারা বা তোখারিস্থানে। কুশান সম্রাটদের এবং অশোকের প্রভাবে তখন তুখারার দিকে দিকে বৌদ্ধধর্মের স্রোত বয়ে চলেছে।

ঠিক এই সময় চীনের হানবংশের সম্রাট মিঙ-টির (Ming-ti) এক দূত এল তুখারায়। সম্ভবত এই রাজদূতের উদ্যোগে এবং বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত তুখারায় অকারণ কালব্যয় না করে কাশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্ন চলে এলেন চীনে (৬৮ খৃষ্টাব্দ)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে-ই চীনে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তখনো বৌদ্ধধর্মকে চীনে বিদেশী ধর্ম বলে গণ্য করা হতো। চীনে তখন কনফুসিয়স প্রবর্তিত ধর্মের এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাও-তেজে (Lao-Tze) প্রচারিত তাওয়িজম বা তাও-তি-চিঙের (Way of Life) অনুশীলন চলতো। শুধু হানসম্রাট মিঙ-টি-ই খেয়াল খুশিমত দূরদেশ থেকে কোন বিলাসের সামগ্রী আমদানীর মত এই ভারতীয় উদার ও সহজ সরল

---

* Hiuen Tsang. or Yuan Chwang Travels in India. 629-45 A. D. by T. Watters, ed. by T. W. Rhys David and S. W. Busheil, London, 1904-5. Vols., Vol. 2. P 130-31.

ধর্মমতটিকে সর্বপ্রথম চীনে চালু করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন (২)। আর চীনের মাটির গভীরে বৌদ্ধধর্মের শিকড়কে প্রসারিত করে দেওয়ার জন্যই তাঁর রাজধানী 'লয়্যাঙে' (Loyang)-এ একটি বৌদ্ধ মঠও নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিককালের পিকিং থেকে চারশো মাইল দূরে বর্ত্তমান হোনান প্রদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে চীনের প্রথম বৌদ্ধমঠ—'শ্বেত অশ্ব-বিহার'।

এই মঠের ইউ-চি থেকে এসেছিলেন কাশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্ন। কিংবদন্তী বলে—তেজস্বী দুটো শ্বেতকায় অশ্বারূঢ় হয়ে এবং বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা বলেই মঠের নাম হয়েছে, 'হোয়াইট হর্স মনেস্টরী'—বা পো-মা-স।

এই মঠে যোগদানের পরে খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না কশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে চীনে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা অনুবাদের মাধ্যমে এই ধর্ম দূরবিস্তৃত অঞ্চলে অসংখ্য মানুষের কাছে প্রচারের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যায়—তার বীজ প্রোথিত করেছিলেন এই দুই ভারতীয় ভিক্ষু। (৩) কাশ্যপ মাতঙ্গ আর ধর্মরত্ন যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তার ভেতরে যে গ্রন্থটিতে আছে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি এবং সংঘ পরিচালনা করার প্রধান নিয়মাবলী, তার নাম—দ্বিচত্বারিংশৎ বস্তুসূত্র।

আজও বৌদ্ধসাহিত্যে সযত্নে সংরক্ষিত দ্বিচত্বারিংশৎ বস্তুসূত্র স্মরণ করিয়ে দেয় মধ্যএশিয়ায় এবং চীনে ভারতের সংস্কৃতিবহনকারী সেই দুই দুঃসাহসী ভারতীয় ভিক্ষুর বিচিত্র ইতিবৃত্তকে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য—খ্রীষ্টাব্দ শুরু হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর সমগ্র চীনে বৌদ্ধধর্মকে প্রচার এবং জনপ্রিয় করে তোলার কাজে এই লয়েঙ বা শ্বেত অশ্ব-বিহারের অবদান অপরিসীম।

১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্থিয়া (উত্তর-পূর্ব ইরান) থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি চীনে গিয়েছিলেন তাঁর নাম—আনি-সে-কাও। (৪)

আনি-সে-কাও—সংস্কৃত লোকোত্তম শব্দের চীনা অনুবাদ। আনি-সে-কাও-এর প্রকৃত নাম জানা যায় না। তবে ইতিহাসে আছে, তিনি ছিলেন

পার্থিয়ার আরসাসিদান রাজবংশসম্ভূত এক রাজকুমার। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করে এবং সমগ্র পার্থিয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসনের মায়া কাটিয়ে একবস্ত্রে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং বৌদ্ধভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলেন।

পার্থিয়ায় তখন কোন বৌদ্ধধর্মানুশীলন কেন্দ্র ছিল না বলে প্রথমে তিনি গিয়েছিলেন বলাখে (ব্যাক্ট্রিয়া)। বলাখ থেকে গিয়েছিলেন চীনের সেই বিখ্যাত হোয়াইট হর্স মনেস্টরীতে। লোকোত্তম শুধু যে চীন দেশেই গিয়েছিলেন তা নয়—সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে সেই বিশাল দেশের বিভিন্ন নগরে, জনপদে, গ্রামে গ্রামে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে মহাস্থবিরের কালজয়ী ধর্ম প্রচারও করেছিলেন ; শ্বেত অশ্ব-বিহারে বসেই করেছিলেন একশো উনআশিটি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ। তার ভেতরে ১৬টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় ১৩০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত চীনা ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের তালিকা কা-ই-উয়ান্-লুতে (Ki-Yuan-Lu)। আর পঙ্কান্নটি গ্রন্থের নাম আছে নানজিও বুনিয়ার বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের ক্যাটলগে।

কোনো সুদূর অতীতের মধ্যএশিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির দূত লোকোত্তমের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে তাঁর রচিত 'মহানদান সূত্রে,' 'সামন্ত- -ধর্মার্থ-সূত্রে' এবং 'মার্গভূমি সূত্রে'।

আন-শে-কাও বা লোকোত্তমের প্রায় সমসাময়িককালে ভারতীয় এই বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন চীনে মধ্য-এশিয়ার আর এক সন্ন্যাসী—

চিলু-কিয়া-চাউ (Chilu-Kia-Chau)। (৫) আবার দেখা যায় এই রকম বানান (Tche Lou Kia Tchan)। এই চীনা নামটির অর্থ হলো লোকক্ষেম। লোকক্ষেমের আদি নিবাস ছিল তোখারিস্থানে। জাতিতে শক। তাঁরও বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কেন্দ্র ছিল হোয়াইটহর্স মনেস্টরী বা শ্বেত-অশ্ব-বিহার। ভারতীয় ধ্যান ধারণা-সংস্কৃতির এই দূত—তেইশটি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই অমূল্য গ্রন্থগুলির ভেতরে আছে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' যার আর এক নাম 'দশাসহাস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ও 'কাশ্যপ-পরিবর্ত' নামে দুইটি বিখ্যাত মহাযানগ্রন্থ আর আছে সংস্কৃত সূত্রপিটকের নানা বিচিত্র হীনযান সূত্র।

তাঁর তেইশটি গ্রন্থেরই নাম আছে পূর্ব-উল্লিখিত কা-ই-উয়ান্-লুতে এবং প্রখ্যাত মধ্যএশিয়া-বিশেষজ্ঞ প্রবোধ চন্দ্র বাগচীর সঙ্কলিত তালিকা 'Le Canon Bouddhique en China'তে। আর লোকক্ষেমের তেইশটি গ্রন্থের ভেতরে বারোটির নাম আছে জাপানী গবেষক নানজীও বুনিয়ার বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের তালিকায়।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর তুখারার বৌদ্ধশ্রমণ লোকক্ষেমের পরেই মধ্য-এশিয়ার সুগদ অর্থাৎ পারশ্য রাজ্যের পশ্চিমাংশ (বর্ত্তমান সমরখন্দ অঞ্চলের প্রাচীন নাম) থেকে এসেছিলেন—আন-হিউয়ান। (৬)

১৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। কিন্তু কিছুদিন পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই বিখ্যাত শ্বেত অশ্ব-বিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। চীনা ভিক্ষুদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ উগ্রাপরিপৃচ্ছ অনুবাদ করেছিলেন। নানোজীর তালিকায় (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) জানা যায় আন-হিউয়ানের আর একটি অসামান্য রচনা—

'আগমোক্ত দ্বাদশনিদান সূত্র'। এই গ্রন্থে আছে সর্বাস্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিদানের বারোটি কারণের বিশদ বিশ্লেষণ।

চি-ইয়াও (Tchi-Yao)। (৭)

জাতিতে শক অথবা ইউহি-চিহ। এই শক বৌদ্ধভিক্ষু যে এগারোটি সূত্র অনুবাদ করেছিলেন তার ভেতরে দশটির নাম আছে কায়-উয়ানলুতে। তাঁর দুইটি সূত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'সমুক্ত্যাগমে'র ভেতরে। এই দুইটি সূত্রের একটির বিষয়বস্তু হলো—দুষ্টপ্রকৃতির অশ্বের আটরকমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অসাধু প্রকৃতির মানুষের স্বভাবের তুলনা। আর একটি হলো—শান্ত ও সৎ প্রকৃতির অশ্বের তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ক্যাঙ-কি-ই-উ (Kang Kiu)। (৮)

ক্যাঙ-মঙ-সিয়াং (Kang-Mong-Siang)। (৯)

এই দুইজন সুগদীয় বৌদ্ধভিক্ষুর নাম আছে নানোজী বুনিয়ার বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থের তালিকায়। আর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচীর Le Canon Bouddhique en China-তে ক্যাঙ-মঙ-সিয়াং-এর কয়েকটি গ্রন্থের নাম

আছে যেমন—(১) কূর্মানিদান শ্রীপলহস্সূত্র, (২) নিদান চর্যাসূত্র ইত্যাদি।

এইবার গাঙ্গেয় উপত্যকার দেশ থেকে কাশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্নের পরে যাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার করেছিলেন মধ্যএশিয়ায় এবং চীনে তাঁদের ভেতরে বোধহয় অগ্রগণ্য হলেন—কাশ্মীরী বৌদ্ধপণ্ডিত—

সংঘভূতি (১০)

চীনা ইতিহাসে তাঁর নাম—সেঙ-কিয়া-পো-চে-ঙ (Seng-Kia-Po-Tcheng)। সেখানে আছে তিনি কি-পিন অর্থাৎ কাশ্মীরের অধিবাসী। ৩৮১ খৃষ্টাব্দে সংঘভূতি মধ্যএশিয়ার ভেতর দিয়ে চীনের রাজধানীতে গিয়েছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভেতরে সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মপিটকের বিরাট টিকা 'বিভাষাশাস্ত্র' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল এই গ্রন্থের অনুবাদ করতে তিন বৎসর কেটে গিয়েছিল। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতেও সংঘভূতির বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে লিখছে—Great Buddhist monk of 4th Century A. D.

শুধু সংঘভূতি নন। আরও অনেক কাশ্মীরী বৌদ্ধপণ্ডিত মধ্যএশিয়া এবং চীনে ভারতীয় ধর্ম এবং বৌদ্ধসংস্কৃতি বাণী প্রচার করেছিলেন। কাশ্মীর থেকে প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত বিমলাক্ষ, বুদ্ধভদ্র, ধর্মযশ, পুণ্যত্রাতানন্দী প্রমুখ মধ্যএশিয়া হয়ে চীনে গিয়েছিলেন।

স্বভাবতই কৌতূহল হয়, শুধু কাশ্মীর থেকেই এত বেশী সংখ্যক ভারতীয় বুদ্ধিজীবি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার দেশে তাঁদের দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

ভারত-রুশ মৈত্রীর ইতিহাস-গবেষকদের অনুমান খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভারত পর্যটনের (৩৯৯ খৃঃ) পর থেকেই এদেশীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল হিমালয়ের পরপারবর্তী দেশ—মহাচীন। ফা-হিয়েনের ঠিক একশো উনিশ বছর পর (৫১৮ খৃষ্টাব্দ) এসেছিলেন আর একজন চীনা বৌদ্ধভিক্ষু—

সোং-ইউন (Song Yun)। (১১) তিনি প্রায় তিনবছর ভারতে ছিলেন। সেই তিন বছরের ভেতরে কাশ্মীর এবং গান্ধারের বৌদ্ধবিহারেই

বেশিদিন বসবাস করেছিলেন। এই সময় সমগ্র উত্তরভারতের বৌদ্ধভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভবত ফা-হিয়েন এবং সোং-ইউন-প্রমুখ চীনা বৌদ্ধশ্রমণরাই খ্যাতিমান ভারতীয় পণ্ডিতদের তাঁদের দেশে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন।

আরও একটা কারণ জানিয়েছেন, প্রাচীন ভারত মধ্যএশিয়ার ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা (১২) কাশ্মীর ছিল সর্বাস্তিবাদ নামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। বৌদ্ধদের এই শাখার যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ভারতের প্রাচীন ভাষায় লিখিত সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধধর্ম বিদেশে প্রচারের দুর্বার আকর্ষণ-ই তাদের হিন্দুকুশ-পামীর ডিঙ্গিয়ে মধ্যএশিয়া এবং চীনে নিয়ে গিয়েছিল।

তাই মধ্যএশিয়ার ভূখণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্মকে প্রসারিত করার সেই মহতী প্রচেষ্টায় কাশ্মীরের অবদান অসামান্য। তাই চীনা ঐতিহাসিকরা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন (১৩)—Kashmir takes the leading part in the transmission of Buddhists traditions to China and Central Asia...

মধ্যএশিয়াগামী কাশ্মীরী বৌদ্ধভিক্ষুদের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো—

বিমলাক্ষ—(১৪) ইনি ছিলেন কাশ্মীরবাসী একজন বৌদ্ধভিক্ষু। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে বিমলাক্ষ মধ্যএশিয়ার খোটান, কাশগর হয়ে চীনে গিয়েছিলেন। চীনা অনুবাদে তাঁর নাম উই-কি-ইয়েন (Wu-Ke-Yen)। কুচ দেশীয় এবং মধ্যএশিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত কুমার-জীবের সহযোগী হয়ে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন।

বুদ্ধযশ—(১৫) কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। তের বছর বয়সেই তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আর যৌবনের প্রারম্ভেই মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পূর্বোল্লিখিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীবের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি চীনের চ্যাং-আন প্রদেশে যান। চারখানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। ৪১০ থেকে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের ভেতরে বৌদ্ধশাস্ত্র 'দীর্ঘাগম এবং 'ধর্মপুস্তক' অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে

আবার স্বদেশের মাটি কাশ্মীরেই ফিরে এসেছিলেন।

ধর্মমিত্র—(১৬) কাশ্মীরের বৌদ্ধপণ্ডিত। প্রথমে মধ্য-এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে ধর্মপ্রচার করে বেড়ান (৪২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। মধ্যএশিয়ায় পরিভ্রমন শেষ করে তিনি দক্ষিণ-চীনের নানাকিংএ চী-হুয়ান-সি-সি (Che-huan sse) অর্থাৎ জেতাবন বিহারে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। চীনা ইতিহাসে তাঁর নাম—ফা-সি-উ (Fa-siu) অর্থাৎ নিয়ম বা সূত্রের সমৃদ্ধিকারী বা ল ফ্রারিসিং ...তিনি মধ্যএশিয়া পরিভ্রমণ শেষ করে দক্ষিণ চীনের নানাকিং-এর চি-হুয়ান-সিসি—(Chi-huan-SSe) বা জেতাবন বিহারে এসেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বছর খানেক বসবাস করেছিলেন। তিনি বারোটি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়।

পুণ্যত্রাতা—(১৭)

আর একজন কাশ্মীরি বৌদ্ধপণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধ্যএশিয়ায় গিয়েছিলেন। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারজীবের সহায়তায় একটি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অনুবাদের কৃতিত্বে চীনের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর নামটি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ভারতের এই প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবি যাঁরা ঐহিক সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে দূর বিদেশে নিজের দেশের সংস্কৃতি এবং ধ্যানধারণাকে প্রচার করেছিলেন তাঁদের প্রায় কারো নাম-ই ভারতের কোন প্রাচীন ইতিহাসে নেই। তাঁদের অসামান্য কীর্তি, তাঁদের নাম এবং তাঁদের কঠিন দুঃখবরণের ইতিহাস—সব-সব কিছু-ই বিস্মৃতির অতলান্তে তলিয়ে যেত যদি চীনা ঐতিহাসিকরা এই কৃতী ভারতীয় সন্তানদের ইতিবৃত্ত না লিখে রাখতেন—

চীনা ইতিহাসে পাওয়া যায় পুণ্যত্রাতা বাংলা শব্দটির বর্ণান্তরিত চীনা শব্দ—ফো-জো-তো-লো (Fo-jo-to-lo) আর পুণ্যত্রাতার চীনা অনুবাদ হলো কঙ-তো-হুয়া (Kong-to hua)।

ধর্মযশ। (১৮)

ধর্মযশের চীনা জীবনীকারেরা জানাচ্ছেন, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কাশ্মীরেই ধর্মযশ পুণ্যত্রাতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ত্রিশবছর বয়সে মধ্যএশিয়ার যাত্রা

করেন। এবং চীনে গিয়েছিলেন ৩৯৭-৪০১ খৃষ্টাব্দে। ধর্মযশ তিনটি বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। চীনা ভাষায় ধর্মযশের বর্ণান্তরিত নাম হলো তান-মো-ইয়ে-চি (Tan-Mo-Ye-She) এবং তাঁর নামের চীনা অনুবাদ হলো-ফা-মিং কিম্বা ফা-চেঙ্গ অর্থাৎ নিউ গ্লোরি—নতুন গৌরব।

হিন্দুকুশের পরপারবর্তী মধ্যএশিয়ার ভূখণ্ডে কাশ্মীরী বৌদ্ধ-শ্রমণদের অসামান্য সাফল্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধভিক্ষুদের চঞ্চল করে তুলেছিল। উত্তর এবং মধ্যভারত থেকে যাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি মধ্যএশিয়া অর্থাৎ আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার মাটিতে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন —তাঁদের বিখ্যাত কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে দেওয়া হলো—

প্রভাকর মিত্র। (১৯)

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে আছে—প্রভাকর মগধের এক ক্ষত্রিয় সন্তান। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী শিক্ষার্থী। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের-ই খ্যাতিমান অধ্যাপক। আনুমানিক ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে দশজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তোখারিস্থানে গিয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙের সমসাময়িককালে তোখারিস্থান বা তুর্কীস্থান তুর্কীদের দ্বারাই শাসিত হতো। At the time of Hiuen-tsang, Tokharestan was under Turkish rule......আর কুন্দুজ নগর ছিল তুর্কী শাসনকর্তাদের অস্থায়ী রাজধানী।

ভারতের ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি আর ধর্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি প্রভাকর মিত্র এলেন কুন্দুসের রাজসভায়। ইতিহাস বলছে......Most famous professor of Nalanda Pradhakar Mitra was well received by Turkish Chief.....তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিল তুর্কী শাসনকর্তা। শুধু তাই নয়, যতদিন যতকাল প্রভাকর মিত্র কুন্দুসে ছিলেন, ততদিন প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। আর সেই ভারতীয় অধ্যাপকের গভীর প্রভাবে তুর্কমেনিস্তানের কুন্দুস ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল বৌদ্ধ ধর্মানু-শীলনের অন্যতম কেন্দ্র।

এইখানেই এই কুন্দুসেই প্রভাকর মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আর একজন চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু তা-মো-সেঙ-কিয়ার (Ta-Mo-Seng-Kia) (২০)

সঙ্গে। চীনা ভাষায় তা-মো-সেঙ কিয়ার অর্থ হলো 'ধর্মসিংহ'।

ধর্মসিংহ, প্রভাকর মিত্র সেখানে যাওয়ার অনেক আগে হিন্দুকুশ আর পামীরের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে ভারতে এসেছিলেন শুধু, ভারতীয় দর্শন শিক্ষার তীব্র আকর্ষণে। ভারতের ধর্ম, ভারতের বিদ্যা আর সংস্কৃতি ও দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য খোটান, কাশগড়, তাসখন্দ সমরকন্দ অঞ্চলের মানুষের মনে তিনি রাজার মহিমায় বিরাজ করতেন। তারা গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর নাম দিয়েছিল ফা-ত্ সিয়াঙ্ (Lawmaker)। হিউয়েন সাঙের বিবরণেও আছে এই তা-মো-সেঙকিয়ার ইতিবৃত্ত। তাঁরই সহযোগিতায় প্রভাকর মিত্রের সেই মধ্যএশিয়ার দিকে দিকে বৌদ্ধ ধর্মের সহজ সরল সূত্রগুলো প্রচার করার স্বপ্ন সত্যে রূপায়িত হয়েছিল।

ভারত ও মধ্যএশিয়ার সখ্যতাবন্ধনের প্রচেষ্টায় পূর্বসূরী এই প্রভাকর মিত্রের বিচিত্র অবদান রেণু রেণু হয়ে মিশে রয়েছে তাসখন্দ, সমরকন্দ, কাশগড়, কুন্দুসের মাটিতে। আরও যারা ভারতভূমি থেকে মধ্যএশিয়ায় গিয়েছিল, ছড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ধ্যানধারণা আর সংস্কৃতি অনুরণন তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

অতিগুপ্ত (২১)—মধ্যভারতের একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। আধুনিক কালের মধ্যসোভিয়েত এশিয়ার দক্ষিণবাহী পথ ধরে তাকলামাকান মরুভূমি অতিক্রম করে কুন্‌লুন পাহাড়ের নিচে তদানীন্তন কালের (৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র খোটানে (বর্তমান চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে সিকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত খোটান নদী তীরবর্তী এক সমৃদ্ধ জনপদ) কিছুকাল অবস্থান করে চীনের রাজধানীতে গিয়েছিলেন। সেখানে ৬৫৩ এবং ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

অজিত সেন—(২২)—উত্তর ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য সোভিয়েত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে একদা বিদ্যায় সংস্কৃতিতে উন্নত কুচি প্রদেশে (বর্তমানে মধ্য চীনের পশ্চিমে সিংকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত) গিয়েছিলেন। এই কুচিতে বসেই তিনি তিনটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদও করেছিলেন।

উপশূন্য—(২৩)—উজ্জয়িনীর বৌদ্ধ ভিক্ষু। পাড়ি দিয়েছিলেন ৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে খোটানে। ছয়টি বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুমারজীব—(২৪) বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত কুমারায়নের পুত্র। কুমারায়ন কুচি প্রদেশের রাজপুত্রীকে বিয়ে করেন। কুমারজীব কাশ্মীরে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ৪০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চ্যাং-আনে পৌঁছান এবং অনেক কাজ করেন। চীনা ভাষায় ১০৬টি অনুবাদ আছে। মনস্বী এবং পণ্ডিতপ্রবর বলে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়াতে।

জিনগুপ্ত—(২৫) গান্ধার রাজ্যের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। মধ্যএশিয়ার দেশ দেশান্তরে ধর্ম প্রচার করার পর চীনে গিয়েছিলেন (৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আবার কাশগরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তুর্কীদের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন। ইনি ৩৯টি বই অনুবাদ করেছিলেন।

ধর্মচন্দ্র—(২৬) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খ্যাতিমান শিক্ষার্থী। সম্ভবত পূর্বভারতের কোনো অঞ্চলের অধিবাসী। মধ্য এশিয়ার কুচিতে যান (৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) চীনা ভাষায় অনূদিত এঁর একটা মাত্র বই পাওয়া যায়।

ধর্মগুপ্ত—(২৭) ইনি ভারতের লাটরাজ্যের বাসিন্দা। কনৌজে কিছু শিক্ষালাভ করেন এবং টক্ক ও কপিস রাজ্যে কিছুকাল কাটিয়ে পরে মধ্য এশিয়ার (৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) পথ ধরে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে এসে পৌঁছান।

ধর্মরক্ষ—(২৮) ভারতীয় ও শক বংশোদ্ভূত আর এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন পল্লীতে, জনপদে, ধর্মপ্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। খোটানের কাছে সমৃদ্ধ পল্লী 'নিয়া' থেকে দক্ষিণবাহী পথের ওপরে এক জনবহুল ও বর্ধিষ্ণু শহরে ধর্মরক্ষের জন্ম হয় এক কুশান পরিবারে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি। তাই তিনি ভারতীয় ভিক্ষু হিসেবেই পরিচয় দিতেন। ভারতীয় বলেই সংস্কৃত শেখা তাঁর কাছে সহজ হয়েছিল। আবার জন্মস্থান 'তুন্ হোয়াং' ছিল মূলত চীনা পল্লী। তাই অতি শৈশবেই চীনা ভাষায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। প্রথম যৌবনে 'তুন্-হোয়াং' ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে চীনে গিয়েছিলেন ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি সব মিলিয়ে ২১১টি বই অনুবাদ করেছিলেন।

পুণ্যমোদয় নন্দী—(২৯) মধ্যভারতের একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মধ্য এশিয়ার তোখারিস্তানে (আধুনিককালের আফগানিস্থান, পারস্যের সীমানায় অবস্থিত গণতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত)

গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রপথে চীন দেশে যান ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি চীনা ভাষায় ৮টি বই অনুবাদ করেছিলেন।

নরেন্দ্র যশ—(৩০) ইনি ছিলেন উত্তরভারতের উড্ডিয়ানের এক বৌদ্ধ শিক্ষক। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আর একজন দূত। ৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ছেড়ে মধ্য এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার করে বেড়ান। ৫৫৮ থেকে ৫৮৫ এই সাতাশ বছরে তিনি ১৫টি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

বোধিরুচি—(৩১) উত্তরভারতের আর একজন বৌদ্ধ শিক্ষক। ইনিও মধ্য এশিয়ার খোটান হয়েই ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের রাজধানী লো-ইয়াং-এ এসে পৌঁচেছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ সাতশো বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুবাদ করেছিলেন ৩৯টি বই চীনা ভাষায়।

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন মৃত্তিকার খাঁটী দেশজ সন্তান আরও কয়েকজন যাঁরা সোভিয়েত মধ্যএশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নাম ধাম কালানুক্রমিকভাবে দেওয়া হলো।

গৌতমসংঘদেব (৩২)	কাশ্মীর	৩৮৪ খৃষ্টাব্দ
গুণবর্মণ (৩৩)	„	৪৩১ „
গুণবৃদ্ধি (৩৪)	মধ্যভারত	৪৭৬ „
ধর্মরুচি (৩৫)	দক্ষিণভারত	৫০১ „
বুদ্ধশান্ত (৩৬)	উত্তরভারত	৫২০ „
গৌতম ধর্মজ্ঞান (৩৭)	বারাণসী	৫৩৮ „
জিনযশ (৩৮)	মগধ	৫৬৪ „
বোধিরুচি (২) (৩৯)	দক্ষিণভারত	৬৯২ „
আদিসেন (৪০)	কাশ্মীর	৬৯৩ „

মধ্যসোভিয়েত এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রচারের গৌরব আছে এদেশের আরও অনেক অনেক বুদ্ধিজীবির। সেই তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। আর মনে হয়, পূর্ণ তালিকা বোধ হয় সম্ভবও নয়। যাঁরা কোন গ্রন্থ অনুবাদ করেননি, চীনা ইতিহাসে যাঁদের নাম নেই, কিন্তু দুরদুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার দেশে পৌঁছেছিলেন এবং

বিভিন্ন জনপদে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন তাঁরা হয়তো অনেকেই বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গিয়েছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা বাহ্লীক (বলাখ), আফগানিস্থান থেকে মধ্যএশিয়ার পূর্বপ্রান্তে তারিম নদীর অববাহিকায় কারাশর, তুর্ফান, কুচা এবং পশ্চিমে কাশগড় হয়ে উত্তরাবাহী পথ ধরে কিংবা খোটান, লৌলান এবং ইয়ারকন্দ হয়ে দক্ষিণবাহী রাস্তা ধরেই গিয়েছিলেন চীনে। (৪১) দক্ষিণবাহী এই পথটি-ই চীনদেশের উত্তরাঞ্চলের শানমি এবং হুনান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহী এই দুইটি পথ ধরেই খৃষ্টীয় সেই প্রথম শতকের গোড়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সার্থবাহরাও চীনে যেত বাণিজ্য করতে।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই ভারতীয় বণিকরা যেখানে উপরোক্ত দুইটি পথ পশ্চিমে মিলিত হয়েছিল সেই কাশগড়ে, এবং তিব্বত ও ভারতের নিকটবর্তী এবং ইয়ারখন্দের দুইশো মাইল পূর্বে খোটানে ও মধ্যএশিয়ার আরও অন্যান্য বহু জনপদে বসতি স্থাপনও করেছিল। সার্থবাহদের বিভিন্ন উপনিবেশের ভিতর দিকে প্রসারিত পথ ধরেই যে বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রায়ই বণিকদের সহযাত্রী হয়েই চলে যেতেন পূর্বের দেশ চীনে তার প্রমাণ ঘোষণা করছে—আধুনিককালে খোটান শহরের (চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে সিঙ্কিয়াং প্রদেশের অন্তর্গত) সাত মাইল পশ্চিমে মরুভূমির বালুতে বিশাল ধ্বংসস্তূপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা নিদর্শন। (৪২) তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যসোভিয়েত এশিয়ার ভারত সংস্কৃতি প্রচারের অধিনায়ক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুদের উত্তরসূরী সেই স্মরণাতীত কালের অজ্ঞাতনামা শত শত বণিকরা।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্যএশিয়ার পথে প্রান্তরে আর অসংখ্য গিরিগুহায়। হিন্দুকুশের বামিয়েন গিরিপথের কথা আগেই বলা হয়েছে। খোটান থেকে চীনে যেতে পূবদিকে তুন হোংয়াংএর গুহামন্দিরের গায়ে আকীর্ণ চিত্রগুলিতেও অজন্তার প্রাচীন চিত্রের ছাপ পরিস্ফুট।

১৯০০, ১৯০৬ এবং ১৯১৩ ১৬ সালে এই তিনবার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে মধ্যএশিয়া-বিশেষজ্ঞ প্রত্নবিদ অরেল স্টেন খোটানে, কাশগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে পেয়েছেন যে বৌদ্ধমূর্তি, অসংখ্য চিত্রিত পট, ব্রাহ্মীলিপিতে

লেখা পুরানো রাশি রাশি পুঁথিগুলি, তাও তো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নই বহন করছে।

খোটানের কাছেই উত্তর-পূর্বে সেযুগের সমৃদ্ধ জনপদ— দান্দান উইলকি। এখানেই উক্টর স্টেন আবিষ্কার করেছিলেন ভগবান তথাগত এবং বোধিসত্ত্বের প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেওয়ালচিত্রের ভগ্নাংশ, ভারতীয় রূপকথায় বিভিন্ন ফ্রেস্কো, অষ্টম শতাব্দীর চীনা মুদ্রা এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা রাশি রাশি পুঁথি। (৪৩)

এই দান্দান উইলকির পূর্বদিকে মিরান নামে গ্রামের মাটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের কয়েকটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে যে সব বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার ভিতরেও বিশুদ্ধ ভারতীয় ও গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই মিরানেই পাওয়া গিয়েছে ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালায় (Indian Brahmi alphabet) এবং খোটানীয় শক ভাষায় লেখা অনেক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ। তিব্বতী এবং সংস্কৃত থেকে সুগদীয় এবং শক ভাষায় অনূদিত কিছু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। (৪৪)

মধ্যএশিয়ার দক্ষিণবাহী পথ বেয়েই ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল সুদূর চীনসীমান্তের ইউমেন গিরিখাতে। এই গিরিবর্ত্মের খুব কাছাকাছি ছিল আর একটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান— তুন্-হোয়াং (বর্তমানে চীনের উত্তর পশ্চিমে কানসু প্রদেশে অবস্থিত)। কাশগড় ও খোটান থেকে দীর্ঘ মরুপথ পেরিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুরা এসে পৌঁছাত তুন্-হোয়াং-এ।

দূরদুর্গম পথ অতিক্রম করতে করতে যখন ক্লান্তির ভারে ভেঙে আসতো তাদের শরীর তখন তাদের চোখে পড়তো—শান্ত রসাস্পদ তপোবনের মতো একটি নিভৃত পল্লী—তুন্-হোয়াং। (৪৫) গ্রামের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। দূর থেকে নজরে পড়ে তার সংকীর্ণ নীলোজ্জল রেখা। সেই নদীর দুপাশে খাড়া পাহাড়। নিবিড় সবুজ অরণ্যে আচ্ছন্ন সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক একটা গুহা যেন দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতছানি দিয়ে ডাকতো। নিভৃতে কিছুকাল বিশ্রাম এবং সাধন ভজন করার জন্য তাদের মন তৃষিত হয়ে উঠতো। তারা একে একে গুহাগুলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কালক্রমে এই গিরিগুহাগুলি হয়ে উঠল এক

একটি পবিত্র বৌদ্ধ মন্দির। ভারতীয় ভিক্ষুরা গুহাগুলির গায়ে গায়ে অজন্তার অনুকরণে চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত করল। তুন-হোয়াং হয়ে উঠল বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার একটি কেন্দ্র।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে এই তুন্-হোয়াং-এর গুহামন্দিরে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধভিক্ষুদের অনুবাদসভার বৈঠক বসতো। এই অনুবাদ সভার যে বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায় তা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হলো—

সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধগ্রন্থ সুগ্দীয় (Soghdian), খোটানী (Khotanese), তুখার (Tokharin), কুচিয় (Kuchean), তুর্কি (Turkish), তিব্বতী (Tibetan) ইত্যাদি মধ্যএশিয়ার তদনীন্তন কালের ভাষায় অনুবাদ করার একটা বিশেষ প্রণালী ছিল।

অনুবাদ সভার (৪৬) মাঝখানে বসে ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত মৃদু কণ্ঠে পড়ে যেতেন বৌদ্ধগ্রন্থ। বিদেশী দোভাষী বৌদ্ধভিক্ষু তা মুখে মুখে অনুবাদ করে দিতেন। যে ভাষায় অনুবাদিত হবে সেই ভাষায় অভিজ্ঞ আর একজন বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলতেন। প্রধান অনুবাদক (ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কৃত কিম্বা সুগ্দীয় কিংবা খোটানী যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে এবং দুটো ভাষায় সমান দক্ষ) অনুবাদের জটিল অংশগুলি দেখে দিতেন এবং প্রয়োজন হলে পুনরালোচনা করতেন। এই ভাবেই সংস্কৃত ভায় লেখা হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আমুদরিয়ার উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কালে কালে তিল তিল করে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে ভারত ও মধ্যএশিয়া তথা আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার মৈত্রীবন্ধন।

আর নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা মধ্যএশিয়ার দিকে দিকে বৌদ্ধধর্ম ও ধ্যানধারণাকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে আবিষ্কৃত হচ্ছে আরও অনেক বিচিত্র পাণ্ডুলিপি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত কাশগড়ে খোটানে এবং তুন হোয়াং-এর গুহামন্দিরে অরেল স্টেইন এবং পল পোলিও আবিস্কৃত মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় অনূদিত রাশি রাশি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ছাড়াও

খাদালিকের (কাশগড়ের কাছে) ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গিয়েছে তুর্কীস্থানী আর্য ভাষায় (Turkistani Aryan language) অনূদিত বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বজ্রচ্ছেদিকা এবং অপরিমিতাসূত্রের কয়েকটি জীর্ণ পৃষ্ঠা (৪৭)। কাশ্মীরের গিলগিটে পাওয়া গিয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ (৪৮)।



এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি — পৃষ্ঠা

(১) Le Canon Boudhique en China. Tom I. P. C. Bagchi. — 8

(২) History of religious beliefs and Philosophical Opinions in China. Wieger, Leo. (Tr. by E. Warner) — ৩৪৩

(৩) Le Canon Boudhique en China. Tom I. P. C. Bagchi. — ৩-৮

(৪) Ibid — Ibid — ৮

(৫) Ibid — Ibid — ৩৭

(৬) Ibid — Tom II — ৫২২

(৭) Ibid — Tom II — ৫০

(৮) Ibid — Ibid — ৫২

Also in Nanaji Buniya's Appendix II. — ৮

(৯) Le Canon Boudhique en China. Tom I.
P. C. Bagchi. ৫৩

Also in Nanoji...App. II. ১২

(১০) Ibid Tom I ১৬০

(১১) Ibid Ibid ২৬৯

(১২) ভারতও চীন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৮-৯

(১৩) In tne forward of the 'Buddhism in Central Asia'
by Dr. Kshanika Saha নলিনাক্ষ দত্ত ১

(১৪) Le Canon Boudhique en China. Tom I.
P. C. Bagchi. ৩৩৮

(১৫) Ibid — Ibid ২০০-২০৪

(১৬) Ibid — Ibid ৩৮৮

(১৭) Ibid — Ibid ১৭৬-৭৭

(১৮) Ibid — Ibid ১৭৪-৭৬

(১৯) Ibid — Tom II ৪৬৮

(২০) Ibid — Tom I ৩৯

(২১) Ibid — Tom II ৪৯৯

(২২) Ibid — Ibid ৫৬৭

(২৩) Ibid — Tom I ২৬৫-৬৭

(২৪) Central Asia, the Connecting link between
East and West. J. Nobel. ২২

(২৫) Le Canon Boudhique en China. Tom II
P. C. Bagchi. ৪৪৬

(২৬) Ibid Ibid ৫৬৫

(২৭) Ibid Ibid ৪৬৪-৬৭

(২৮) Ibid Tom I ৮৩-১১৪

(২৯) Ibid Tom II ৫০০-৫০৩

(৩০) Le Canon Boudhique en China. Tom I P. C. Bagchi ২৭০-২৭১

(৩১) Ibid Ibid ২৫২-২৬০

(৩২) Ibid Ibid ২৭০-২৭১

(৩৩) Ibid Ibid ৩৭০-৩৭৫

(৩৪) Ibid Ibid ৪১০-৪১১

(৩৫) Ibid Ibid ২৪৬-২৪৭

(৩৬) Ibid Ibid ২৫০-২৫২

(৩৭) Ibid Tom II ৪৩৯-৪৪০

(৩৮) Ibid Tom I ২৭৪ ৭৫

(৩৯) Ibid Ibid ২৮৬

(৪০) Ibid Tom II ৫২২

(৪১) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ২৩১

(৪২) The History of the Discovery and Exploration of Chinese Turkistan. J. A. Dabbs. ১১৯

(৪৩) Ancient Art of Central Asia. T. Talbot-Rice ১৮৮

(৪৪) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ২৩১

(৪৫) The History of the Discovery and Exploration of Chinese Turkistan. J. A. Dabbs ১৪৮

(৪৬) ভারত ও চীন প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১০-১১

(৪৭) Fragments of Buddhist work in ancient Aryan langue of Chinese Turkistan in Memoirs of Asiatic Society of Bengal, 1918. ১৩-১৪

(৪৮) Buddhist Manuscripts at Gilgit in Indian Historical Quartarly. 1936 নলিনাক্ষ দত্ত ১০৯

ছয়

সিল্করুট : ভারত-রুশ মৈত্রী সেতু

অতি সামান্য আর নিরীহ একটা রাস্তা।

কখনো নিবিড় পার্বত্য অরণ্য, কখনো ভয়ভীষণ গিরিখাত, আবার কখনো ধূ-ধূ দিগবিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে সেই দুর বিসর্পিল পথ। এই দীর্ঘ রাস্তাটির দু-দিকে জনশূন্য এক একটা ভূভাগ, এবং চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতির নির্বিকার নীরবতাকে বিঘ্নিত করে ঘন্টার শব্দ শোনা যায় —ডিং-ডং-ডিং-ডং—

সেই বহু দূরাগত ঘন্টাধ্বনি মরুবাতাসের সওয়ার হয়ে দূরদিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। আর ক্ষণকাল পরেই সেই নিঃসীম বালুবিস্তারের দূরে—বহুদূরে প্রেতচ্ছায়ার মত দেখা যায় সওদাগরদের কাফিলা (ক্যারাভান)। ওরা আসছে।

আসছে বলাখ (প্রাচীন নাম বহ্লীক, আধুনিককালের উত্তর আফগানিস্থানের একটি জেলা) থেকে, আসছে উত্তরভারত, মূলতান, গুজরাট থেকে, আসছে খোরাসান থেকে, আসছে সুগ্দ (আধুনিককালের সমরকন্দ) থেকে, তুখারা (তুর্কমেনিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র) থেকে। মধ্যএশিয়ার দেশদেশান্তরের বণিকদের এই কাফিলা চলেছে এখন সেই দিগন্তবিসারী তাকলামাকান মরুভূমি পেরিয়ে দূরে—বহুদূরে তারিম নদীর অববাহিকায় শান্তরসাস্পদ স্নিগ্ধ মরুদ্যানের দেশে। কিন্তু—

কিন্তু তাদের গন্তব্যস্থল আরও অনেক—অনেক দূরে। এই দুঃসাহসী সওদাগরদের ভেতরে কেউ কথা বলছে সুগ্দীয় (প্রাচীন পার্শী) ভাষায়, কেউ বলছে তিব্বতীয় ভাষায় কি তু খারিয় ভাষায়। তাদের ভাষা যেমন ভিন্ন

ভিন্ন তেমনি তাদের পোষাকে, চাল-চলনে আচারে ব্যবহারেও পার্থক্য প্রচুর। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মনের ভেতরে জলজল করছে একটি—একটি মাত্র বাসনা—যেতে হবে—যেতে হবে রেশমের দেশে—চীনে।

চীন থেকে রেশম নিয়ে সুদূর পশ্চিমের দেশ রোমে চালান দিতে পারলে প্রচুর-প্রচুর লাভ। লাভের আশাতেই তারা হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, বিষধর সাপের চেয়েও ভয়াবহ মরু-ডাকাত, আর প্রেতযোনিবিশিষ্ট অপ-দেবতাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে কণ্টকাকীর্ণ সেই বন্ধুর দীর্ঘ পথে যাত্রা করে। তাদের কারো হাতে থাকে পাকানো বাঁশের লাঠি, কারো থাকে রুশী তলোয়ার।* আরও নানাবিধ ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু—সবচেয়ে বড় অস্ত্র—মনের বল।

এই দূরপ্রসারিত পথের বাঁকে বাঁকে কখনও পাহাড়ের পাথরের আড়ালে কোনো দূর দেশের অজ্ঞাত বণিকদের কবর এবং মরুভূমির বালিতে ছড়ানো তাদের কয়েকটি কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হতভাগ্য সওদাগরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে তাদের বুক ভারী হয়ে ওঠে। দূরে তাকলামাকান মরুপ্রান্তরের অন্তহীন বাহুবিস্তারের দিকে তাকিয়ে ওদের দুর্ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। আশঙ্কার কালো ছায়া থর থর করে কাঁপে তাদের চোখে। তবুও—

তবুও ওরা যায়। যেতে বাধ্য হয়।

ডিং-ডং-ডিং-ডং—

সওদাগরদের কাফিলা মরুভূমির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। এই-বার দুস্তর মরু অতিক্রম করতে হলে বণিকদের কতগুলি প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে এই দুঃসাহসী ও বিপদসঙ্কুল অভিযানের গোড়ার কথা জানা দরকার।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রাচীন এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব রাজ্য সিলিসিয়া (আধুনিককালের তুরস্কের আর্মেনিয়া) থেকে মেসোপটেমিয়া (তাইগ্রীস ও

---

* স্মরণাতীত কাল থেকে রাশিয়ার ধাতুর কাজ ছিল খুব বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে লাহোরের কবি মাসুদ সৈয়দ সুলেমান রুশী তলোয়ারের জয়গান গেয়েছেন। তলোয়ার ও শিরস্ত্রাণের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা আছে আমীর খসরুর লেখায় Pharat R. W. Kemp. P, 6.

ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী জনপদ, আধুনিক ইরাণের অন্তর্গত) হয়ে অ্যাসিরিয়া (তাইগ্রীস নদী তীরের মাঝামাঝি অঞ্চল), মিডিয়া, (উত্তর-পশ্চিম ইরান), পার্থিয়ার (উত্তর-পূর্ব ইরান) ভেতর দিয়ে কাস্পিয়ানের দক্ষিণ তীর ধরে হামাদান (উত্তর ইরান) আমুদরিয়া-সিরদরিয়ার অববাহিকায় সমরখন্দ তাসখন্দ (আধুনিককালের মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার উজবেকিস্থানের অন্তর্গত) পেরিয়ে তাকলামাকানের মরুভূমির ওপর দিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রসারিত এই সুদীর্ঘ সড়কটি প্রাচীন দিনের (খ্রীষ্টের প্রথম শতক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং রাস্তাঘাটের নির্ভরযোগ্য দলিল পেরিপ্লাস অফ এরিথ্রেইয়ান সী (Periplus of Erythraean Sea) কিম্বা লোহিত সাগরের বিবরণীতে (১) টলেমির ভূগোলে (২) প্লিনির ইতিহাসে খ্যাত হয়ে রয়েছে একটি বিচিত্র নামে—সিল্ক রুট।

এখানেই বলে রাখা দরকার, সেই সুদূর অতীতে (প্রায় দু-হাজার বছর আগে) এই সিল্ক রুট ধরে ঠিক কোন কোন দেশের কোন সওদাগরেরা যেত তাদের নাম ধাম অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ এবং এই অভিযান শেষ করতে কতদিন লাগতো, আবার যেত কিনা—তাদের অভিজ্ঞতার সঠিক কোনো জবানবন্দী পাওয়া যায় না বলেই টলেমি বলেছেন, (৩) Such men were merchants pure and simple and they never seemed to bring back any interesting information abut the land they traversed.

অর্থাৎ সওদাগররা কট্টর ব্যবসায়ী। তাই তারা যেসব দেশের ওপর দিয়ে গিয়েছে তার কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য রেখে যায় নি।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির আক্ষেপোক্তি—দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়েছে তারা (বণিকরা) দুটো পয়সার লোভে, জ্ঞানার্জনের জন্য নয়। তাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলে গেলে ভাবীকালের মানুষের কাছে সমুদ্রযাত্রা কত যে নিরাপদ হতো—তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না—

তাহলে সিল্করুটের কথা জানা গেল কেমন করে? জানা গিয়েছিল এই দুর্গম পথের এক অভিযাত্রীর কাছে থেকে। নিঃসন্দেহে আধুনিককালের সভ্য পৃথিবীর মানুষ তার কাছে ঋণী থাকবে। তাও সিল্করুটের

যাত্রীটি এই পথটার আগাগোড়া পরিভ্রমণ করেননি। তবে তাসখন্দ থেকে তাকলামাকান মরুভূমি পার হয়ে রেশমের দেশ চীনে গিয়েছিল। সিসিলা থেকে তাসখন্দ পর্যন্ত বাদবাকী রাস্তাটা সম্বন্ধে তাঁর ব্যবসাতে নিযুক্ত কর্মচারী বা এজেন্টদের এবং এই দীর্ঘ পথের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রের সওদাগরদের কাছে শুনে ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এই সিল্করুটের যে সমীক্ষা করেছিলেন সেটা বলেছিলেন টলেমির (৯০-১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) ঘনিষ্ট বন্ধু এবং সতীর্থ আর এক গ্রীসীয় ভূগোলবিদ্ মেরিনাসকে (Marinus—70-130 A. D.)। মেরিনাসের রেকর্ডকে ভিত্তি করে টলেমিই প্রথম পৃথিবীবাসীকে শুনিয়েছিলেন সিল্করুটের বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

সিল্করুটের কথা যিনি বলেছিলেন মেরিনাসকে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার এক রেশমকারবারীর ছেলে। তাঁর নাম—ম্যায়িস (Maes)। আর রোমান নাম —টিটিয়ানাস (Titianus)।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সিল্করুটের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটা ম্যায়িস বর্ণিত বিবরণ, এবং যেহেতু তিনি তাসখন্দ থেকে তাকলামাকান মরু পেরিয়ে চীনে গিয়েছিলেন অতএব নিঃসন্দেহে তাঁর উক্তি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলা যায়। এবারে তুষারশুভ্র দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় যেমন হিন্দুকুশ, পামীর, তিয়েনশান এবং গোবি তথা তাকালামাকান মরুভূমিতে কন্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথের বাধাগুলির কথা টলেমি লিখিত সিল্করুটের বিবরণের ভিত্তিতে ম্যায়িসেরই জবানীতে বলা হলো—

আমাদের কাফিলা মরুভূমির সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি বলেছি এই মরুপথ পেরিয়ে যেতে হলে সওদাগরদের কতকগুলি প্রস্তুতি নিতে হয়।

প্রথমত নবাগতদের বলতে হয় মরুভূমিতে নেমেই তারা যেন কানদুটোকে ঢেকে রাখে। তার কারণ, একটানা সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দ আর বালুর ঝড়ের গোঙানির ভেতরে হঠাৎ মেয়েলী গলায় মিষ্টি গানের কোন মধুর সুর শোনা যেতে পারে। নতুন যারা এসেছে তাদের মনে হবে, দূরে বহুদূরে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ীর আড়ালে বসে কোনো মেয়ে বুঝি গান গাইছে, অমনি ছেলে ছোকরা কারবারীরা উটের পিঠ থেকে নেমে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে সেই

দিকে। তারা যত কাছে যায় গানের সুরও তত দূরে দূরে সরে যায়।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় বালুর ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে তারা। নাকের দুপাশে জমাট রক্ত। বুড়োরা বলে, মরুদানবীর কাণ্ডকারখানা এসব। গান গেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকে টিপে মারে।

কান ঢেকে রাখা দরকার আর এক কারণে। মরুভূমিতে কখন বালুর ঝড় উঠবে-কেউ বলতে পারে না। ঝড় শুরু হলে তখনও যদি কারও নাক মুখ, কান খোলা থাকে তাহলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত কানদুটো বালুতে বুজে যাবে। অন্ধ হয়ে যাবে চোখ। এই জন্যই ঝড় আরম্ভ হলে গোটা কাফিলাকেই থামিয়ে দিতে হয়। উটগুলিকে বসিয়ে তার আড়ালে মাথা গুঁজে বসে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা।

এক এক সময় চার পাঁচদিন ধরে এই ঝড় সমানে চলতে থাকে। যখন ঝড় থামে তখন দেখা যায় বালুস্তরের ভেতরে হারিয়ে গিয়েছে পথের রেখা। বহু খুঁজেও কাফিলার শেষে যে সশস্ত্র রক্ষীরা (Rear guard) থাকে তারা আর আমাদের খুঁজে পায় না।

তাছাড়া ডাকাত কি আদিবাসীদের অত্যাচার তো আছেই। হঠাৎ কখন নেকড়ের দল কাফিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সর্বস্ব লুটে নেবে কেউ বলতে পারে না। ডাকাতি বা রাহজানি হয় ধরার সময়। তার কারণ দিনে যে মরুভূমিতে চলা যায় না। যেতে হয় রাত্রে। আকাশের তারা-গুলোর দিকে তাকিয়ে পথ চিনে যেতে হয়। নিশি রাতে উট বা ঘোড়ার পায়ের খুরের খট-খট শব্দের সঙ্গে একটানা ঘন্টাধ্বনি ডিং-ডং—শুনেই হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে কুকুর ডেকে ওঠে। কুকুরের চিৎকারে জেগে ওঠে হয়তো কোনো কৃষক কি রাখাল ছেলে। একটু পরেই উটের ঘন্টাধ্বনি মিলিয়ে যায়। আবার গভীর ঘুমের ভেতরে তলিয়ে যায় সেই কৃষক, রাখাল আর কুকুর। শুধু সারাটা মরুভূমি জুড়ে সোঁ সোঁ হাওয়া গোঙাতে থাকে—

তুষারাবৃত দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ পামীরের সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করার রোমাঞ্চকর বিবরণও আছে গ্রীক সওদাগর ম্যাস্নিস টিটিয়ানাসের বিবরণে। মোটের ওপরে সিল্করুটে ভ্রমণ মানেই—Such journey is food for dreams. (৪)

টলেমি তাঁর সমসাময়িককালের এই পথের যাত্রীদের এবং ম্যাস্নিসের

কাছে জেনে যেসব জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলো এখানে বলা হলো—

ভূমধ্যসাগরের তীরে সিলিসিয়া থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এই সিল্করুটের দৈর্ঘ এগারো হাজার কিলোমিটার। এই পথের ঠিক মাঝখানে দেশ-দেশান্তরের সওদাগরদের মিলনকেন্দ্র তাসখন্দ অর্থাৎ আধুনিককালের উজবেক সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের রাজধানী। সিলিসিয়া থেকে রেশমের দেশে পৌঁছতে ঠিক কতদিন লাগতো কেউ বলতে পারে না। তবে মধ্যএশিয়া থেকে চীনে যেতে লাগতো সাত মাস। তাসখন্দ থেকে তারিমের অববাহিকায় চীনের সীমানায় পৌঁছতে লাগতো। এই পথ ব্যবহার করতো সবচেয়ে বেশি দুই ধরণের পথিকরা—ব্যবসায়ী এবং সৈনিক।

এই প্রাচীন বাণিজ্যপথটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত গবেষক জার্মেইন মারলেন্স (Germain Merlance) জার্নাল অফ দি রয়্যাল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি (Journal of the Royal Central Asian Society) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেছেন (৫)—স্মরণাতীতকাল থেকেই এই বাণিজ্যপথটি ছিল সমগ্র এশিয়ার জীবনসরণী—আর মধ্যএশিয়ার দেশদেশান্তরে ভেতরে এবং রুশভারত মৈত্রীতেও তার অবদান অপরিসীম। পরিশেষে মন্তব্য করেছেন—It can be said without exaggeration that this trafic artery. traversing the whole width of Asia, is the longest and from a cultural, historical standpoint, the most significant connecting link between peoples and countries.

ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই সিল্ক রুটের আরও শাখা-প্রশাখা ছিল। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের সঙ্গে ভারতের যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ পেরিপ্লাসের এই উক্তি (৬)—**At Bactria this overland trade route (silk route) branched again, following westward through the Parthian highlands to the Euphrates or southward to Bamian (Pamir), the Cabul Valley, the Khyberpass and the Indus. From Taxila the highway of Maurya dynasty led through the Punjab to**

the Capital at Palibothra, with a branch from Mathura southward to Ozene and Decan......

ব্যাক্ট্রিয়ার কাছে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটা অংশ পশ্চিম-মুখী হয়ে পার্থিয়ার (দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন রাজ্য, আধুনিককালের উত্তর-পূর্ব ইরান) পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে ইউফ্রেতিস নদীর দিকে চলে গিয়েছিল। আর একটা অংশ দক্ষিণে পামীরের বামিয়ান গিরিপথের ভেতর দিয়ে কাবুল উপত্যকা ও খাইবার গিরিপথ এবং সিন্ধু হয়ে চলে এসেছিল তক্ষশিলা পর্যন্ত। তক্ষশিলা থেকে পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে পালি-বোথারা অর্থাৎ মৌর্যরাজ্যের রাজধানী মগধ পর্যন্ত প্রসারিত এই বাণিজ্য পথটি মথুরায় আবার সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিল।

এই পথ ধরে উত্তরভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সওদাগরেরা যে মৌর্যযুগে বক্ষুনদীর উপত্যকায় (oxus valley) দেশে ব্যবসা করতে যেত এবং বিভিন্ন জনপদে যে তারা উপনিবেশও স্থাপন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক মধ্যসোভিয়েত এশিয়ার উক্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ভিতরে ভারতীয় শিল্প তথা ধ্যাণ-ধারণার সুস্পষ্ট প্রভাবে।

গ্রীক ব্যবসায়ী ম্যায়িসই প্রথম সিল্ক রুটের কথা জানিয়েছিল মেরিনাসকে ঠিক। কিন্তু এই রাস্তার অস্তিত্ব ছিল খ্রীষ্টাব্দ গণনার পূর্ব থেকে এবং সৈনিক ও ব্যবসায়ী, এই দুই সম্প্রদায়ের পথিকরা যে এই বাণিজ্যপথ ব্যবহার করতো তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এক গবেষক ঐতিহাসিকের এই উক্তিতে (৭)—We do not know exactly when the great trade routes (Silk route) between Persia, India, China were opened, but we can assume that in time of Alexander there were several towns where these routes intersected or divided.

এই সিল্ক রুট যেখান থেকে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তার দুপাশে যেসব সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল যাদের ধ্বংসস্তূপ আংশিক ভাবে খুঁড়ে ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে এডগার নোব্লক তার একটা তালিকাও দিয়েছেন (৮)—(১) গিয়াউর কালা (Giaur-Kala) প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র আমুদরিয়ার পূর্বে 'মার্ভ' নগরীর ধ্বংসাবশেষ, (২) খোয়ারিজম এলাকায়

(আধুনিককালের উজবেকিস্থানে আমুদরিয়ার নিম্নগতিতে) অবস্থিত কালালিগির্ (Kalaly-Gyr) এবং কিউজেলি-গির (Kiuzeli Gyr), (৩) প্রাচীন সমরখন্দ শহর, (৪) পূর্ব ফেরগাণার (উজবেক ও কিরগিজ রাষ্ট্র) সুরারস্ত নগরীর ধ্বংসচূর্ণ।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার যদি উপরোক্ত জনপদগুলোর সমৃদ্ধি দেখে থাকেন তাহলে অনুমান করা যায় দিগ্বিজয়ী সেই গ্রীকবীরের অভিযানের বহু পূর্বেই সিল্ক-রুটের আশপাশে দেশদেশান্তরের ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের ফলে এই জায়গাগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে উন্নত হয়ে উঠেছিল।

সিল্ক রুটের আদি ইতিহাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক। এই ব্যবসা-পথটির দক্ষিণমুখী শাখা (ভারতাভিমুখী) থেকে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতো তার বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে পেরিপ্লাসে।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই চীন থেকে রেশমের পণ্যসম্ভার আসতো ব্যাক্-ট্রিয়ায় বা বলাখে। বিদেশী সওদাগরেরা কাবুল উপত্যকা ও খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে এসে কিন্তু সিন্ধুনদীর জলপথ ব্যবহার করতো না। হিংস্র উপজাতি অধ্যুষিত ছিল এই নদীপথ। তাই তারা স্থলপথে চলে আসত ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রাচীন বন্দর বারিগাজায় (Barygaza)। এখান থেকে উত্তরে সিন্ধুর মোহানায় বারবারিকাম বন্দরে চলে যেত রেশমের পণ্যসম্ভার। এখানে পৌঁছে পশ্চিমী কারবারীরা চীনা-সিল্কের বদলে এমন একটি বিচিত্র পণ্য সংগ্রহ করতো যেটা ছিল (৯)—One of the most ancient and precious articles of commerce is a resin exuded from varions species... অর্থাৎ যেটি ছিল প্রাচীন দিনের পণ্যবস্তুর ভেতরে সবচেয়ে বেশী দামী, পশ্চিমের দেশ রোমে তার চাহিদা ছিল প্রচুর।

পেরিপ্লাস এই পণ্যদ্রব্যটির নাম বলেছে ফ্র্যানকিন্সেন্স (Frankincense) যার অর্থ হলো সুগন্ধী ধুনো। কোথায় কোন ধরণের গাছ-গাছড়ার আঠা থেকে তার জন্ম সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, ভারতেও উৎপন্ন হতো এই ধূপ। সংগ্রহ করা হতো থুরিফেরা (Thurifera) নামে এক ধরণের গাছের আঠা থেকে।

রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি বলেছেন (১০)—রোম সম্রাট বিলাসী নিরো তার পত্নী পপিয়ার কবরে এতো অপর্যাপ্ত পরিমাণে সুগন্ধী এই ধূপ জ্বালিয়ে ছিলেন যে বহুদিন ধরে তার মিষ্টি সৌরভে চারদিকের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে থেকে ছিল। রোমে এক পাউণ্ড বেস্ট কোয়ালিটি ধূনো ছয় দীনারে বিক্রি হতো। পাঁচ দীনার ছিল তার চেয়ে নিরেস জাতের এক পাউণ্ড ধূনোর দাম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের এক পাউণ্ডের মূল্য ছিল তিন দীনার।

সিল্ক রুট ধরে মধ্যএশিয়া থেকে যে-সব পণ্যসম্ভার সিন্ধুর মোহনায় আরব সমুদ্রের বারবারিকাম (Barbaricum) বন্দরে আসতো এবং সে সব জাহাজে চলে যেত রোমে তথা ইওরোপে। আর পশ্চিমী দুনিয়ার এবং ভারতের পণ্য আবার বারবারিকাম থেকে বারিগাজা হয়ে ব্যাক্ট্রিয়ার পথে সিল্করুট ধরে সিদিয়ায় (Scythia মধ্যএশিয়ার প্রাচীন রাজ্য কৃষ্ণসাগরে উত্তরে এবং উত্তরপূর্বে ও আরব সাগরের পূর্বতীর জুড়ে অবস্থিত ছিল। অধুনা এই অঞ্চলের কিছুটা ইওরোপে এবং কিছুটা মধ্যসোভিয়েত এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত) রপ্তানী হতো। Indo-Scythia Trade অর্থাৎ ভারত মধ্যএশিয়ার বাণিজ্যে বারবারিকামের খ্যাতি ছিল পেরিপ্লাসের যুগে। এই বন্দরের আমদানি-রপ্তানীর পণ্যের নামগুলির (১১) ভেতরে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে সিল্করুট ধরে সওদাগরেরা কি কি নিয়ে আসতো এবং ভারত থেকে কোন কোন পণ্যদ্রব্য মধ্যএশিয়ায় যেত। *

★ বারবারিকাম বন্দর

আমদানি	রপ্তানি
১। মিহি বস্ত্রসম্ভার পরিমাণে প্রচুর। কিছু পাঁচমিশালী)	১। গুগ্গুল (সুগন্ধী নির্যাসবিশেষ)
২। ছাপা লিনেন	২। গাঙ্গেয় জটামাংসী (ঐ)
৩। পোখরাজ	৩। কচ্ছপের খোল
৪। প্রবাল	৪। নীল রঙের পাথর
৫। কাঁচের বাসন	৫। নীল
৬। মদ্য (অল্পপরিমাণে)	৬। মসলিন
৭। ধূনো (আরব ও আফ্রিকার)	৭। ভারতীয় রেশম
৮। চীনা সিল্ক	৮। পশুচর্ম (তিব্বত ও তুর্কীস্থানের)

সিল্ক রুটের পণ্যসম্ভার আরও আছে। সুদীর্ঘ পথ। তার বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে সওদাগররা তাদের পণ্যের অদল বদল করতো। যেমন ইউরেশীয় স্তেপ অঞ্চল থেকে রুশ কারবারীরা তাসখন্দে নিয়ে আসতো পশম শনের দড়ি (Flax), মোম, মধু, চামড়া, বাদাম (Nutf), শিকারী পাখী (বাজপাখী জাতীয়), মশলামাখানো শুঁটকী মাছ, শীলের দাঁত, তলোয়ার, তীর, লোহার শিকল আর হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া। উত্তর ভারতের সওদাগরদের কাছে সেগুলি বিক্রি করে কিনতো মসলিন, নীল, রেশম, গান্ধের জটামাংসী ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য একটা প্রসঙ্গ বলতে হবে—তা নাহলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সিল্ক-রুটের বিচিত্র ইতিহাস।

গ্রীক সওদাগর ম্যায়িসের বৃত্তান্তে জানা যায়, দূর বন্ধুর এই পথের অভিযাত্রীদের কাছে, প্রাণের মায়ার চেয়েও বেশি ছিল তাদের মূল্যবান পণ্য —A man's life was nothing to them—তাই লুঠেরারা তাদের পণ্য ছিনিয়ে নিতে এলে তাদের খুন করতে এতটুকুও ইতস্তত করতো না। কি ভাবে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই অবজ্ঞাত পূর্বসূরী দূতরা তাদের বিপদসঙ্কুল অভিযানকে নিরাপদ করার প্রচেষ্টা করতো, ম্যায়িসের প্রত্যক্ষদর্শী নিম্নলিখিত বিবরণের তার আভাস মিলবে (১২)—

একটা ক্যারাভানে পঞ্চাশ কি একশো এবং এমন কি হাজারটি উট থাকতো। সওদাগররা ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে যাওয়াটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করতো। ধনী কারবারীরা আবার সঙ্গে তাদের নিজেদের নিযুক্ত তীরন্দাজের দল রাখতো। তাদের সহযাত্রী অপেক্ষাকৃত কম বিত্তবান সওদাগরেরা বিনা খরচে নিরাপত্তা পেয়ে যাচ্ছে বলে তারা চাঁদা করে সেই ধনী ব্যবসায়ীকে কিছু দিত। বর্বর উপজাতি (Barbarian কিংবা 'Nomads') দস্যুদের সব চেয়ে বেশী লোভ ছিল, রেশমের সুতোর পেটী, মূল্যবান পোখরাজ নীলা ইত্যাদি পাথরের প্যাকেট, ধুনো বা সুগন্ধী গান্ধের জটামাংসী এবং মশলার বস্তার ওপরে। সোনাদানা, হীরে, জহরতের প্যাকেট সওদাগরেরা তাদের কুর্তা কি জোব্বার ভেতরে রাখে। অবশ্য তারা বেশ ভালো করেই জানে, যদি ডাকাতের হাতে পড়ে এবং জখম হয় তাহলে সবই যাবে। কেননা, অসুস্থ কি ক্লান্ত ও অক্ষম উটকে যেমন সওদাগরেরা রাস্তায় ধারে

ফেলে রেখে চলে যায়, তেমনি তাকেও রেখে চলে যাবে। তার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না। ক্যারাভান কখনো তার জন্য অপেক্ষা করবে না—করতে পারে না। কয়েকদিন দেরী হওয়া মানেই ওদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়া। হয়তো তাদের যাওয়ার রাস্তায় কোনো গিরিপথ প্রচণ্ড তুষারপাতে বন্ধ হয়ে যাবে, কোনো নদী বন্যায় স্ফীত হয়ে উঠবে; ফুরিয়ে যাবে তাদের সঞ্চিত পানীয় জল—হয়তো তখন টানা ত্রিশ ঘন্টা সমানে হাঁটলেও নিকটবর্তী কোনো লোকালয়ে কুয়ো পাওয়া যাবে না। এই সব কারণেই পথের কোথাও দেরী করা ওরা কল্পনাও করতে পারে না—তাই ওরা চলে।

ঘন্টা বাজে—ডিং-ডং-ডিং-ডং—

মধ্যএশিয়া বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রেগরী ফ্রামকিন (Gregorie Frumkin) জানিয়েছেন (১৩)—মধ্যএশিয়ার যে ভূখণ্ডটুকু আমুদরিয়া এবং শিরদরিয়ার জলধারাবিধৌত এবং শাস্তরসাস্পদ এক একটা মরুদ্যান বা ওয়েসিসের স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় পুষ্ট এবং উর্বরা তার সমৃদ্ধির মূলেও এই ক্যারাভান রুট বা গ্রেট সিল্করোড়। এই পথের দুপাশে জনপদজীবন, শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে এক একটা পরিখাবেষ্টিত প্রাচীরঘেরা শহর বা ব্যবসাকেন্দ্র। আর প্রতীচ্যের সেই সুদূর রোম, গ্রীস এবং মিশরের সঙ্গে প্রাচ্যদেশের পারশ্য ও ভারতের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের সম্পর্কও স্থাপিত হয় এই দুরবিসর্পিল বাণিজ্যপথটির সূত্র ধরেই। তাই হয়তো ঐতিহাসিক এডগার নোব্লক (Edger Knoblock) বলেছেন, মধ্য-এশিয়ার এই অঞ্চলটি হলো 'Melting-pot of Nations and cultures' (১৪) অর্থাৎ বহুজাতি ও তার সংস্কৃতির চিহ্ন এই মৃত্তিকাতেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই গ্রেট সিল্ক রোড ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার স্রোত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতো। শক (Scythians), হুন, তুর্কী, মঙ্গোল এবং আরও অন্যান্য যাযাবর উপ-জাতিদের (Nomad tribes) পদধূলিরঞ্জিত সুপ্রাচীনকালের এই বাণিজ্যপথ —এসব কথা বলে নোব্লক স্পষ্টই বলেছেন···This area has been wedged throughout its history between three well.identified cultural entities—Persia. India and China (১৫), অর্থাৎ যত বিভিন্ন রকম জাতির মিলনস্থলই হোক না কেন, এই ভূখণ্ডের স্মরণাতীত কালের ইতিহাসে

দেখা যায়, এখানে পারসিক, ভারতীয় এবং চীনা সংস্কৃতির অস্তিত্ব খুব সুস্পষ্ট। মধ্যএশিয়ার উর্বরা এই অঞ্চলটি ভৌগোলিক দিক থেকে গ্রীস, পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীনের সাংস্কৃতিক ভাবধারার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত—Focal point of influence from Greece. Persia, India and China. (১৬)

পূর্বে আলোচিত উর্বর জনবহুল অঞ্চলে সমরখন্দের মাটিতে প্রাচীন দিনের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সিল্ক রোডের দুই পাশে এই সমৃদ্ধ জনপদের সঙ্গে ভারতের ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

সিল্ক রোডের যে অংশটুকু আমুদরিয়া শিরদরিয়ার জলবিধৌত উর্বরা মরুদ্যান অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে তার ভূপ্রকৃতিটাও জানা দরকার।

ভৌগোলিক দিক থেকে এই ভূখণ্ডটিকে সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (১৭)—(১) উত্তরে এবং শিরদরিয়ার দুই তীরে রুক্ষ, উষর স্তেপ অঞ্চল, শিরদরিয়ার ভাটিতে মরুপ্রায় (semi-desert) অনুর্বর ভূমি এবং আমুদরিয়ার বাঁদিকের পাড়ে কারাকুম মরুভূমি (কালো বালি) আর ডানদিকে কিজলকুম মরুভূমি (লাল বালি) (২) উপরোক্ত অনুর্বর মরু বিস্তারের মাঝে মাঝে শিরদরিয়ার জলধারা পুষ্ট ফেরগানা উপত্যকা এবং তার পূর্বে আমুদরিয়ার উপনদী জারফশানের জলবিধৌত জারফ্‌শান উপত্যকার উর্বরা মাটির বিস্তার। (৩) ফেরগানার পশ্চিমেই তিয়েনশান পর্বতমালা তার শাখাপ্রশাখা আলাই এবং ট্রান্স আলাই। (৪) দক্ষিণে উজান জারাফশানের তীরজুড়ে পামীর গিরিশ্রেণী এবং সমরখন্দ শহরের দক্ষিণ অংশ।

এখন এই সিল্ক রোডের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা কোথা দিয়ে চলে গিয়েছিল তার বিশদ বিবরণ (১৮) নীচে দেওয়া হলো—

তিয়েনশানের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালার উত্তরে ও দক্ষিণে আছে কতকগুলি গিরিপথ যাদের ভিতর দিয়ে পূর্বাঞ্চলের সওদাগরদের 'কাফিলা' (ক্যারাভান) পশ্চিমে যেতে পারে। এই গিরিপথগুলি হলো, (ক) উত্তরে ইলি নদীর উপত্যকায় দ্‌জুন গারিয়ান গেট (Dzun garian Gate), (খ) তিয়েনশান

এবং আলাইয়ের মাঝখানে ফেরগানা উপত্যকা, (গ) আলাই এবং ট্রান্স-আলাইয়ের মাঝখানে কারাতিগিন উপত্যকা। শেষোক্ত দুটো গিরিপথ ধরেই চীন থেকে রেশমের পণ্য সম্ভারবাহী কাফিলা আসতো মধ্য-এশিয়ার তাসখন্দে, আসতো সমরখন্দে। সেখান থেকে আবার চলে যেত সুদূর পশ্চিমে রোমের বাজারে। তাই নোরিক বলেছেন, These last two passes were most used which brought silk from China to Persia and to the Levantine markets. (১৯)

সমরখন্দ থেকে চীনে যাওয়ার পথে তিয়েনশানের পরেই সওদাগরদের মস্ত বড় প্রতিবন্ধক বিশাল গোবি মরুভূমি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, এই মরুর শুরুতে উত্তরে দক্ষিণে ছিল স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন দুটো মরুদ্যান। এখানেই ছিল পথশ্রান্ত দূর দেশের বণিকদের বিশ্রামাগার ক্যারাভানসরাই। ছিল পানীয় জলের অনেকগুলি কুয়ো। আবার সওদাগরদের কোনো কোনো দল এই সিল্ক রুটের দক্ষিণবাহী আর শাখাপথ ধরে শিরদরিয়ার উপত্যকা এবং জারকশানের সমভূমি হয়ে আমুদরিয়ার তীরে দুটো সমৃদ্ধ জনপদ মুরঘাব (Murghab) এবং টেদজেহন্দের (Tedzhend) ওপর দিয়ে চলে যেত খোরাসানে তথা ইরানে।

এই দুটো পথের যাত্রীদেরই কিন্তু আসতে হতো সমরখন্দে। কেননা মূল সিল্ক রুট জারফশানের উর্বরা অঞ্চলে, তাসখন্দের দক্ষিণ পশ্চিমে সমরখন্দের ভেতর দিয়ে প্রসারিত হয়েছিল পূর্বে চীনে আর পশ্চিমে রোমে। এই সমরখন্দ থেকেই প্রধান গ্রেট সিল্ক রুটের আর একটি শাখা বেরিয়ে চলে গিয়েছিল দক্ষিণে তুষারাবৃত পামীর আর হিন্দুকুশের গিরিপথের ভেতর দিয়ে কাবুলে এবং কাবুল থেকে সিন্ধু উপত্যকায়। ভারতগামী এই সিল্ক রোডেরই সমান্তরাল আর একটি শাখা কারাতিগিন উপত্যকা থেকে আমুদরিয়ার উজান হয়ে চলে গিয়েছিল বলাখে অর্থাৎ বহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়ায়, সেখান থেকে কাবুল, কাবুল থেকে আফগানিস্থানের উত্তরপশ্চিমের প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র হীরাটে। এই পথ ধরেই ভেনিসের দুঃসাহসী ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ) চীন থেকে এসেছিল ভারতে। কিন্তু যখন যাযাবর উপজাতিদের বর্বর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যেত এই বাণিজ্যপথ কিম্বা দারুণ গ্রীষ্মের দরুণ দীর্ঘস্থায়ী খরার সৃষ্টি করতো, পানীয় জলের কুয়োগুলোকে অকেজো করে

ফেলতো আর তার পায়ে পায়ে নেমে আসতো দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, তখন সওদাগররা বিপদসঙ্কুল এলাকা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মূল ক্যারাভান রুট ছেড়ে অন্য পথ ধরতো। সঙ্গে সঙ্গে ধনে জনে সমৃদ্ধ জমজমাট ব্যবসা-কেন্দ্র সেই ওয়াসিসগুলির ওপরে দুর্দিনের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো।

ভূমধ্যসাগরের তীরে সিলিসিয়া থেকে চীনের কানসু প্রদেশের লপ-নর (Lop-Nor) পর্যন্ত বিস্তৃত এগারো হাজার মাইল দীর্ঘ এই গ্রেট সিল্ক রুটের মাঝখানে যে তাসখন্দ এবং ম্যাসিডোনিয়ার রেশমকারবারীর ছেলে গ্রীক সওদাগর ম্যাস্বিস (যার মাধ্যমে গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি প্রথম জানতে পেরেছিলেন সিল্ক রুটের কথা) হয়তো পণ্যসম্ভার নিয়ে চীনে যাওয়ার পথে তাসখন্দের ক্যারাভান সরাইতে অন্যান্য দেশের অনেক বনিকের সঙ্গে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিল। তাসখন্দ থেকে চীন পর্যন্ত যাত্রার বিবরণ দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য—সিল্ক রুটের প্রখ্যাত গবেষক বুলনয়জের (Boulnois) এই মন্তব্য—Three Western Oases fell within the Sphere of influence of Indo-Scythian Kingdom of Kushans. (২০) বুলনয়জের এই উক্তির ভিতরে একটি সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সুপ্রাচীনকালের এই বাণিজ্য-পথ (পেরিপ্লাসের মতে ২৯ খ্রীষ্টঃ পূর্ব) সিল্ক রুটের দুঃসাহসী সেইসব অজ্ঞাত ভারতীয় সওদাগর অভিযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার স্রোতও প্রবাহিত হয়ে যেত। আর বুলনয়জ ছাড়াও রুশ নৃতত্ত্ববিদ্ জি, গ্রাম গ্রজ-হিমেলো (G. Grum Grzhimaylo) ও এম, গ্রাম গ্রজহিমেলা (M. Grum Grzhimaylo) থেকে শুরু করে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত সাম্প্রতিককালের আরও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে এবং আরও হবে, আধুনিককালের উজবেকিস্থানের টেরমেজে, পেন্দাজিছিকেন্টে, খোয়ারিজমে ভারতীয় সভ্যতার স্বাক্ষর ছাড়াও সিল্করুটের সন্নিহিত অন্যান্য জনপদের প্রাচীন ধ্বংশাবশেষেও রেণু রেণু ছড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির হাজারো নিদর্শন।

সিল্করুট : অভিযানের শেষ পর্যায়

তাসখন্দ। (২১)

যার আর এক নাম টাওয়ার অফ স্টোন (Tower of stone)। আরবিয় এবং পারশিক পুঁথিতে বলা হয়েছে 'তাসকেন্দ' (Tashkend), আর চীনের প্রাচীন ইতিহাস (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) বলে 'উ-নি' (Yu-ni) কিংবা কখনো উল্লেখ করা হয়েছে 'চো-চি' (Co-ci) অথবা 'চো-সি' (Co-Shi) বলে—চীনা ভাষায় যার অর্থ হলো পাথর। বিভিন্ন নামকরণের এই ইতিহাসটুকু সমর্থিতও হয়েছে সেন্ট পিটার্সবার্গ (রাশিয়ার প্রাচীন শহর) থেকে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত ঐতিহাসিক এ, ক্যাভানিস (A. Chavannes) রচিত এক গ্রন্থে (২২)। আবার কোনো ঐতিহাসিকের মতে তাসখন্দ অথবা টাসকেন্ট পুরোপুরি তুর্কী অর্থাৎ টার্কিস নাম। কেননা তুর্কী ভাষায় তাস বা টাস (Tash) শব্দের অর্থ হলো পাথর আর খন্দ অথবা কেন্ট (Kent) শব্দের মানে "গ্রাম"।

রুশ ঐতিহাসিক ই, পলিভ্যানভ (E. Polivanov) বলেন, তাসখন্দ শব্দটা আসলে হলো তাজ কেন্ট (Taz Kent) কেননা এটা তাজিকিস্থানের ভিতর অবস্থিত শহর।

তার নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের যত মতবিরোধই থাক না কেন, তাসখন্দ যে শিরদরিয়ার উপনদী চিরচিক (Chirchik) নদীর তীরে মরুস্থান অঞ্চলের স্নিগ্ধ উর্বরা মাটিতে অবস্থিত প্রাচীন শহর আর ভূমধ্যসাগর থেকে রেশমের দেশ চীনের লপ-নর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই গ্রেট সিল্ক রুটের ঠিক মাঝখানে এবং মধ্য এশিয়ার ও ইওরোপের দেশ-দেশান্তরের বণিকদের মিলনস্থল তথা ব্যবসাকেন্দ্র—এসব তথ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের কোনো দ্বিমত নেই।

এখন সিল্করুটের ইওরোপীয় অভিযাত্রী ম্যায়িস (Maes) সেই ম্যাসিডোনিয়ার রেশমের কারবারীর ছেলে যার মাধ্যমে গ্রীক ভৌগলিক মেরিনাস (Marinus) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রথম জানতে পেরেছিলেন এই বাণিজ্যপথের রোমাঞ্চকর অভিযানের ইতিবৃত্ত—এই ভয়াল ধূ ধূ বিস্তীর্ণ মরুবিস্তারে, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বতে অনিবার্য মৃত্যুর মতো এক একটা ভয়ঙ্কর

সংকীর্ণ অন্ধকার গিরিপথে, বন্ধুর সেই সিল্করুটের (তাসখন্দ থেকে তারিম নদীর উপত্যকা পেরিয়ে চীন) শেষাংশের আলোচনায় ফিরে না গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সিল্ক রোডের ইতিহাস।

এখানে বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে; ম্যাস্নিসের ক্যারাভান তাসখন্দের সরাইখানায় এসে উঠেছিল। আর এখান থেকে টাওয়ার অফ স্টোন অর্থাৎ পাথরের স্তম্ভ অথবা তাসখন্দ থেকে ইয়ারকন্দ নদীর মোহনায় তাস-কুরগানে এবং তারিমের অববাহিকায় যেতে লাগতো সাত মাস। তারিম থেকে লপ-নর মাত্র দশদিনের পথ—এসব তথ্য আগে বলা হয়েছে।

এখন তাসখন্দ থেকে চীন পর্যন্ত সিল্ক রুটের এই শেষাংশের বিবরণ ম্যাস্নিসের কাছে জেনে টলেমি যেমন লিখেছেন তেমনি বলা হলো। (২৩)

তাসখন্দে এসে তারা একটা ক্যারাভান সরাইতে আশ্রয় নিল। এখানে কিছুদিন জিরিয়ে নিতে হবে। শুধু ম্যাস্নিসের সহযাত্রী সওদাগরদের নয়, বিশ্রামের দরকার কাফিলার জানোয়ার—উট, ঘোড়া, খচ্চর আর গাধা ও খচ্চরগুলিরও। পাহাড়ী পথের নুড়িপাথরে ঠোকর খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে তাদের পায়ের ক্ষুরগুলি। চড়াই উৎরাই ভেঙে আর অনিয়মিত খাওয়া দাওয়ায় কমজোরী হয়ে গিয়েছে তারা।

তাসখন্দ থেকে ম্যাস্নিস রওনা হলো চীনে। শিরদরিয়ার উপত্যকায় তাসখন্দ থেকে তারিম নদীর অববাহিকায় লপ-নর (Lop-nor) পর্যন্ত পথ বেশি নয়। কিন্তু সময় লাগতো অনেক। সাত সাতটি মাস। কম সময় নয়। কারণ, পথটি ছিল খুবই দুর্গম। তাসখন্দ থেকে ফেরগানার সমভূমি পেরিয়ে গেলেই শুরু হয়ে গেল তিয়েনশানের রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়। খাড়া সেই পাহাড়ের কোথাও নেই একটু সবুজের চিহ্ন, নেই কোনো জনবসতি। চীনে যাওয়ার পথে বাধার প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে। দেখে মনে হয়, যাওয়াই বুঝি যাবে না পশ্চিম থেকে পূবে সেই স্বপ্নের দেশ, রেশমের দেশ চীনে। কিন্তু—

যাতায়াতের উপায় ছিল, একমাত্র ভরসা—তিয়েনশানের উত্তরে দক্ষিণে কতগুলি খুব সংকীর্ণ অন্ধকার গিরিপথ। উত্তরে ইলি নদীর পাশে দজুনগারিয়ানগেট (Dzungarian Gate), তিয়েনশান আর আলাই পর্বত শ্রেণীর

মাঝখানে ফেরগানা এবং আলাই ও ট্রান্সআলাইয়ের ভেতরে কারা-তিজিন। ম্যাগ্নিসের কাফিলা ফেরগানা গিরিপথ ধরেছিল। ভীষণ দুর্গম সেই পাহাড়ী পথ। কোথাও কোথাও আবার কাঠের সাঁকো। যার নিচে দিয়ে তীব্র-বেগে বয়ে চলেছে কোন নদীর হিমশীতল জলের ধারা। তার ওপর দিয়ে যেতে হলে নেমে উটের লাগাম ধরে একটা একটা করে তাদের পার করতে হয়। শুধু তাই নয়। উটের পিঠের মালের বোঝাইও কমিয়ে দিতে হয়। আর গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার পিঠের দুদিকে মালের বস্তা একেবারে নামিয়েই নিতে হয়। কে জানে, বহুকালের পুরানো নড়বড়ে পুল যদি জন্তু-গুলির আর মালের ভারে ভেঙে পড়ে। সওদাগররা তাই মালের বোঝা মাথায় নিয়ে খুব সাবধানে ধীর পায়ে একজন—একজন করে পার হয়ে যায়।

সব চেয়ে মুস্কিল হয়, জানোয়ারগুলি, বিশেষ করে তেজী ঘোড়াগুলি নিয়ে। সাঁকো পেরুনোর সময় নিচে যেই দেখতে পায় জল, অমনি ছুটে সেদিকে যেতে চায়। তখন সামলানো দায় হয়ে ওঠে। এইজন্যে সওদাগররা তিয়েনশানের বিপজ্জনক এই গিরিপথ পেরোতে ঘোড়ার চেয়ে গাধা কী খচ্চর বেশী পছন্দ করে। তারা ঘোড়াগুলির মত অত ছটফটে নয়, বেপরোয়া নয়। তাই বণিকরা তাসখন্দ থেকে ঘোড়াগুলি পাল্টে খচ্চর কী গাধা জোগাড় করতে খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অতএব এক এক একটা সাঁকো পেরোতে প্রচুর সময় লাগে। কখনও একটা বেলা কী পুরো একটা দিনই কাবার হয়ে যায়। আবার কোথাও রাস্তা এত সরু যার একদিকে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে কালো পাথরের পাহাড় আর একদিকে অন্ধকার গভীর খাদ। এই সব খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাঁকো পেরোনোর মতোই খুব সাবধানে যেতে হয়। তার ওপরে যদি ঝড় দুর্যোগ শুরু হয় তাহলে তো কথাই নেই। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস নাকে মুখে আছড়ে পড়ে। বণিকদের কানগুলি (যত পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা থাক না কেন) কট কট করে। হাত পায়ের ডগাগুলি সিটিয়ে আসে। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই সওদাগররা, বিশেষ করে চীনা বণিকরা, তিয়েনশানকে বলে রাক্ষুসে পাহাড়।

যেই তিয়েনশান শেষ হলো, অমনি শুরু হলো গোবি মরুভূমি। যতদূর চোখ যায় মরুপ্রান্তর জুড়ে উঁচুনিচু বালিয়াড়ী। আর শাঁ শাঁ বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সেইসব বালুস্তূপ, আবার কোথাও গড়ে উঠছে বিশাল বালুস্তম্ভ। আর দিগন্তের দিকে তাকালেই কী যেন চিক চিক করে। মনে হয়, কোনো নদী কী পুকুরের জল বুঝি রোদে ঝিকমিক করছে। অমনি এ পথে একেবারে আনকোরা নতুন যাত্রীরা হৈ হৈ করে সেদিকে ছুটে যেতে চায়। অভিজ্ঞ, বর্ষীয়ান সওদাগররা তাদের বাধা দেয়। বলে, যেও না। জল নয়—মরীচিকা।

দিন কাটে। মাস কাটে। যেমন অফুরান সেই মরুপথ তেমনি অফুরান তার বালুর সমুদ্র। যখন সওদাগররা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত এবং কেউ কেউ রীতিমত অসুস্থ তখন একদিন দূরে—বহুদূরে তাদের নজরে পড়ে দূরের আকাশের নিচে কুয়াশাচ্ছন্ন সবুজ বনরেখা। তারিম নদীর অববাহিকায় নিবিড় সবুজ অরণ্য বণিকদের উল্লাসে অস্থির করে তোলে। তার দুটো কারণ আছে।

মরুভূমির ধূসর, কখনও পাঁশুটে, কখনও হলদেটে মাটি মাটি রঙ দেখে দেখে তাদের চোখগুলি ক্ষয়ে যাওয়ার পর সবুজের স্নিগ্ধতা তাদের মুগ্ধ করে আর তারিম এসে পৌঁছান মানেই তো ল্যাণ্ড অফ সেরিস (Land of Seres) অর্থাৎ রেশমের দেশ চীনে পৌঁছে যাওয়া। এখান থেকে মাত্র দশ দিনের পথ লপ-নর। এই পথটিও খুব বিপজ্জনক ! উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী পথ। আর এ অঞ্চলের আবহাওয়া খুব খারাপ। থেকে থেকে হঠাৎ তুষারের ঝড় বইতে থাকে। চড়াই উৎরাইয়ের সেই আঁকাবাঁকা পথ বরফের বড় বড় চাঙড়ে আটকে যায়। আবার হয়তো দূরে কোথাও কোনো পাহাড়ের মাথায় ফুলে ওঠে কোনো নদী। তার উন্মত্ত বন্যার ঢেউ ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে নেমে এসে চোখের পলকে গোটা কাফিলাটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বহুকষ্টে সে পথ অতিক্রম করল ম্যাগ্নিস। আর তার চোখে পড়ল, ঠিক দশ দিন পরেই, দূরে-বহুদূরে ধূ ধূ বালুচরের পরেই তারিম নদীর নীলিম আভাস। তাদের নাকে এসে ধাক্কা দিল পথের দুপাশে সবুজ গাছ-গাছালিতে থোকা থোকা ফুটে থাকা জিগদা, (Jigda, ড্যাফোডিল এবং নার্সিসাস

জাতীয় এক ধরনের সুগন্ধী ফুল) ফুলের মিষ্টি গন্ধ। তারিম পেরিয়ে ম্যাগ্নিসের কাফিলা পৌঁছে গেল রেশমের দেশ চীনের ইয়ারকন্দের মরুদ্যানে লপ-নরে। শেষ হলো ম্যাগ্নিসের সিল্করুটে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ পরিক্রমা।

———

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি — পৃষ্ঠা

(১) Periplus of Erythraean Sea. — ২৬৮-৭০

(২) Geography of Ptolemy Claudius. Ptolemy Claudius. — ১৪ (ভূমিকা)

(৩) Ptolemy and Pliny's statement as quoted in 'Silk Road' by Boulnois — ৬২

(৪) Silk Road. Boulnois — ৬১-৬৭

(৫) Silk Route. Merlance, Germain— In Journal of the Royal Central Asian Society Vol 26 (1939) — ৬৮

(৬) Periplus of the Erytharean Sea — ২৭০

(৭) Ibid Ibid — ২১৪

(৮) Beyond the Oxus. Edgar Knobloch. — ৫২

(৯) Periplus of the Erythraean Sea — ১২০

(১০) Natural Geography. Pliny, as quoted in the Periplus ১২৪-২৬

(১১) Periplus of the Erythraean Sea. ২৮৬

(১২) Silk Road. Boulnoise. L. ৮৫

(১৩) Archaeology in U. S.S.R. (Soviet Central Asia) Uzbekistan—G. Frumkin. In C.A.R. Vol. 13 (1968) ২৯৯

(১৪)-(১৫) Beyond the Oxus. Edgar Knobloch. ৯

(১৬) Archaeology in Soviet Central Asia. G. Frumkin In C.A.R. (1965) ৩৪১

(১৭) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ৯

(১৮)-(১৯) Ibid Ibid ১৬

(২০) Silk Road. Boulnois. L. ৬৭

(২১) Encyclopedea of Islam—TASHKENT ৬৮৭

(২২) Documents of Sur-less Toukin Occidentaux. Chavannes ৪০

(২৩) Silk Road. Boulnois L, ৬১-৭৪, ৭৪-৮৪

সাত

ইবন খোরদাদবিহ

গাঙ্গেয় উপত্যকায় রুশী সাক্‌লাবাহ্‌

ইবন-খোরদাদবিহ (৮২০-৯১২ খ্রীঃ)

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আরবিয় এক পরিব্রাজকের 'সফর-নামা'য় পাওয়া যায় ভারত-রুশ মৈত্রীর সেই সুদূরকালের ইতিহাসের কিছু বিস্ময়কর ও বিচিত্র তথ্য!

মধ্যএশিয়ার পথে পথে বিভিন্ন জনপদে, পল্লীতে পরিভ্রমণ করেছিলেন পদব্রজে যে দুঃসাহসী নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী তাঁর পুরো নাম আবুল কাশেম ওবায়েদুল্ল্যা বিন আবদুল্লাহ ইবন খোরদাদবিহ্‌। তার ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্তের বেশির ভাগই বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গিয়েছে। তবুও যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তা এখানে বলা হলো।

জন্মেছিলেন সম্ভবত ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতামহ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। মুস্লিম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে কি ছিলেন জানা যায় না। খোরদাদ-বিহের পিতৃদেব ছিলেন তাবিরিস্থানের (Tabiristan) অর্থাৎ কাস্পিয়ানের পশ্চিমতীরবর্তী একদা সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আর তিনি নিজেও ছিলেন ডাক এবং গুপ্তচরবিভাগের অধিকর্তা, সাহেবআল বারিদ-ওয়াল-খাবার।

তবে শতাব্দীপূর্বের এই ঐতিহাসিক যে তাঁর জন্মসূত্রেই অভিজাত ঘরের সন্তান তার প্রমাণ—তাবিরিস্থানের খলিফা আল-মুতাবিদের সঙ্গে খোরদাদ বিহের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। মুতাবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় খোরদাদবিহ সঙ্গীত-

নৃত্য-বাদ্যযন্ত্রের ওপরে একখানা মনোজ্ঞ গ্রন্থও লিখেছিলেন।

ভল্গার ভাটির দিকের উপত্যকায় এবং কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একদা সমৃদ্ধিশালী এবং রুশী-ভারতীয়-গ্রীক-ইহুদী-তাতার বণিকদের পদশব্দে মুখরিত বন্দর নগরী বুলগার এবং খাজার থেকে শুরু করে পারস্যের খোরাসান, নিশাপুর (মহাকবি ওমরের জন্মস্থান), বুখার', সমরখন্দ হয়ে সুদূর বাগদাদ-বসোরা-দামাস্কাস পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তটিকে মধ্য এশিয়ার তদানীন্তনকালের অনেক অজ্ঞাত তথ্য পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় কালের করাল গ্রাসকে উপেক্ষা করে বেঁচে আছে এই গ্রন্থটি।

ইবন খোরদাদবিহ পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, রুশী বণিকরা সমগ্র মধ্যএশিয়ায় চীনে, বলাখে (প্রাচীনকালের ব্যাক্‌ট্রিয়া অর্থাৎ বহ্লীক) এমন কি সুদূর ভারতে পর্যন্ত তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে যেত। আরও জানিয়েছেন, খাজারের রুশী সওদাগররা স্তেপভূমির জলে বাতাসে পুষ্ট বলশালী অশ্ব এবং তাদের কাফিলায় মূল্যবান পণ্যসামগ্রী পশম, অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করে তলোয়ার, ইত্যাদি নিয়ে কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীর ধরে বাকু (আজার-বাইজান), তাব্রিজ (ইরান), হামাদান (ইরান) হয়ে চলে যেত সুদূর বাগদাদ অভিমুখে।

কাস্পিয়ান থেকে পূর্বে চীন সীমান্ত, আর উত্তরে ভল্গা থেকে দক্ষিণে সমরখন্দ সমগ্র মধ্য-এশিয়ার এই ভূভাগ জুড়ে এই দুটো প্রাচীন দেশের সওদাগরদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের বিপুল সমারোহের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে খোরদাদবিহের সেই গ্রন্থে (কিতাব আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক)—(KITAB AL-MASALIK WAL MAMALIK) * তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

বাগদাদ।

খোরদাদবিহ ইরাকের সুপ্রাচীনকালের ব্যবসাকেন্দ্র বাগদাদে এসে দেখলেন, শহরের একদিকে রুশী আর একদিকে ভারতীয় বণিকদের তাঁবু। ভারতীয়

* গ্রন্থটি আরবীয় ভাষায় লেখা। 'মাসালিক' অর্থাৎ রাস্তা আর 'মামালিকে'র অর্থ হলো সাম্রাজ্য। রাস্তার সাম্রাজ্য কথাটি ক্যাবিক। অর্থাৎ যে গ্রন্থে দেশদেশান্তরের অনেক পথের কথা আছে। চলতি কথায় 'সফরনামা'।

ব্যাপারীরা এক একজন রুশীদের কাছ থেকে কিনছে ঘোড়া। উত্তর ভারতবর্ষে রাজরাজড়াদের কাছে তখন ভল্গার পরপারবর্তী বিস্তীর্ণ স্তেপভূমির হৃষ্টপুষ্ট তেজীয়ান ঘোড়ার খুব চাহিদা। তাই যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী যতগুলো পারছে কিনছে। তারা যৌথভাবে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার ঘোড়া কিনে নিয়ে আবার সেই পাহাড়ী দুরদুর্গম পথের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হোর্মুজ প্রণালী হয়ে চলে যেত তাদের কাফিলা মুলতানে, যেত গুজরাটে, যেত লাহোরে।

শুধু ঘোড়া নয়। রুশী পণ্যের তালিকাও দিয়েছেন আরবিয় ঐতিহাসিক এবং পরিব্রাজক খোরদাদবিহ। শনের দড়ি (Flax), মোম, মধু, চামড়া, বাদাম, শিকারী পাখী, (বাজপাখী জাতীয়), শুটকী মাছের তরকারী (Fish glue), শীল মাছের দাঁত ইত্যাদি। কিন্তু রুশীয় বণিকদের আমদানী পণ্যের ভিতর সবচেয়ে মহার্ঘ হচ্ছে 'জিল্‌দ্‌' অর্থাৎ চামড়া।

এই পশুচর্ম এবং পশম, বাণিজ্যের এই দুটো সামগ্রী সংগ্রহের ইতিবৃত্তের ভিতরে আছে রুশীয় সওদাগরদের এক বিস্ময়কর দুঃসাহসিকতার বিবরণ।

ভল্গা নদীর ঢেউ পাড়ি দিয়ে উজানে সুদূর উত্তরে চলে যেত তারা। সেখানে বরফে আচ্ছন্ন নদীর দুই তীরে আছে বিস্তীর্ণ অরণ্য। সেই বনে তরুশ্রেণী এমন নিবিড় সমাচ্ছন্ন যে কোনো কাঠবিড়ালীকে মাটিতে পা দিতে হয় না। গাছের ডালে ডালে বহুদূর পথ অতিক্রম করতে পারে। এই বনের প্রান্তে তাঁবু ফেলতো তারা। সেই আরণ্যক অঞ্চলের অধিবাসী 'উগ্রীয়ান' বা 'উরা' প্রভৃতির সহায়তায় দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ লোমবিশিষ্ট বেজী, শিয়াল, কাঠবিড়ালী শিকারে মত্ত হয়ে উঠতো। নিহত পশুগুলোর ছাল ছাড়িয়ে চামড়া আর দীর্ঘ কয়েক মাসের নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পুরস্কার রাশি রাশি নরম আর কালো পশম (আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য অপরিসীম) নিয়ে আসতো বুলগারের বন্দরে। তাই খোরদাদবিহের সফরনামায় বারে বারেই পাওয়া যায় এই কথাটি—'জুলুদ অল থালির'—যার অর্থ হলো কালো শেয়ালের চামড়া। এখানে খোরদাদবিহ শেয়াল অর্থে হয়তো ভল্গার উত্তরাঞ্চলের অরণ্যচারী ঘনকৃষ্ণবর্ণ নকুল ও কাঠবিড়ালী ইত্যাদি দীর্ঘ লোমযুক্ত জন্তু জানোয়ারকে ইঙ্গিত করেছেন। আর পাওয়া যায় আর একটি আরবিয় শব্দ—সাকৃলাবহ্‌।

সাকৃলাবহ্‌ শব্দটির অর্থ হলো তলোয়ার। দীর্ঘ মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ পশমের

মতই মহার্ঘ ও খুব জনপ্রিয় আর একটি রুশী পণ্য। রুশীয় ইস্পাত নির্মিত এই তীক্ষ্ণধার তলোয়ার এবং লোহার শিকলের খ্যাতি নাকি মধ্যযুগ থেকে—Russian metal crafts beacome famous in middle ages. কিন্তু ইবন খোরদাদবিহের বিবরণ থেকে মনে হয়, নবম শতাব্দীরও বহু আগে থেকেই রুশীয় ইস্পাতে তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা ছিল পৃথিবীর বাজারে। খোরদাদবিহ দেখেছেন, সুদূর উত্তরাঞ্চলের রুশী ব্যাপারীরা কালো পশম আর তলোয়ার ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র বজরা বোঝাই করে ভল্গা পাড়ি দিয়ে নিয়ে আসছে বুলগারে।

বুলগার।

প্রাচীনতম বাণিজ্যপথ ভল্গা নদীর ভাটির পশ্চিমতীরে দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমি সংলগ্ন আজভ সাগরের উত্তরে অবস্থিত বুলগার (সম্ভবত আধুনিককালের ইওরোপীয় রাশিয়ার ইউক্রেন থেকে আস্ত্রাখানের মধ্যবর্তী কোনো জনপদ) ছিল তদানীন্তনকালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। বুলগার ছিল ইওরোপীয় এবং রুশী, পারসিক, তুর্কী, ভারতীয় সওদাগরদের মিলনকেন্দ্র। ভারতীয় সওদাগরদের কাছে থেকে রোম, গ্রীসের ব্যাপারীরা এবং রুশী বণিকরা যেসব পণ্য ক্রয় করত খোরদাদবিহ দিয়েছেন তার তালিকা—মসলিন, রেশমজাত বস্ত্রসম্ভার, মণিমুক্তা ও প্রবাল-হীরা, বিবিধ অলঙ্কার, তেজপাতা, গাঙ্গের জটামাংসী* (Gangetic spikenard), নানারকমের মূল্যবান রঙীন পাথর, বনৌষধি, আর নীল (রুশীরা যাকে বলতো—Kraska)।

যেমন রকমারী পণ্য তেমনি ভারতীয় বনিকদের ভেতরে নানাবিধ শ্রেণীর যে উল্লেখ করেছেন ইবন খোরদাদবিহ তাও কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতীয় সওদাগরদের ভিতর তিনি কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন শ্রেণীর লোক দেখেছেন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রত্যেকটি দলের ভিতরে থাকত দু-তিনটি 'আব্রক' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিত—(সম্ভবত দূরদেশে ব্যবসায়িক সাফল্য কামনায় পূজা অর্চনা করার জন্ত তাদের সঙ্গে নিত)। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা

* হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মে। ২৮ সের জটামাংসী পিষলে দেড় ছটাক সুগন্ধী তেল পাওয়া যায়। রাশিয়া, এবং পূর্ব-ইউরোপে জটামাংসীর খুব চাহিদা ছিল।

মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি ঝাড়ফুঁকে ছিল পারদর্শী। তারা নাকি মন্ত্র পড়ে মরুভূমির দেশে বৃষ্টি নামাতো পারতো আর—

আর শুধুই যে ব্যবসার লেনদেন, টাকাপয়সার চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে ধূসর নিরানন্দ জীবনযাপন করতো না ভারতীয় বণিকরা, তার প্রমাণ তাদের সঙ্গে থাকত 'সান্দালিয়া' অর্থাৎ নৃত্যগীত পটিয়সী সুন্দরী গণিকা, থাকত 'জাম্বিয়া' অর্থাৎ কিস্‌সাকার (কাহিনীকার বা গল্প-বলিয়ে)। তাই—

তাই অনায়াসেই বলা যায়, সন্ধ্যা-সমাগমে রুশী, ভারতীয়, আরবীয়, পারসিক, তাতার বনিকদের ভীড়ে ভরা বন্দরনগর বুলগারের ক্যারাভানসরাইয়ের সেই সুঠামতনু ও খরযৌবনা নর্তকীর নাচে, গানে, গল্পে মুখর এক একটি রাত্রির ভিতরেই মহাকাল নিঃশব্দে আজকের রুশ-ভারত মৈত্রীর ভূমিকা রচনা করেছিল।

———

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা

(১) Bharat-Russ. P. M. Kemp.

(২) Kitab—Al—Masalik Wal Mamalik.
ed. by M. G. Groeje.
Abdul Kasim Abaidulla Ibn Abdallah
Ibn Khordadbiha. ৭১

[এই গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য জাতীয় গ্রন্থাগারের আরবিয় ও পারসিক বিভাগের সহ গ্রন্থাগারিক মজহরুল ইসলামের সহায়তায় গৃহীত]

আট

ইবন ফাদলাহন

দশম শতাব্দী : আমুদরিয়ার দেশে ভারতীয় তান্ত্রিক

২১ জুন, ৯২১

হাজার বছরেরও আগে এই দিনটিতে একটি সুসজ্জিত দীর্ঘ কাফিলা, বাগদাদ থেকে রওনা হয়ে জাগ্রোস পর্বতের সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে মন্থর গতিতে চলছিল। প্রতিটি স্টুরের (উট) পিঠে রৌপ্যখচিত পশমের গালিচা বিছানো হাওদা। সারবানদের (চালক) সাজের বাহারও খুব কম নয়। তাদের প্রত্যেকের পরনে জরিদার কুর্তা, মাথায় রঙিন পাগড়ী। রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত আরোহীদের গম্ভীর, কঠিন ও চিন্তাচ্ছন্ন মুখাবয়ব দেখে মনে হয়,—বুঝি কোনো খলিফা কী বাদশাহের প্রেরিত প্রতিনিধিদের দল কোনো গুরুদায়িত্ব নিয়ে বহু বহুদূর দেশে চলেছে।

দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত আর দিগন্তবিসারী মরুভূমিতে কণ্টকাকীর্ণ সেই দুরদুর্গম পথে এই দুঃসাহসী অভিযানটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাগদাদের খলিফা আল-মুক্তাদির তার একদল দূতকে পাঠিয়েছিল ভল্গার পশ্চিমে সেই আন্তর্জাতিক বন্দর, মধ্য এশিয়ার ব্যবসাকেন্দ্রগুলির ভূষণস্বরূপ সেই বুলগারে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় করাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রতিনিধিদের এই দলের ভেতরে ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ জ্যোতির্বিদ এবং ঈশ্বরবাদী ও ধর্মপরায়ণ ঐতিহাসিক, তাঁর নাম—ইবন ফাদলাহন।*

---

* এই অধ্যায়ের যাবতীয় তথ্য গৃহীত হয়েছে Safarnama by Ibn Fadalhan tr by. Abul Fadltaba-Tabayee, Tehran Govt. publication.

তাঁর পুরো নাম আহম্মদ বিন ফাদলাহন। তাঁর লিখিত রেঁহলা (Accounts of travels) থেকে জানা যায়, সুদূর দশম শতাব্দীতেও বাণিজ্যের সূত্র ধরেই ভল্গা কাস্পিয়ানের উপত্যকায় বুলগারে, ইটিলে (বুলগারের সন্নিকটে, ভল্গার পশ্চিমে সমৃদ্ধ প্রাচীন রাষ্ট্র খাজারের রাজধানী) ভারতীয় এবং রুশীয় বণিকদের সখ্যতাবন্ধন গড়ে উঠেছিল।

দশম শতাব্দীর বিশের দশকের প্রত্যক্ষদর্শী আরবীয় পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক ইবন ফাদলাহনের জবানীতেই বলা হলো, ভল্গা উপত্যকার বিভিন্ন নগর ও বন্দর বুলগার এবং ইটিলে ভারত মৈত্রীর বিচিত্র ইতিবৃত্ত—

বাগদাদ থেকে রওনা হয়ে আমরা মার্ভে, বুখারা হয়ে বুলগার বন্দরে এসে পৌঁচেছিলাম পুরোপুরি এক বছর পরে (৯২২ খ্রীষ্টাব্দে)···

বুলগার।

বিরাট ব্যবসাকেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বাজার। পশ্চিম থেকে এসেছে রোমান, এসেছে গ্রীক, এসেছে ইহুদীরা। উত্তর থেকে এসেছে রুশী বেনিয়ারা আর দক্ষিণে মধ্য এশিয়ার বাগদাদ, বোখারা, খোয়ারিজম (আধুনিককালের উজবেকিস্থান) এবং ভারত থেকে আরবীয়-পারসিক-তুর্কী-তাতার কিরগিজিয়া এবং ভারতীয় সওদাগরদের দল তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে জড়ো হয়েছে বুলগারের বাজারে। প্রতিটি দেশের বেনিয়াদের এক লক্ষ্য—

নিজেদের পণ্যসামগ্রী চড়া দামে বিক্রি করে কিনতে হবে রুশী চামড়া আর সেই ঘন কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ ও দীর্ঘ পশম! যে যতটা বেশী কিনতে পারবে তার তত বেশি লাভ। কেননা রুশী চামড়া আর পশমের দারুণ চাহিদা তাদের দেশে। এই দুটো মহার্ঘ পণ্যকে বিদেশী (পশ্চিমী) বেনিয়ারা বলে, বুলগার হাইড! আর বুলগার ফার।

বুলগার ফার।

বুলগার হাইড।

বুলগার সু।

দেশ-দেশান্তরের এই তিনটি পণ্য থেকে বেনিয়ারা মোটা লাভের অঙ্ক পকেটে পুরছে দেখে বুলগারের খলিফা মালিক অলসাকিল বা ব্যবসায়ীদের

ওপর কর বসিয়েছে। কৃষ্ণসাগর, ভল্গা বা কাস্পিয়ানের জলপথে আমদানি পণ্যদ্রব্যের শতকরা ১০ ভাগ। আর স্থলপথের পণ্যসম্ভারের ওপরে শুল্ক নির্ধারণও খুব বিচিত্র। ক্রীতদাসদাসীর বেনিয়াদের প্রতি দশটি শ্লেভপিছু একটা শ্লেভ দিতে হবে কর হিসেবে। প্রতি একশোটি ঘোড়ায় পাঁচটি ঘোড়া আর প্রতিটি স্থায়ী বসবাসকারী বেনিয়াদের ট্যাক্স দিতে হবে 'ফার' অর্থাৎ পশম দিয়ে।

আমি যখন বুলগারে গিয়েছিলাম তখন অধিবাসীদের আচার আচরণে যাযাবর জীবনের অনেক অভ্যাসই দেখেছিলাম। যেমন দেশের সর্বময় কর্তা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক তারই কোনো প্রাসাদ নেই। আজ এখানে কাল সেখানে ডুরসানা-মঞ্জেল (দোতলা তাঁবু) খাটিয়ে বাস করে।

যাযাবরদের উদ্দাম, অবারিত সেই জীবনধারা থেকে বুলগারের অধিবাসীরা গৃহী জীবনের ভেতর অনুপ্রবেশ করেছিল। তাই মুদ্রারই কোনো প্রচলন ছিল না। পশমই মুদ্রার কাজ করতো। ফারের বিনিময়ে নিত্য-প্রয়োজনীয় যে কোনো পণ্য কিনতে পাওয়া যেত। আরও আগে নাকি এই পশমের বদলে ঘোড়াই ছিল ভল্গার পশ্চিম তীরের এই অঞ্চলের তোমায়ুন (পারসিক মুদ্রা)। আমার পূর্ববর্তী পরিব্রাজক ইবন রুস্তার সফরনামায় পাওয়া যায় এই তথ্য।

বুলগারের পরে দশম শতাব্দীর আরবীয় ঐতিহাসিক ইবন ফাদলাহন ভল্গার পশ্চিম তীরের আর একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন তার ভেতরেও আছে ভারত রুশ মৈত্রীর সুদূর কালের ইতিহাসের জটিল, বিচিত্র উপাদান।

ভল্গা নদীর পশ্চিম তীর ধরে পনের দিনের হাঁটা পথে যে শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রটি পাওয়া যায় সেই খাজারের (Khazar কিংবা Khajar) রাজধানী ইটিল।

ইটিল।

বুলগারের চেয়েও অনেক-অনেক বড় ব্যবসাকেন্দ্র। কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে রোম বা গ্রীসের বেনিয়ারা; এসেছে আর্মেনিয় ইহুদী সওদাগররা, দেশদেশান্তরের বণিকদের আনাগোনায় ইটিলের ব্যবসাবাণিজ্য খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেই সময়। মধ্যএশিয়ার দক্ষিণে খোয়ারিজম এবং ভারতের

যেমন তেমনি রোমের ও ইওরোপের নানাদেশের বণিকদের আকর্ষণ ছিল ইটিলের দিকে দুটো কারণে—প্রথমত রুশীয় পণ্য (পশম, চামড়া) পূর্বাঞ্চলে রপ্তানির প্রধান বন্দর হলো ইটিল। এখান থেকেই এই মহার্ঘ পণ্যসম্ভার ভল্গা কাস্পিয়ানের পথে চলে যেত পৃথিবীর নানাদেশে। আর দ্বিতীয়ত এই বন্দরনগর ইটিলে নভোগোরোদ (আধুনিককালের উত্তর পশ্চিম সোভিয়েতের একটি শহর), স্মলেনস্ক এবং কিয়েভ থেকে রস্টোভ * রিয়াজান্ * সুজাদলস্ক্ * ভ্লাডিমির * হয়ে অনেকগুলি বাণিজ্যপথ এসে মিলিত হয়েছিল। রুশী বেনিয়াদের স্থায়ী উপনিবেশ ছিল এখানে। তারা খোয়ারিজম এবং ভারত থেকে আগত বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতো। ইবন ফাদলাহনের পূর্ববর্তী পরিব্রাজক ইবন হাউকুল, আলমাসুদি আল ইস্তাখ্রি, আল মুক্তাদ্দেশীর ভ্রমণবৃত্তান্তেও জানা যায় সুদূর সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভল্গা উপত্যকার বাণিজ্যের প্রধান পণ্যসম্ভার ছিল—ঘনকৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পশম। এই পণ্যসামগ্রীটির জন্যই মধ্যএশিয়ার দক্ষিণে খোয়ারিজম থেকে, ভারত থেকে বণিকরা দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ আর বা ম-ই দুনিয়া (পৃথিবীর ছাদ অর্থাৎ পামীর) অতিক্রম করে, কালো বালির সেই দিগন্তবিসারী ভয়াল মরুভূমি কারাকুম পেরিয়ে সুদূর উত্তরে ভল্গার উপত্যকায় দুঃসাহসী অভিযান করতো। তেমনি রুশী বেনিয়ারা বুলগার থেকে চলে যেত বাগদাদ, বসোরা হয়ে ভারতের সিন্দুপ্রদেশে আবার পূর্ববাহী পথে তাকলামাকান মরুভূমি আর তিয়েনশান পাহাড় পেরিয়ে যেত চীনে।

ইটিলের বাজারে এক ভারতীয় ওঝার চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছেন ফাদলাহন। একদিন তাঁর নজরে পড়ল, তুর্কী-তাতার-কিরগিজিয়া-রুশী-ভারতীয় বণিকদের দল তাদের দোকানপাট, কেনাবেচা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে উদগ্রীব হয়ে। ভিড়ের ভেতরে উঁকি দিয়ে ফাদলাহন দেখলেন, জটাজুটধারী এক ভারতীয় গুণীন, এক ঘটি জলের ভেতরে হাত ডুবিয়ে মন্ত্র পড়তেই জলটা মিষ্টি শরবতে পরিণত হলো। আবার এক

* রস্টোভ—দক্ষিণপূর্ব ইওরোপীয় রাশিয়ার ডন নদীর তীরস্থ বন্দর।
* রিয়াজান—মধ্য-সোভিয়েত রাশিয়ার একটি শহর।
* সুজাদলস্ক—মস্কোর দক্ষিণপূর্বে একটি প্রাচীন শহর।
* ভ্লাডিমির—মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার মস্কোর পূর্বে একটি শহর।

পারসিক সওদাগরের ডানপায়ের বাতের ব্যথার ওপরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলতে লাগল! কিছুক্ষণ' পরেই সেই পারসিক বেনিয়া বলল ব্যথা ভালো হয়ে গিয়েছে। এই সূত্রে ফাদলাহন লিখেছেন—Indians have a proficiency in occult science.

আরো একবার। খোরাসান (পারশ্য) থেকে তাদের দলটা চলেছে বুলগায়ের দিকে। পথে পড়ল কিজলকুমের দিগন্তবিসারী মরুভূমি। বণিকদের সেই কাফিলায় এবং খোরাশানের ক্যারাভানসরাই থেকে তাদের সহযাত্রীদের ভেতরে ছিল এক ভারতীয় ওঝা। মরুভূমিতে নামতে না নামতেই ঝড় উঠলো। বালুর ঝড়। দূরদিগন্তে বাতাস যেন ডাইনীর মতো আর্তনাদ করতে লাগল। উত্তপ্ত বালুর কণা এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো নাকে মুখে এসে পড়তে লাগল। তাদের দলের মোট বাইশ জনের ভেতরে আটজন মারা পড়ল! ভয় এসে বাসা বাঁধল বণিকদের মনে। তারা গিয়ে সেই ভারতীয় গুণীনকে ধরল, —আপনি ঝড় থামিয়ে দিতে পারেন না মন্ত্র পড়ে?

কিন্তু ওঝা মন্ত্র পড়েছিল কি না; ঝড় থেমেছিল কিনা—সেসব কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে নেই। কিন্তু ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুকের (oceult science) সেই অলৌকিক রহস্যময় শাস্ত্রের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে হাজার বছর আগের এক আরবিয় ঐতিহাসিকের লেখায়।

এই অধ্যায়ের যাবতীয় তথ্য গৃহীত হয়েছে Safarnama, by Ibn Fadalahan, tr. by Abul Fadltaba—Tabayee. Tehran Govt. Publication.

নয়

মার্কোপোলো :—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রুশ-ভারত মৈত্রী

মার্কোপোলো (১২৫৪-১৩২৪

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভূমিকায় ফরম্যান বলেছেন (১)—ভেনিসের এই ব্যবসায়ী এবং ওয়াইজ অ্যাণ্ড লার্নেড সিটিজেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও বিদ্বান নাগরিক আর্মেনিয়া, পারশ্য এবং তাতার অধ্যুষিত মধ্যএশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের এমন রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন যা আপনাদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করবে। মার্কো যা দেখেছেন, যা শুনেছেন তাই লিখেছেন। আমার মনে হয়, সৃষ্টির সেই প্রাগুষায় আদমের কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন ইউরোপীয় মুসলমান, কোন খ্রীষ্টান এবং পৃথিবীর আর কোন জাতির লেখক একসঙ্গে এত দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনধারার চিত্রসম্ভার বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারেন নি, যেমন দিয়েছেন মার্কো তাঁর ভ্রমণবিবরণীতে।

ভেনিসের এক বর্ধিষ্ণু পাথর ব্যবসায়ীর ছেলে—এই দুঃসাহসী ভ্রমণকারী মার্কোর ভ্রমণবৃত্তান্তের ভেতরেও রুশ-ভারত মৈত্রীর কিছু বিচিত্র তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে।

মার্কোর এই ভ্রমণ বিবরণী বহুল প্রচারিত। কিন্তু জানা যায় না, নিকালো পোলো, ম্যাফিওপোলো—মার্কোর বাপ-কাকা, ভেনিসের এই দুই ব্যবসায়ী জলপথে মঙ্গোল নৃপতি কুবলাই খান শাসিত সেই রেশমের দেশ চীনে না গিয়ে হঠাৎ মধ্যএশিয়ার পথে অভিযান করেছিল কেন? সেই নেপথ্য ইতিহাসের

ভেতরেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার উপত্যকার মাটিতে, খোয়ারিজমের বুখারায়, বলাখে, বাদখশানে, মধ্যএশিয়ার আরও বিভিন্ন নগরে জনপদের মাটিতে এই দুটো মহান দেশের ইতিবৃত্ত।

একাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকে একটা (১০৯৫) আর ঠিক একান্ন বছর পরে (১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) আর একটা 'ক্রুসেডে' (২)—পর পর এই দুটো ধর্মযুদ্ধে যেমন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, হয়েছিল অগণিত প্রাণনাশ, তেমনি সুদূরপ্রসারী কতকগুলো প্রত্যক্ষ সুফলও দেখা গিয়েছিল। ইউরোপ ও এশিয়া—এই দুটো মহাদেশ জুড়ে দীর্ঘমেয়াদী এই যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভেতরে সংযোগ ঘটেছিল। পশ্চিমের দেশগুলো জানতে পেরেছিল, পূর্বাঞ্চলের দেশের অপরূপ সেই পণ্যসম্ভার—রেশম, মসলিন আর সুগন্ধী মশলার অস্তিত্ব। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর ভেতর দিয়ে রেশমের দেশ চীন এবং মসলিনের দেশ ভারতে যেতে পারতো না খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় বণিকরা। প্রায় দুই শত বছর ধরে বাণিজ্যের প্রয়োজনেই মধ্যএশিয়ার ভেতর দিয়ে রেশম-মসলিনের সেই সোনার দেশ পূর্বাঞ্চলে যাওয়ার নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে (১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে) পোলো ভ্রাতৃদ্বয়—নিকলো আর ম্যাফিওই প্রথম ইউরোপীয় বেনিয়া যারা আর্মেনিয়া, ক্রিমিয়া হয়ে ককেশাস ডিঙিয়ে ভল্গার তীরে তদানীন্তন-কালের বিখ্যাত বন্দর সরাই বাটুতে (Sarai Batu) পৌঁছেছিল।

সরাই বাটু (৩)

পোলোরা যে দেশকে বলেছে 'ল্যাণ্ড অফ তাতারি' (Land of Tatari) এবং 'ল্যাণ্ড অফ ফারস' (Land of Furs)—অর্থাৎ তাতারদের দেশ, পশমের দেশ। সেই বন্দর-নগরীর অস্তিত্ব ছিল ভল্গা-কাস্পিয়ানের মোহানায়—আধুনিক-কালের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র আস্ত্রাখানের উত্তর-পশ্চিমে। আরও বলা যায় বর্তমানের সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম নগরী স্তালিনগ্রাদের পঁয়তাল্লিশ মাইল পূর্বে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে মিশে রয়েছে তাতার নৃপতি বড়কা খানের (Barka Khan) রাজধানী, একদা বিদ্যায় ও সাংস্কৃতিতে এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যে উন্নত সেই জনপদ সরাই বাটুর ধ্বংসাবশেষ।

সুদূর পশ্চিমের দেশের শ্বেতকায় দুই বণিককে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিল

বড়কা খান। তারা বছরখানেক সেখানে বাসও করেছিল। এমন সময় অশান্তির আগুন জ্বললো। বাধলো যুদ্ধ। সংঘর্ষ সুরু হলো বড়কা আর পারশ্য অঞ্চলের এক মঙ্গোল অধিপতি হুলাগুর মধ্যে। ক্রিমিয়া-আর্মেনিয়ার যে পথে তারা এসেছিল সেই পথে ভেনিসে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো। পোলোরা এইবার মধ্য-এশিয়ার কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীর ধরে বুখারা হয়ে সুদীর্ঘ কিন্তু নিরাপদ পথে স্বদেশের দিকে অভিযান করেছিল। কিন্তু ভেনিসে যাওয়া হলো না। শুধু পাথর নিয়ে যারা বিকিকিনি করতো তারা ইতিমধ্যে মধ্যএশিয়ার সেই মহার্ঘ আর মনোহর পণ্যসম্ভার—দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ পশম, ভুস্বার মসৃণ চর্ম নিয়ে ব্যবসা ক'রে লাভের অঙ্ক স্ফীত ক'রে তুলেছিল। বেনিয়ার রক্তে জেগেছিল লোভের নেশা। সম্ভবত এই কারণেই পোলো ভাইরা বুখারায় রয়ে গিয়েছিল তিন-তিনটি বছর। সৌভাগ্যের বিষয় নিকলো আর ম্যাফিওপোলো তাদের সেই 'তাতারদের দেশ'—পশমের দেশে'-র রোমাঞ্চকর আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গিয়েছেন—

তাতারের দেশ—পশমের দেশ।

ভল্গার সুদূর উত্তরে সেই দেশকে বলা যায় 'অন্ধকারের দেশ'—ল্যাণ্ড অফ ডার্কনেস। সেখানে অবিরাম বয়ে চলেছে হিমেল হাওয়া। চারিদিকে আদিঅন্তহীন দুর্ভেদ্য কুয়াশা। সেই কুয়াশার পুরু আস্তরণ ভেদ করে সূর্য কখনোই দিগন্তের উপরে উঠে আসতে পারে না। দিনের বেলাতেও ছায়া ছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে জঙ্গলাকীর্ণ সেই অঞ্চল।

সেখানকার মানুষগুলো বেশ লম্বা। মজবুত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে। তাদের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবানিশি শুধু আকুল হয়ে খোঁজে—কোথায় কোন গাছের ডালের আড়ালে, কোন ঝোপের ভেতরে ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেজী, কোথায় ধূসর রঙের শিয়াল। তাদের হাতে থাকে তীক্ষ্ণধার বল্লম, থাকে আরও নানাবিধ অস্ত্র। যেই জঙ্গলের ভেতর সর্-সর্ শব্দ ওঠে অমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে আসে তাদের বিষাক্ত তীর! আহত নকুল কি শৃগালের মর্মান্তিক সেই কাতর আর্তনাদে কেঁপে ওঠে সেই নিস্তব্ধ বনভূমি। সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ অনুসরণ করে তারা ছুটে এসে জানোয়ারটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

তারপরেই তারা মহা উল্লাসে তার ছাল ছড়াতে বসে যায়। ,এই জন্তুর গায়ের লোম থেকেই পাওয়া যায় দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ সেই ভুবনবিখ্যাত 'ফার' বা পশম।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বিবরণীর মার্সডেন সম্পাদিত সংস্করণে আছে (৪)—তাতারঅধ্যুষিত মধ্যএশিয়ার উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে এরমাইনস (Ermines), মার্টেন (Marten) এবং অ্যাকোলিনি (Acolini) বা হারকিউলিনি (Herculini) পাওয়া যায়। অভিধানে বলছে মার্টেন, এরমাইনস প্রভৃতি সবই ঘন লোমযুক্ত নকুলগোত্রীয় জন্তু। আবার কিছু পরিমাণে পশম সাদাটে ধুসর রঙের খেঁকশিয়াল বা শেয়াল জাতীয় জানোয়ারের গায়ের লোম থেকেও পাওয়া যায়।

তাতাররা এই পশম নিয়ে আসে বুলগারে, মার্ভে। সেই সব ব্যবসাকেন্দ্র নানা হাত বদল হয়ে চলে আসে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে তাসখন্দে, সমরখন্দে, আসে ব্যাক্ট্রিয়ায় বা বলাখে। এই ব্যাক্ট্রিয়া থেকে উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীরা কিনতো সেই বিশ্ববিশ্রুত 'রুশী ফার'।

আবার ভারতের প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র গুজরাট অঞ্চল সম্বন্ধে পোলো জানিয়েছেন (৫)—শুধু আদা, গোলমরিচ, নীল আর তুলো নয়, প্রচুর পরিমাণে ছাগল, মহিষ, বুনো ষাঁড় এবং গণ্ডারের চামড়া এখানে 'ড্রেসিং' অর্থাৎ বাজারে বিক্রির উপযোগী করা হয়। তারপর জাহাজে বোঝাই হয়ে চলে যায় আরব, পারশ্য হয়ে মধ্যএশিয়ার অর্থাৎ আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে।

পশ্চিম ভারতের আরও একটি বিচিত্র ও মহার্ঘ পণ্যও যে মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডে রপ্তানী হতো—সে বৃত্তান্ত আছে পোলার বিবরণীতে। ঘন নীল কিম্বা টুকটুকে লাল নরম তুলতুলে চামড়ার ওপরে সোনার বা রূপোর জরি দিয়ে ফুল লতাপাতা বা পাখির নক্সাখচিত শয্যাভরণ বা বেডকভার তৈরী হতো গুজরাট অঞ্চলে। আর এই 'একস্ট্রা-অর্ডিনারী' অর্থাৎ অসাধারণ পণ্যটির চাহিদা ছিল মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র বুখারায়, সমরখন্দে, বাদাখশানে।

আধুনিককালে বাদাখশান তাজিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আফগানিস্থানের

ভেতরে বিভক্ত। হিরাট থেকে কাশগড় (চীনের পশ্চিম সীমান্তে) যাওয়ার সময় মার্কো বাদাখশান হয়ে গিয়েছিলেন।

চারিদিকে রুক্ষ, ন্যাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা বাদাখশানের বিবরণের ভেতরে সেই সাতশো বছর আগের রুশ-ভারত সখ্যতাবন্ধনের কিছু আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মার্কোর নজরে পড়েছিল, বাদাখশানের সীমান্তে একটি খাড়া পাহাড়ের চারিদিকে সুলতানের সশস্ত্র প্রহরীরা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। তাঁর মনে হয়েছিল, এখানকার কোন গিরিগুহার অন্ধকার কোটরে বুঝি সোনা কি রূপোর বিপুল সঞ্চয় আছে।

খোঁজখবর নিয়ে মার্কো জানলেন (৬)—এই পাহাড়েই পাওয়া যায় জগদ্বিখ্যাত সেই নীলকান্ত মণি (উজ্জ্বল নীলবর্ণ পাথর) বা 'ল্যাপিস লাজুলি।' আর এই মহার্ঘ নীলবর্ণ প্রস্তরের খুব চাহিদা ছিল ভারতে—এই তথ্যটিও আছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে। প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিত ল্যাসেনও জানিয়েছেন (৭)—স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা খাঁটী নীলকান্ত মণি কিনেছে বাদাখশান থেকে। আর ভারত থেকে এই মূল্যবান প্রস্তর চলে যেত ইউরোপে।

আবার গাঙ্গেয় উপত্যকার লৌহ-ইস্পাতের খুব কদর দেখেছেন (৮) মার্কো 'কারম্যানে' অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণের এলাকায় প্রাচীন পার্থিয়া রাজ্যে। কারম্যানের বাজারে বিক্রী হচ্ছে খুব মসৃণ ও মজবুত ইস্পাতের চাদর। এই ইস্পাতের তলোয়ার ব্যবহার করে পার্থিয়ার যোদ্ধারা। পারসিক বেনিয়ারা এই ইস্পাতকে বলে 'অ্যানড্যানিক' বা হুণ্ডাওয়ানি (Hundwany) অর্থাৎ ভারতীয় ইস্পাত।

এই প্রসঙ্গে-ই উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যালমাসিয়াস (Salmasius) জানিয়েছেন, একটি সুপ্রাচীনকালের গ্রীক রসায়ন গ্রন্থে আছে—ভারতীয় ইস্পাতের ঋজুতা অসাধারণ!

শত শত শতাব্দী পূর্বে সুদূর মধ্যএশিয়ায় গাঙ্গেয় উপত্যকার লৌহ-ইস্পাতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার বৃত্তান্তটির ইঙ্গিত আছে প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এড্রিসির (Edrisi) এই উক্তিতে (১০)—লৌহ-ইস্পাত শিল্পে হিন্দুদের

নৈপুণ্য স্মরণাতীতকালের। তারা মসৃণ এবং দৃঢ় ইস্পাতের চাদর দিয়ে এমন এক রকমের তলোয়ার তৈরি করে যার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন দেশের তলোয়ারের তুলনা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মার্কোপোলো সুবিখ্যাত বাণিজ্যপথ সিল্করুটের সমান্তরালে দক্ষিণবাহী পথ অর্থাৎ সমরখন্দ থেকে দক্ষিণে ব্যাক্ট্রিয়া বা বলাখ হয়ে হিন্দুকুশের বামিয়েন গিরিপথ পেরিয়ে হিরাটের (কাবুল) ওপর দিয়ে কাশগড় বা খোটানে গিয়েছিলেন। (১১) আর বলাবাহুল্য এই পথের অনেক জনপদ-ই বর্ত্তমানে সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর ভ্রমণবিবরণীতে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশের বৃত্তান্তটি নিঃসন্দেহে রুশ-ভারত মৈত্রীর বিষয়বস্তু বলে ধরা যায়। যেমন মার্কো দেখেছিলেন, (১২) গাঙ্গেয়বঙ্গের বিশ্ববিখ্যাত রেশমবস্ত্রের সম্ভার, দাক্ষিণাত্যের উপকুলভূমির নানাবিধ সুগন্ধী মশলা, মূল্যবান প্রস্তর, মান্নার উপসাগরের মুক্তা, বিবিধ বনৌষধি গঙ্গে (তাম্রলিপ্ত) বন্দর এবং বারবারিকাম (সিন্ধুর মোহানা) বন্দর থেকে হোর্মুজ প্রণালী (আরব) হয়ে চলে যাচ্ছে ব্যাক্ট্রিয়াতে। ব্যাক্ট্রিয়া থেকে স্থলপথে আবার রপ্তানী হচ্ছে পূর্বে চীনে এবং পশ্চিমে বুখারা, সমরখন্দে।

আবার মার্সডেন সম্পাদিত মার্কোর ভ্রমণবৃত্তান্তে আছে (১৯) কাশ্মীর এবং পেশোয়ার থেকে ভারতীয় পণ্যবাহী 'কাফিলা' (ক্যারাভান) নিয়মিত যেত তুর্কীস্থানে, অর্থাৎ আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার তুর্কমেনিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। তুর্কীস্থান তথা সমগ্র মধ্যএশিয়ার পণ্যের বাজার ছিল কাবুলে। মার্কোর এই তথ্যটির আভাস পাওয়া যায়, রুশ-ভারত মৈত্রীর ইতিহাসের গবেষক পি, এম কেম্পোর এই উক্তিতে—(১৪)—**Kabul was the meeting place of merchants from Balkh, Fergana, Bukhara, Turkestan, Samarkand, Badakshan and India.**

কাবুল যেমন তেমনি বাগদাদ। বাগদাদও স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতীয় এবং মধ্যএশিয়ার দেশদেশান্তরের বেনিয়াদের মিলনকেন্দ্র। প্রাচীন ইতিহাসে আছে বাগদাদে রুশী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্থায়ী উপনিবেশ ছিল। আরও

এমন অনেক জনপদের সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগেই নজীর আছে যা পরবর্তীকালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত হয়েছে। তাই সাতশো বছর আগের মার্কোর এই ভ্রমণবিবরণীকে নিঃসন্দেহে রুশ-ভারত মৈত্রীর একটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলা যায়।

মার্কোর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রসঙ্গেই নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য বলা যায়, পোলো-ভাইরা (মার্কোর বাবা ও কাকা) চীনে কুবলাইখানের দরবারে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বেশ কয়েক বছর থেকে পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আবার ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তারা চীনে ফিরে গিয়েছিল—সে-সব বৃত্তান্ত কারো অবিদিত নেই। দ্বিতীয়বার চীনে যাবার সময়েই বাপ-খুড়োর সঙ্গী হয়েছিল সতেরো বছরের জোয়ান ছেলে মার্কো—ভাবীকালের সেই বিশ্ববিশ্রুত দুঃসাহসী পরিব্রাজক মার্কোপোলো! তারা ভেনিস থেকে বেরিয়ে ইস্কেন্দ্রাম উপসাগরের (তুরস্কের দক্ষিণে শহর ও বন্দর, পরবর্তীকালের আলেকজেন্দ্রিয়া সংলগ্ন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলের উপসাগর) তীরে বন্দর আয়াস (Ayas) হয়ে ইরাণের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ধরে এসেছিল পারস্যোপসাগরে হোর্মুজ প্রণালীতে। এখান থেকে তারা জলপথে চীনে না গিয়ে (পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী) উত্তরবাহী পথে পারস্য হয়ে, বলাখ অতিক্রম ক'রে বহুজাতির মিলন ক্ষেত্র (Meting pot of many nations) সেই আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার জলধারা-পুষ্ট মধ্যএশিয়ার ব্যবসাকেন্দ্র সমরখন্দে, তাসখন্দের ভেতর দিয়ে কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটানের ওপর দিয়ে স্মরণাতীতকালের সেই সিল্ক রুট ধরেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে গিয়েছিল বলেই এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন নগরে, জনপদে ভারত-রুশ মৈত্রীর প্রচুর আভাস পাওয়া যায় তার ভ্রমণবৃত্তান্তে। আরও কয়েকটি বিচিত্র তথ্য এখানে সংক্ষেপে বলা হলো।

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন —Greater India, Lesser India এবং Middle India (১৫)। তিনি চীন সম্রাট কুবলাই খানের অধীনে কাজ করার সময় ভারতের উপকূল প্রদেশে পরিভ্রমণ ক'রেছিলেন। তিনি বলছেন,—Leaving the city of Yachi (Yunan State) and travelling towards in a weserly direction I reach in the province Karazan. In this province, the horses are

of a large size and whilst youngs are Carried for sale to India. অর্থাৎ চীনের পশ্চিম সীমান্তে ইউনান প্রদেশ থেকে সুদূর পশ্চিমে রওনা হয়ে তিনি এসেছিলেন 'কারজানে' অর্থাৎ আধুনিককালের উজবেকিস্থান রিপাবলিকের কোনো রাষ্ট্রে। আর স্বচক্ষে দেখেছিলেন আমুদরিয়া উপত্যকার জলে বাতাসে পুষ্ট বলশালী ও তেজস্বী অশ্বসরবরাহ হচ্ছে ভারতে।

আবার আরব সমুদ্রোপকূলে মার্কো দেখেছেন, আরবীয় জাহাজগুলো আদা মসলিন আর প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপের খোল বারিগাজা (সুরাট) থেকে নিয়ে চলেছে পারস্যের দিকে। পারস্য থেকে সেই পণ্যসম্ভার চলে যাবে মধ্য-এশিয়ার কিজিলকুম মরুভূমি পেরিয়ে সুগ্দে—কি আরও দূরে। আর মার্কো দেখেছেন পারস্যোপসাগরের থেকে ভারতগামী জাহাজে আসছে ভল্গা পারের সেই ভুবনবিখ্যাত নরম কৃষ্ণবর্ণ পশম (Black fur), চামড়া আর ঘোড়া—তাদের লেজগুলো বেশ ছোট ক'রে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে যাতে ডাইনে বাঁয়ে অকারণ লেজের ঝাপটা দিয়ে অশ্বারোহীর বিরক্তি উদ্রেক না করতে পারে।

গুজরাটকে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেছেন KANAN—এই কানানে তিনি পারস্যগামী ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজও দেখেছেন। গুজরাট সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আগেও বলা হয়েছে।

হোর্মুজ প্রণালী থেকেই উত্তরে কিছুদূর যেতেই মার্কো এলেন এমন এক দেশে যার চারদিকে নীল পাহাড়ের প্রহরা। যেদিকে তাকাও স্বাস্থ্যঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর পড়ে রয়েছে গা এলিয়ে। ওমান উপসাগর ও পারস্যোপসাগর সংলগ্ন ছবির মতো সুন্দর এই দেশটির নাম কারমেন (Kirman) আধুনিক কালের দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণের একটি প্রদেশ।

সেখানকার অধিবাসীদের কেমন লাল লাল চুল। কটা চোখ। তামাটে গায়ের রঙ। বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ চেহারা। কারমেনের ক্যারাভানসরাইয়ের সামনের মাঠে উজবেকিস্থানগামী ভারতীয় বেনিয়াদের কাফিলার জানোয়ার-গুলো চরে বেড়াচ্ছে। মনের আনন্দে তাজা ঘাস খাচ্ছে। হঠাৎ স্থানীয় এই লাল লাল চেহারার কয়েকটা লোক এসে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে সুরু করলো। অমনি হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এলো ভারতীয় সওদাগরেরা। ব্যাকুল

হয়ে তাদের বললো : তোমাদের পায়ে পড়ি, মন্ত্র বলো না তোমরা—

কি ব্যাপার ? কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেই মার্কো জানতে পারলো, ওরা মন্ত্রবলে রাত্রির অন্ধকার নামিয়ে দিতে পারে। They can produce darkness by diabolical and magical power...আর দিনদুপুরের ঝকঝকে রোদ মুছে দিয়ে যেই চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাতার দস্যুরা। আরও জানতে পারলো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ওই মানুষগুলো তুর্কীস্থানের তাতার এবং ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণে এক বর্ণশঙ্কর জাত কারাউনাস (Karaunas) (১৬) কিন্তু এই শোণিতসমন্বয় হলো কি ক'রে ?

কারমেন থেকে অনেক দূরে এক দেশ রিওবারলের (Reobarle,—আধুনিককালের সোভিয়েত তুর্কীস্থানের অন্তর্গত) নৃপতি জগতাই খানের ভ্রাতুষ্পুত্র নুগোদরের (Nugodor) কানে পড়েছিল, উজবেক থেকে হিন্দুস্থানের দিকে যেতে আছে নাকি এক দেশ, যার উর্বরা মাটিতে অপর্যাপ্ত শস্যসম্ভারে ভূমি লক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সেই সোনার দেশের নাম মালাওয়ার (Malawar, অর্থাৎ Lawhar বা লাহোর Lahor তথা পাঞ্জাব)—রাজকুমার নুগোদরের চোখে সেই সমৃদ্ধ দেশের রাজা হওয়ার স্বপ্ন নেমে এলো।

অতএব সুরু হলো অভিযান। দশহাজার রণনিপুণ, দুর্ধর্ষ তাতার সৈন্য নিয়ে বাদাখশান, কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে এসে তদানীন্তনকালের পাঠান সুবেদার সুলতান আজিউদ্দীনকে পরাজিত ক'রে পাঞ্জাব জয় করেছিল নুগোদর। কিছুদিন সেখানে রাজত্বও করেছিল। এই সময় তার তাতার অনুচররা ভারতীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু নুগোদর স্থায়ী-ভাবে বসবাস করেনি। তার যে তাতার সেনারা এদেশী স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাসহ স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল তাদের নুগোদর পুনর্বসতি দিয়েছিল সেই নীলাভ পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছবির মতো সুন্দর দেশ কারমেনে। তাদেরই পরবর্তী বংশধর এই কারাউনরা। তারা যে শুধু অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান তা নয়, দুর্ধর্ষ তাদের রণনিপুণতা (১৭)। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একদা উজবেকবাসী এই কারাউনরা যাদের রক্তে ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্রের সেই সুমহান ঐতিহ্য এবং তাতারদের সেই যুদ্ধোন্মাদনা তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে—তারা রুশ-ভারত মৈত্রীর জীবন্ত প্রতীক।

যুগ-যুগান্তরব্যাপী নরবংশের স্রোত পৃথিবীর দেশে দেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আধুনিককালের রুশীয়দের ভেতরে কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছে হাজার বছর আগের সেই কারাউন—সেই সিদ্ধান্ত করবে ভাবীকালের নৃতত্ত্ববিদ।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি — পৃষ্ঠা

(১) Travels of Morcopolo. Prologue. Werner Forman — ৭
(২) Silk Route. Bulnois. L. and Cottie, A. Burland. — ১৯৮
(৩) Websters Geographical, Dictionary. 'Sarai Batu'
(৪) Travels of Marcopolo. ed. by Marsden — ৭৪৬
(৫) Ibid — Ibid — ৬৯১
(৬) Ibid — Ibid — ৫৫-৫৬
(৭) Periplus of Erythrean Sea — ১৭১
(৮) Travels of Marcopo!n. ed. by Yule—Book I. Chap XVII.
(৯) Periplus of Erythrean Sea — ৭১
(১০) Ibid — ৭১
(১১) Beyond the oxus. Edgar Knobloch — ১৬
(১২) Travels of Marcopolo. ed. by Marsden — ৪১
(১৩) Ibid — Ibid — ১৫৬
(১৪) Bharat-Russ. P. M. Kemp. — ৬৫
(১৫) Travels of Marcopolo. ed. by Marsden, (Introduction)
(১৬) Ibid — Ibid — ৯৩
(১৭) Ibid — Ibid — ৮৭-৯৯

দশ

ইবনবতুতা ঃ গাঙ্গেয় উপত্যকায় খোয়ারিজমের ঘোড়া ও তরমুজ।

মধ্যযুগের আর এক দুঃসাহসী এবং বহুদর্শী ভ্রমণকারী—

ইবন বতুতা (১৩০৩-১৩৭৭)।

তাঁর পুরো নাম—মহম্মদ ইবন অবদ আল্লাহ ইবন বতুতা (Mohammed Ibn Abd Allah Ibn Batutah)। তাঁর ভ্রমণবিবরণীর সম্পাদক এইচ, এ, আর, জিব (H. A. R. Gibb) জানিয়েছেন (১)—The greatest Muslim traveller of the middle ages.

বতুতা তাঁর জীবনের ত্রিশটি বছর মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় তাঞ্জিয়ার প্রদেশের মরক্কো (জন্মভূমি) থেকে রওনা হয়েছিলেন (১৪ই জুন, ১৩২৫) হজযাত্রীদের সঙ্গে মক্কার উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন পথে পাঁচবছরে (১৩২৭ থেকে ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দ) আরও পাঁচবার মক্কা গিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই ধর্মের আকর্ষণে নয়। বৈচিত্র্যের আকর্ষণেই এবং অজানাকে জানার আগ্রহেই তিনি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কিলোয়া থেকে কোন সুদূর ভল্গার উপত্যকার বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করে ভারত থেকে সুমাত্রা, চীন হয়ে আবার মরক্কো ফিরে গিয়েছিলেন।

তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের আর এক বহুদর্শী এবং প্রবীণ সম্পাদক মেহেদী হোসেন (Mahdi Husain) বলেছেন (২)—বতুতা ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। তিনি ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, কবি, যোদ্ধা, নাবিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রখর রুচিজ্ঞানসম্পন্ন এক আনন্দময় পুরুষ।

বলাবাহুল্য, এইরকম বিপুল প্রতিভাশালী ব্যক্তির ভ্রমণবিবরণী অনেক বিচিত্র তথ্যসমৃদ্ধ হবে। তাই মেহেদী সাহেব তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন রেহলা (Rehla) অর্থাৎ খনি (Mines of Information)।

ইবনবতুতার আগে আর কোন ভ্রমণকারী আমুদরিয়া উপত্যকার বিভিন্ন জনপদের আমীর উজীর ওমরাহ্ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জীবনধারা এবং সেইসঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের এমন নিঁখুত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেন নি। আর তাঁর সেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ভেতরে গাঙ্গেয়ভূমির ইতিবৃত্ত বারে বারে এসে পড়েছে বলেই অনায়াসে বলা যায়—এই দুই প্রাচীন ভূখণ্ডের শোনিতসম্পর্ক এবং সৌহার্দ্যবন্ধন সুদূরকালের।

১৩৩৩ সালের জুন মাসে বতুতা এসেছিলেন ভল্গার পশ্চিম তীরে বুলগারে। বুলগার একদা ধনে-জনে সমৃদ্ধ এক নগর।

সাম্প্রতিককালের Tatar Autonomous Republic-এর অন্তর্গত কুই-বিসেভ জেলার বলগারি (Bolgari) গ্রামে আজও ছড়িয়ে রয়েছে সেই সুপ্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর বুলগারের ধ্বংসচূর্ণ।

বতুতার সমসাময়িককালে বুলগারের বাজার ছিল রুশী, খাজার, তাতার এবং মুসলমান সওদাগরদের মিলনকেন্দ্র। আর প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল—কালো পশম এবং চামড়া।

এই পশম প্রসঙ্গেই বতুতা দিয়েছেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ। (৩)

বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র বুলগার শহর থেকে চল্লিশ দিনের পথ হলো—অন্ধকারের দেশ অর্থাৎ Land of Darkness। সেখানে আছে দূরপ্রসারী মরুভূমি। সেই মরুভূমির বালুকাবিস্তারের ওপরে থাকে জমাট বরফের আস্তরণ। তুষারাচ্ছন্ন সেই মরুর ওপরে আকাশে থাকে ঘন কালো মেঘ। দিনের বেলাতেই রাতের অন্ধকার সেখানে ছেয়ে থাকে। সেই মরুভূমি অতিক্রমের একমাত্র যানবাহন হলো—কুকুরে টানা গাড়ি।

যেতে যেতে যেই রাত্রি নেমে আসে তখন পথ চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাও—নিকষ কালো অন্ধকার। তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করতে যাওয়ার আগে সওদাগররা তাদের পণ্যগুলো বাইরে রেখে দেয়।

পরদিন ভোরে তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে তাদের পণ্যের বস্তাগুলোর পাশে

কারা যেন থরে থরে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে বুলগারের ভুবনবিখ্যাত 'এরমাইন' (Ermine) অর্থাৎ সাদা ধবধবে পশমের পসরা। সওদাগররা নিজেদের ভেতরে সমানভাবে ভাগ করে নেয় সেই পশম। আর সেই পরিমাণ মূল্যের পণ্য অন্ধকারের দেশের সেই অজানা এবং অদৃশ্য ব্যবসায়ীদের জন্য সেখানে নামিয়ে রেখে চলে যায়।

দুর্গম এবং ভয়াবহ সেই মরুভূমির বুকে এই পদ্ধতিতেই চলে নিঃশব্দ সেই ব্যবসায়ের বিকিকিনি। This is the method of selling and buying of dumb trade !

কখনই না-কি তুষারাস্তীর্ণ মরুর দেশের সেই পশম ব্যবসায়ীদের কেউ স্বচক্ষে দেখে নি। এই বিচিত্র তথ্যটি বতুতার সমসাময়িক আরবির ভূগোলবিদ্ আবুল ফিদের (Abul Fide) বিবরণেও আছে।

ইবন বতুতা জানিয়েছেন—যাবতীয় পশমের ভেতরে শ্বেতশুভ্র মসৃন এই পশম-ই সর্বোৎকৃষ্ট—Ermine is one of the best varieties of furs. ছয়শো বছর আগেও ভারতীয় সওদাগররা মহার্ঘ এই পণ্যটির অস্তিত্ব জানতো। বুলগার থেকে এই সাদা পশম ভল্গা পাড়ি দিয়ে বুখারা, সমরখন্দ পেরিয়ে রপ্তানী হতো ভারতে। ঘন রোমাবৃত শ্বেত নকুলের এই পশমের (একটি বেজীর গায়ের সম্পূর্ণ পশম) মূল্য ছিল দুইশো দীনার অর্থাৎ ২৩০টি ভারতীয় সোণার মোহর—One mental of this fur is valued in the land INDIA at a thousand dinars (Which are worth two hundred thirty gold mahors.)

বুলগারের পর আস্ত্রাখান।

বতুতা তাঁর নিজের জবানীতে বলেছেন—I arrived at Astrakhan in the month of June, 1333.

আস্ত্রাখান

ভল্গা ঠিক যেখানে কাস্পিয়ানে পড়েছে তার ষাট মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর একদা ছিল নৌবাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ

ইসলাম বলে (৪)—Ibn Batuta who passed through here in 1333 mentions for the first time a settlement supposed to have been founded by a Mecca pilgrim. কোনো সহৃদয় মক্কা তীর্থযাত্রী এই শহর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন বলে মঙ্গোল শাসনকর্তা এখানকার বাসিন্দাদের কাছে কর অর্থাৎ ট্যাক্স নিতেন না। সেই দূরকালের মঙ্গোল নৃপতির এই উদারতা, ধর্মের প্রতি তার আনুগত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এই জনপদের বিচিত্র নামটির ভেতরে—আস্ত্রাখান।

মাঙ্গোলরা বলতো Hadidi (হাজী) Tarkhan মঙ্গোলীয় ভাষায় তর্খানের অর্থ হলো কর থেকে অব্যাহতি পাওয়া বাসিন্দা। আবার যখন এই ভূখণ্ড এলো তুর্কী তাতারদের অধীনে তখন তারা এই জায়গাটাকে বলতে'—Azdarkhan। এই আজডারখান থেকেই রূপান্তরিত হয়েছে আস্ত্রাখানে। বতুতা বলেছেন ভারতীয়রা ভল্গা উপত্যকার বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই দশম শতাব্দী থেকেই। অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই জান' যাবে—ভারতীয়-দের আনাগোনা এই অঞ্চলে আরো অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। বতুতা আস্ত্রাখানে দেখেছিলেন, ভারতীয় ও রুশী বেনিয়ারা পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।

এই তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভল্গা উপত্যকার বিভিন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্রে ভারতীয় সওদাগরদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল দশম শতাব্দী থেকে। মৌর্যযুগেরও (খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) আগে থেকে আমুদরিয়া-শিরদরিয়া-বিধৌত ভূখণ্ডে যে গাঙ্গেয়ভূমির পরিব্রাজক, শ্রমন এবং সার্থবাহদের পদচিহ্ন পড়েছিল —সে সব বিশদ আলোচনা পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে করা হয়েছে।

আবার এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম বলেছে (৫)—ষোড়শ শতাব্দীরও অনেক আগে থেকে ভারতীয় বেনিয়াদের স্থায়ী উপনিবেশ ছিল আস্ত্রাখানে। ভারতীয়দের সঙ্গে তাতারদের রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আস্ত্রাখানের ভূমিজ সন্তান তাতার এবং গাঙ্গেয়ভূমির মানুষের শোণিতসমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে যারা তাদের বলা হয় 'অ্যাগ্রিজ্যান' (Agryzan)।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেতরে কেপল জর্জ (Kepple George), ফষ্টার, জি, (Forster G), হ্যানওয়ে (Hanway) এবং পাল্লাসের (৬) (Pallas P. S) ভ্রমণবিবরণীতে মধ্য

সোভিয়েত এশিয়ার রুশীদের পূর্বসূরী তাতারদের সঙ্গে ভারতীয় তথা উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিন্দু বেনিয়াদের নিবিড় মৈত্রীবন্ধনের আরো ভূরি ভূরি ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে রয়েছে। সে সব আলোচনা যথাস্থানে করা হবে—

শুধু আস্ত্রাখানে নয়, বতুতা বুখারা সমরখন্দ মধ্যএশিয়ার যেখানেই গিয়েছেন, দেখেছেন, গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্যবসায়ীরা এবং রাজপুরুষেরা নানা কর্মসূত্রেই সেখানে গিয়েছে।

বতুতা আস্ত্রাখানের পরে বুখারার কথা বলেছেন—"আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম যে রাস্তা ধরে তার নাম 'সিবিয়া'। 'সিবিয়া' অর্থাৎ 'সিবার' বুখারার উপকণ্ঠে একটি গ্রামের নামে এই মরুপথের নাম—সিবিয়া! পুরো ছয় দিন ছয় রাত্রি মরুভূমির ওপর দিয়ে চলতে হলো আমাদের। রাস্তার দুদিকে যতদূর চোখ যায়, জনশূন্য, তৃণশূন্য, অন্তহীন বালুবিস্তার। কোথাও নেই কোনো মরুদ্যানের স্নিগ্ধ ছায়াভাস। ছয়দিন পরে আমরা একটি ছোটো গ্রামে পৌঁছা-লাম। তার নাম ওয়াবখানা। ওয়াবখানা থেকে বুখারা মাত্র একদিনের পথ। এলাম বুখারায়। এখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে রয়েছে উদ্যান। সেই বাগানের নিবিড় সবুজ গাছে গাছে ঝুলেছে থোকা থোকা আঙুর। দূরে দূরে বাতাসে মাথা নাড়ছে রাশি রাশি খেজুর গাছ। প্রত্যেকটি গাছের ডাল খেজুরের ভারে নুয়ে পড়েছে।

বুখারার এই খেজুরের প্রসঙ্গেই বতুতা বলেছেন (৭)—**Merchants of Bukhara Carry the dried fruit to India.** বুখারার বেনিয়ারা শুকনো খেজুর রপ্তানী করতো ভারতে।

বুখারা-সমরখন্দ।

আধুনিককালের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের উজবেকিস্তান প্রদেশের পূর্বে ও পশ্চিমে এই দুইটি প্রাচীন জনপদের সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডের আত্মীয়তা কত নিবিড় ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ—বতুতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই বিচিত্র ঘটনাটি (৮)—

সমরখন্দের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে বতুতার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এই ভদ্রলোকটির নাম—সদরাল জাহান। সদরাল ছিলেন সমরখন্দের

সুলতানের কাদী (Quadi) অর্থাৎ নাজীর। এই নাজীর ভারতের বাদশাহের (তুঘলক) সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এসে সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী মুলতানে মারা যান।

মুলতানের সুবেদার ভারতের বাদশাহকে জানালেন এই দুর্ঘটনার কথা—আরও জানালেন—তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ভারতে এসেছিলেন।

শোচনীয় এই দুঃসংবাদ পেয়ে তুঘলক (গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহ গাজী মালিক—১৩২০-১৩৮৮) মৃত নাজীরের পুত্রকে ছয় সহস্র দীনার পাঠিয়ে দিলেন।

শুধু তাই নয়। সদরালজাহান সশরীরে দিল্লীতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে পারলে যে যে উপঢৌকন পেতেন—ঠিক সেইসব বহুমূল্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন তার স্ত্রী ও পরিজনদের। মনোহর সেই উপহার পেয়ে সদরাল জাহানের শোকগ্রস্ত পরিবার খুশি হয়েছিলেন।

আমুদরিয়ার দেশের সঙ্গে ভারত-ভূখণ্ডের মৈত্রীবন্ধনের আরও কত নজীর আছে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে।

বুখারার পর বতুতা এলেন এক সমৃদ্ধশালী জনপদ নাখাসায় (Nakhasha)। সেখানকার সুলতান ছিলেন মঙ্গোলদের চাগাটাই বংশসম্ভূত বিপুল প্রতাপশালী তার্মাসিরিন (Tarmashirin)। বতুতা জানিয়েছেন (৯)—His country is situated between the dominions of the four great emperors of the world—China. India. Iraq and Ozbek. এই চারটি রাজ্যের নৃপতির সঙ্গে-ই তার্মাসিরিন সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে খোরাসান অভিযানে শোচনীয় পরাজয়ের পরে তার্মাসিরিন ভারতের বাদশাহ তুঘলকের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন অনেকদিন।

খোয়ারিজম্।

১৩৩৩ সালের শেষের দিকে আমুদরিয়ার ভাটিতে প্রাচীন জনপদ খোয়ারিজমে (আধুনিককালের উজবেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) এলেন বতুতা। খোয়ারিজমের আমীর বতুতাকে উপঢৌকন দিলেন পাঁচশো দীনার। মরক্কোর সোনার ৩০০ দীনার।* এই প্রসঙ্গে-ই বতুতা বলছেন—এই অর্থ থেকে ৩৫টি

* সোনার ১ দীনার = ২৫টি রূপোর দীনার
রূপোর ১ দীনার = ৩৭ শিলিং

রুপোর দীনার দিয়ে আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট তেজস্বী অশ্ব কিনেছিলাম। তার গায়ের রঙ ছিল ঘন কালো মসৃণ ভেলভেটের মত। অবশ্য খোয়ারিজমের আমীর কুতলুদুমুরের (Qutludumur) নজরানার অর্থে আমি আরও অনেক ঘোড়াই কিনেছিলাম। কিন্তু এই ঘনকৃষ্ণবর্ণ অশ্বটি ছিল আমার খুব প্রিয়। আর এই অশ্বটির পৃষ্ঠে সওয়ার হয়েই আমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিলাম—entered the land of India with this black horse of Khwarism (১০)—

খোয়ারিজম থেকে এত বিপুল সংখ্যক অশ্ব নিয়ে এসেছিলাম, তাদের তেজস্বিতা, সংখ্যার প্রাচুর্য এবং অটুট স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য দেখে মুলতানী অশ্ব-ব্যবসায়ীরা রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতো।

আমুদরিয়ার দেশের তথা আধুনিককালের সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার জলে বাতাসে পুষ্ট অশ্ব যেমন তেমনি আরও অনেক পণ্যেরই বিপুল চাহিদা ছিল ভারতে। আর বলা বাহুল্য—এইসব পণ্যকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভেতরে-ই দুই প্রাচীন ভূখণ্ডের মৈত্রীবন্ধন সূচিত হয়েছিল সেই ছয়শো বছর আগে।

খোয়ারিজমের তরমুজ।

একমাত্র বুখারা ছাড়া খোয়ারিজমের তরমুজের সঙ্গে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কোন দেশের মেলনের তুলনা হয় না। খোয়ারিজমের তরমুজের রঙ ঘন সবুজ। ভেতরের শাঁস যেমন রক্তবর্ণ তেমনি চিনির মত মিষ্টি। বতুতা প্রত্যক্ষ করেছেন—এই তরমুজ কেটে ফালি ফালি করে রৌদ্রে শুকিয়ে নল-খাগড়ার তৈরী ঝুড়িতে রাখা হচ্ছে। সেই বাক্সবন্দী তরমুজের শুকনো ফালি রপ্তানী করা হচ্ছে ভারতের দূরতম প্রদেশে—Exported from Khwarism to the remortest part of India. (১১)

মরক্কোর এই বিদগ্ধ মুসলমান ভ্রমণকারী ইবন বতুতা গাঙ্গেয় উপত্যকার মাটিতে প্রথম পা দিয়েছিলেন এক রুশী বন্ধুর সহায়তায়। (১২)

খোয়ারিজমের এক জ্ঞানী-গুণী ভদ্রলোকের সঙ্গে বতুতার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি একদিন বতুতাকে বললেন—মালিক উল্-হিন্দ (ভারতের বাদশাহ) তাকে লাহিরির * (Lahiri) সুবেদার নিযুক্ত করেছেন। তাই সে ভারতে

* করাচীর কাছে একটা সমুদ্র বন্দর।

যাচ্ছে, বতুতা গেলে খুশি হবে—

এখানে বলে রাখা ভালো—খোয়ারিজমের এই গুণী ব্যক্তিটি এক সময় হীরাটে (কাবুল) কাজী ছিলেন। তিনি ভারত সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

বতুতা বন্ধুর সঙ্গে ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। দুর্লঙ্ঘ্য পামীর পেরিয়ে তারা এলেন আফগানিস্থানে। এইবার তারা বিশাল বিস্তীর্ণ সিন্ধুনদের সামনে এলেন। বতুতার সখা খোয়ারিজমের ফাজিসার সঙ্গে ষোলটি সুদৃশ্য জাহাজ। আজীরের অর্থাৎ ফাসিসার অর্ণবযানটির নাম 'অল-আহাউ রাহ'। তার নৌবহরের অন্যান্য তরীগুলো ছোটো এবং বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু যতো চাকচিক্য আর কারুকার্য—সব সেই মালিকের জলযানে 'অল-আহাউরায়'। তার দুদিকে দুটো ছোটো ছোটো ডিঙ্গিও চলেছে। ডানদিকের দুটোতে আছে আমীরের 'জারাতির' (গানবাজনার যন্ত্রপাতি), ড্রাম, বিউগলস্, ফ্লুট আরও নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র আর বাঁদিকের দুটো নৌকোয় আছে—গায়ক গায়িকাদের দল। মূল গায়েন মধুর সুরে গান করে—তার পাশে সমবেত কণ্ঠে দোহার ধরে তার সঙ্গীরা।

বেজে ওঠে ড্রাম ; বেজে ওঠে শানাই। বাজতে থাকে বিউগল। মধুর ঐকতানের সঙ্গে তাদের মিষ্টি গলার গানের সুর সিন্ধুর সেই বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যেতে লাগল। প্রভাতী গানের সেই সুমধুর সুরের মূর্চ্ছনা বতুতার সমস্ত চেতনাকে কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ করে দিলো। আর কখন যে তিনি গায়েনদের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়ে বিভোর হয়ে গান শুরু করলেন তা জানতে পারলেন না।

এই ঘটনাটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে চতুর্দশ শতাব্দীর তাঞ্জিয়ার নিবাসী মুসলমান ভ্রমণকারী ইবনবতুতার সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। আর ভারতের প্রতি প্রীতি ভাবাপন্ন খোয়ারিজমের অর্থাৎ উজবেকিস্থানের দোস্তের সহযাত্রী গায়কদের গানের সুরেই শত-শতাব্দী পূর্বেই কি রুশ-ভারত মৈত্রীর অনুরণন ধ্বনিত হয়নি ?

৫ই নভেম্বর ১৩৩৩। শুক্রবার।

বতুতা সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী মুলতানে (অধুনা পাকিস্থানের উত্তর-পূর্বে

এবং লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর) পৌঁছলেন। কিন্তু—

তার আগে একটি ঘটনা ঘটে গেল। (১৩)

মুলতান শহর থেকে দশমাইল দূরে পড়ল একটা ছোট নদী—খুসরোয়াবাদ (Khusroabad)। নৌকায় খেয়া পার হতে হবে। এমন সময়ে স্থবেদার অর্থাৎ কুতব-উল-মুলুকের প্রতিনিধি হয়ে এলেন শুল্কবিভাগের কর্মচারী অর্থাৎ কাষ্টম অফিসার। তিনি যাত্রীদের মালপত্র তল্লাসী শুরু করে দিলেন। বেশ শক্ত করে বাঁধাছাদা মালপত্র তছনছ করে এই সার্চিং-এ বতুতার বরাবর খুব বিরক্তি। কিন্তু—

মরক্কোনিবাসী বহুদর্শী এই ভ্রমণকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাষ্টম অফিসার বললেন—আদাব! আপনার মাল তল্লাসী হবে না—

বতুতা বিস্মিত হলেন। আল্লাহকে বার বার ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু কেন তাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো বুঝতে পারলেন না।

জানতে পারলেন পরদিন। নদীর ওপারে তাঁবুতে বিশ্রাম করছেন বতুতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন ডাকবিভাগের পরিদর্শক অর্থাৎ পোষ্ট্যাল স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট (মালিক-উল-বারিদ)।

আপনার মালপত্র তল্লাসী করে হয়রানি করেনি তো? জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। বললেন, আমি আপনার কথা—আপনি বহু দেশ ঘুরে সমরখন্দ থেকে এসেছেন—খানদানী আদমী এসব জানিয়ে দিয়েছিলাম কাষ্টম অফিসারকে—

আপনার নাম— দেশ কোথায়?

আমার নাম দিখান। দেশ সমরখন্দ—

এই ঘটনাটির ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে দুইটি ঐতিহাসিক সত্য—আধুনিক কালের উজবেকিস্থানের স্থপ্রাচীনকালের জনপদ সমরখন্দের দিখানের মত আরও অনেক লোকই নিশ্চয় ভারতে কর্মরত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত ভারতীয় মুসলমান কর্মচারী সেই কাষ্টম অফিসারের বতুতাকে শুধু সমরখন্দ ঘুরে এসেছেন বলে তল্লাসী থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ভেতরে আমুদরিয়া উপত্যকার দেশের প্রতি গাঙ্গেয় ভূখণ্ডের গভীর শ্রদ্ধা ও নিবিড় প্রীতির আভাস পাওয়া যায়।

বতুতার সমসাময়িককালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নগর এবং ব্যবসা-

কেন্দ্রগুলো ছিল মধ্যএশিয়ার বেনিয়া এবং রাজপুরুষদের দ্বারা অধ্যুষিত। (১৪)

দিল্লীর সিংহাসনে বসে রয়েছে বাদশাহ-তুঘলক। বতুতা প্রত্যক্ষ করলেন, একদিনে দুইজন বিদেশী মানী ব্যক্তি সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রথম ব্যক্তি—সমরখন্দের একজন শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত অধিবাসী—মুবারক শাহ, দ্বিতীয় হলেন—আরন বাঘা—বুখারার একজন অন্যতম ব্যবসায়ী।

ইবনবতুতার সমগ্র ভ্রমণ বিবরণীতে সমরখন্দ বুখারা খোয়ারিজমের অধিবাসী-দের সঙ্গে ভারতীয়দের নিবিড় সখ্যতার এত অজস্র তথ্য ছড়ানো রয়েছে বলেই অনায়াসেই বলা যায় আরও শত শত বছর আগে—সুদূর অতীতে-ই সূত্রপাত হয়েছিল এই মৈত্রী বন্ধনের।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি — পৃষ্ঠা

(১) Travels of Ibn Battuta. ed. by H.A.R. Gibb.

(২) Rehla of Ibn Battuta. ed by Mahadi Hussain. — ৯

(৩) Travels of Ibn Battuta. ed by H.A.R. Gibb. Vol. 2. — ৪৯১

(৪) Encyclopedea of Islam. Vol. I. — ৭২১

(৫) Ibid Ibid. — ৭২২

(৬) Bharat-Russ. P. M. Kemp — ২৫৭-৬৭

(৭) Travels of Ibn Battuta, ed by H.A.R. Gibb Vol. 3. ৫৫০

(৮) Ibid. Vol. 3. ৫৬৯

(৯) Rehla of Ibn Battuta, ed by Mahadi Hussain. ২৫৪

(১০) Travels of Ibn Battuta, ed by H.A.R. Gibb. Vol. 3. ৫৪৬-৪৭

(১১) Ibid. Ibid. ৫৪৭

(১২) Rehla of Ibn Battuta, ed by Mahadi Hussain. ৯

(১৩) Ibid. Ibid. ১২

(১৪) Ibid. Ibid. ১৪

এগারো

বাবর ঃ এই দুই মহাদেশের সখ্যতার সেতু বন্ধন

বাবর

জাহির-উদ্দীন মহম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০) ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—আমরা ইতিহাসের এই তথ্যটুকুই জানি।

কিন্তু মধ্যএশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকার সুপ্রাচীন-কালের এই মৃত্তিকার মৈত্রী বন্ধনে বাবরের অবদান অপরিসীম। হ্যারল্ড ল্যাম্বের (Harold lamb) 'বাবর দি টাইগার' (Babur the Tiger) নামে বাবরের জীবনীগ্রন্থে আছে (১)—Samarkand was brought to India. এই মন্তব্যের ভিতরে ভারত-রুশ মৈত্রীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

কিন্তু সমরখন্দকে বাবর কেমন ক'রে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। কোথায় সেই সিরদরিয়া নদীর নিম্নভাগের বদ্বীপে অবস্থিত সেই মোল্লা-মসজিদ অধ্যুষিত প্রাচীনদিনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর সমরখন্দ আর হিন্দুকুশ পামীর পেরিয়ে কোথায় সেই ভারত—এই দুইটি ভূভাগ এক হয়ে গেল কি ক'রে ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হ'লে যেতে হবে—যেতে হবে শত শত বছরের ওপারে, যেতে হবে 'বাবর দি টাইগারের' বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর জীবনের সেই অধ্যায়ে যখন তার পূর্বপুরুষ ইতিহাসবিখ্যাত তৈমুরলঙের রাজ্য সমরখন্দ পুনরুদ্ধার করার জন্তে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, দুর্গম তিয়েনশান পাহাড়ের চড়াই উৎরাইতে, ইলিনদীর-দুজন গারিয়ান গেটের গিরিপথে, কারিটিগিনের উপত্যকায়

বনেপ্রান্তরে হতাশ হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সহায় নেই। সম্বল নেই। শুধু চোখে আছে স্বপ্ন—

সমরখন্দ।

তাঁর অতীত পুরুষের সোনার দেশ—সমরখন্দ অধিকার করতে হবে। তাঁর পিতৃদেব শেখ ওমর মীর্জার ক্ষুদ্র সেই পরগণা 'ফেরগনা' নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। তাঁর কানের কাছে বাজতে থাকে তাঁর পিতার বলিষ্ঠ কণ্ঠের জোরালো কথাগুলো—তোমার পূর্ব-পুরুষের দেশ সমরখন্দ যেমন করে হোক জয় ক'রতে হবে। শুধু সমরখন্দ নয়, তাসখন্দও দখল করতে হবে—

তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সুদূর বাল্যকালের এক একটা দৃশ্য।

শিরদরিয়া নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অরণ্যে শিকারে নিয়ে যাওয়া হতো তাঁকে। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ। শিকার নাম মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশিক্ষা। সঙ্গে থাকতো তুর্কীবীর এবং ওস্তাদ তীরন্দাজ ইউনুস খান। থাকতো ফেরগনার সেনাপতি আলি দোস্ত।

এই অস্ত্রশিক্ষা কাজে লেগেছিল। বিশ বছর নিরলসভাবে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা উজবেক খানদের সঙ্গে যু'দ্ধ করে তার স্বপ্নকে সত্যে রূপায়িত ক'রেছিলেন।

কিন্তু সমরখন্দ জয় করেও তৃপ্ত হলেন না বাবর। তাঁর জীবনীকার বলেছেন (২)—Babur was, at heart, an adventurer, চারিদিকে সুদৃশ্য বাগান-ঘেরা সেই সুন্দর শহর সমরখন্দের দিকে তাকিয়ে বাবরের মনে হয়েছিল, হিন্দুকুশ-পামীর ছাড়িয়ে সেই ধনেজনে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুস্থানে রাজ্য-বিস্তার করতে হবে—আর সেই-দেশের মাটিতেই সমরখন্দের মতো সুদৃশ্য এক নগর গড়ে তুলতে হবে—

বাবরের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বলেছেন (৩)—This determination was Babur's most remarkable. To this he added a unique ambiton : the new land having...a city where gardens like those at Samarkand might be made.

এখানে উল্লেখযোগ্য, বাবরের ভারতে আসার মূলে আরও কারণ ছিল। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রনেই বাবর ভারতে এসেছিলেন

আর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন—এসব তথ্য ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক এই তথ্য ভারত ও আধুনিক কালের মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার সুদীর্ঘকালের সখ্যতার বিষয়ভুক্ত নয়।

বাবর কি শুধুই তৈমুর কি চেঙ্গিসের মতো বহিরাগত এক আক্রমণকারী ? না। তাই যদি হতো তাহলে ভারত-রুশ মৈত্রীর ইতিহাসে বাবরের প্রসঙ্গ নিতান্তই অবান্তর হয়ে যেতো।

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক বিভারীজ, হ্যারল্ড ল্যাম্ব স্পষ্টই বলেছেন (৪)—Wiih him he brought to India the Timurid devotian to music and verse—and wine.

His fondness for building gardens earned him the name of the Gardener king...

বাবর মধ্যএশিয়ার সংস্কৃতিকেও বহন করে এনেছিলেন। তাঁর রক্তধারায় প্রবাহিত সেই তৈমুরীয় সঙ্গীত, কবিতা ও মদ্যপ্রীতি তিনি গাঙ্গেয় ভূমিতে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই বাবরকে বলা যায়, মধ্যএশিয়ার (আধুনিক কালের উজবেক এবং কিরগিজিয়ার) ধ্যান-ধারণা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির আদি-কালের দূত।

বাবর তাঁর জন্মভূমি সেই ফেরগানা-উপত্যকার সন্নিহিত তাসখন্দ সমর-খন্দের অনুকরণে গড়ে তুলেছিলেন আগ্রা শহর। তাহলে ষোড়শ শতাব্দীর সমর-খন্দ কেমন ছিল ?

সমরখন্দ তদানীন্তনকালের মধ্যএশিয়ার অন্যান্য শহরের মতোই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। (৫) সেই প্রাচীরকে বেস্টন করে থাকতো পরিখা। এই পাঁচিল ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমনকে প্রতিহত করার মতো বেশ মজবুত করে তৈরী। তার পরিধি ছিল ১৬ মাইল। জায়গায় জায়গায় ১৫ ফুট উঁচু। ১২টি প্রবেশ দ্বার আর শহরের মাঝখানে দুইটি প্রধান পথ ছিল। পরিখার বাইরে ছিল শ্যামলঘন তরুশ্রেণীর উদ্যান। সেই বাগানও আবার উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তাই বহিরাগত কোনো শত্রু কি পথিক যখন সমরখন্দের দিকে আসতো, তখন দূর থেকে তার নজরে পড়তো শুধু- ঘনসন্নিবদ্ধ নিবিড় সবুজ

গাছগাছালি। ভিতরে যে কতো বড়ো একটা শহর আছে, তার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যেতো না—

এই সমরখন্দের অনুকরণেই বাবর আগ্রা শহর তৈরী করেছিলেন। তাই বাবরনামায় আছে (৬)—That tree shade gardens of Samarkand followed him to Agra... শুধু তাই নয়, উজবেকিস্থান তথা ফেরগানা উপত্যকার অনুকরণে দিল্লী এবং আগ্রায় সাদা এবং লাল পাথরের বড়ো বড়ো সৌধ তৈরী হতে লাগল। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ঘন সবুজের ছবির মতো মনোরম উদ্যানের শোভা উজবেক-পারসিক তথা পারসিক সংস্কৃতির প্রভাব। তাই—

আজ নয়াদিল্লীতে, চন্ডীগড়ে, ভারতের বিভিন্ন আধুনিক জনপদের রাজপথের দুধারে নানারঙের ফুলের শোভায়ভরা বাগান আর তার আড়ালে ছোটো ছোটো এক একটা সুদৃশ্য সৌধের অপরূপ ছবি দেখে কি কারো ফেরগানা উপত্যকার সেই ভাগ্যান্বেষী যুবকের কথা মনে পড়বে ?

ভারতের জনজীবনে আর একটি বিস্ময়কর অবদান আছে বাবরের। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন (৭)—ফেরগানা এবং সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হয়ে দাবা খেলার রাজার মত একঘর (রাজ্য) থেকে আর এক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময় ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে অতর্কিতে কাবুল অধিকার করে বসলেন। কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হিন্দুস্থান জয়ের স্বপ্ন নেমে এল তাঁর চোখে। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে অধিকার করলেন কান্দাহার।

তিনি লক্ষ্য করলেন, গাঙ্গেয় ভূখণ্ড তথা হিন্দুস্থান থেকে পারস্যে বা খোরাসানের ভেতরে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাকেন্দ্র দুইটি—

কাবুল।

কান্দাহার।

সেই সুদূর ষোড়শ শতাব্দীর তিনের দশকেই কাবুলের বিস্ময়কর এবং বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তাঁর নজরে পড়েছিল (৮)। কাবুল এবং কান্দাহার—এই

এই দুটো ব্যবসাকেন্দ্র খুব জমজমাট। কাবুলে আসে ব্যবসায়ীরা কাশগড় (আধুনিককালের পশ্চিম চীন), ফেরগানা (উজবেক এবং কিরগিজিয়া), সমরখন্দ (উজবেক) থেকে, বলাখ, বাদখসান (আফগানিস্থানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, —এই ভূখণ্ডের উত্তরে আমুদরিয়া এবং দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী; প্রাচীনকালে গ্রীকরা বলতো ব্যাক্‌ট্রিয়া, সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের তাজিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) থেকে, সওদাগররা যেতো ভারত থেকেও। খোরাসান বা পারশ্যের থেকে ব্যবসায়ীরা আসতো কান্দাহারে। মধ্য-এশিয়ার বলাখ, সমরখন্দের ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর সাত থেকে দশ হাজার ঘোড়া নিয়ে আসতো।

হিন্দুস্থান থেকেও আসছে মসলিন, আসছে সুগন্ধী মশলা, আসছে রেশমের পণ্যসম্ভার। আর হিন্দুস্থানী ব্যাপারীরাও মধ্যএশিয়ার সওদাগরদের কাছে থেকে কিনছে হৃষ্টপুষ্ট বলশালী অশ্ব, কিনছে কালো পশম। কাবুল থেকে চীনেও যাওয়া যায়। সেই স্মরণাতীতকালের সিল্করুট ধরে দেশদেশান্তরে সওদাগররা চীনেও যাচ্ছে।

ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে কাবুলের আলোকোজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবে বাবর আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে হিন্দুকুশ, পামীর ডিঙিয়ে খোরাসান পর্যন্ত পণ্য সম্ভার নিয়ে কাফিলা যাওয়ার মত রাস্তা করে দিয়েছিলেন। (৯)

মধ্যএশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সখ্যতা যে অপরিহার্য মনে করতেন বাবর তার প্রমাণও আছে বাবরনামায়। (১০)

কাবুলের বাজার বলাখ, বুখারা, তুর্কীস্থান সমরখন্দ ইত্যাদি মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন সমৃদ্ধ জনপদের ব্যবসায়ীদের মিলনকেন্দ্র বলেই হয়তো মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পূর্বে (১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে) আগ্রা থেকে কাবুলের রাস্তাটির সংস্কার করেছিলেন। চোদ্দ মাইল পর পর ১২৪ থেকে ১৩৬ ফিট উঁচু কোশ মিনার বা টাওয়ার তৈরী করেছিলেন। এই স্তম্ভের শীর্ষে ছিল চার-দরজাযুক্ত সুদৃশ্য কক্ষ। সেখানে থাকতো সদা-সতর্ক সশস্ত্র প্রহরীরা। তারা দেখতো —রাহজানরা (দস্যু) যেন হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সওদাগরদের পণ্যসম্ভার লুটে নিয়ে সর্বসান্ত করতে না পারে—

বাবরনামা ছাড়া রাশিয়ার সরকারী কাগজপত্রের তথ্যেও জানা যায় (১১)—

সুদীর্ঘ চারশো বছর আগেই বাবর তাঁর অসামান্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পিতৃভূমি শিরদরিয়ার উপত্যকা ফেরগানা তথা মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন সমৃদ্ধ জনপদের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধনের সুফল অনিবার্য এবং সুদূরপ্রসারী।

১৫৩২-৩৩ সালের রুশীয় সরকারী রেকর্ডে আছে, বাবর তাঁর প্রতিনিধি জনৈক হোড়জা হোসেন নামে এক ব্যক্তির মারফৎ বহুমূল্য অনেক সামগ্রীর নজরানা মহামান্য জারকে পাঠিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন—রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্য এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা।

জার বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সখ্যতাবন্ধনের প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন, বাবর কি ভারতের স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট না ভারতেরই কোন অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা?

বাবরের মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তাবে জার আর কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

বাবরের সমসাময়িককালের (ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে) শুধু রাশিয়ায় নয়—সারা পৃথিবীরই দেশে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল এবং বিস্ময়কর এক প্রসারতা এবং সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল—**XVI-XVII century saw an outburst of trading activities all over the world.** (১২)

রাশিয়ার ভৌগলিক অবস্থান ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের মাঝখানে বলেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সওদাগরদের আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন-কালের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র মস্কোভা বা মস্কো।

সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মস্কোভা তথা রাশিয়ার অসামান্য এই গুরুত্বের ঐতিহাসিক কারণও ছিল—

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটল। প্রাচীন গ্রীক এবং ইটালীর ব্যবসায়ী অধ্যুষিত পারস্যপোসাগর ও কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীর থেকে পশ্চিমী বণিকেরা বিদায় নিল। এই অঞ্চলে রুশীয় প্রভাব প্রসারিত

হয়ে গেল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী এবং জেসুইট পাদ্রীদের মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র সমরখন্দ-তাসখন্দ-বুখারা থেকে শুরু করে পারস্য ও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রুশীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তবে যেতে হতো।

পূর্ব ইউরোপ থেকেও তাতারদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে গেল। পশ্চিমী দুনিয়ার বেনিয়ারা মধ্যএশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সীমানার ভেতর দিয়ে আসতে শুরু করল।

আবার পর্তুগীজ জলদস্যুঅধ্যুষিত পারস্যপোসাগরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ইউরোপ থেকে মস্কো হয়ে মধ্যএশিয়ার পথে পারস্য এবং ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেও আলোচ্য শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধিতে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছিল—

রাশিয়া। (১৩)

বিচক্ষণ এবং অসাধারণদূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট বাবর ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার শাশ্বত নিয়মে মধ্যএশিয়া তথা রাশিয়ার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির খোঁজখবর নিশ্চয়ই রাখতেন—এটা নিশ্চয়ই কোন দূরবিসর্পিল কল্পনা নয়। আর—

তাই রাশিয়ার সঙ্গে সৌহার্দ্যবন্ধনে এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। আর এই প্রচেষ্টা যে বাবর তাঁর জীবনের প্রান্তে এসেও করে চলেছিলেন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জা কামরানকে লেখা বাবরের একটি অনবদ্য চিঠি। (১৪)

আর এই চিঠির আলোচনায় এই তথ্যটির উল্লেখ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না—তুখারিয় (তুর্কী) ভাষায় লেখা বাবরের আত্মস্মৃতির (Memoirs) সঙ্গে এই চিঠির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের আড়ালেও আছে রুশীয় এক রাজ-পুরুষের বিস্ময়কর এক অবদান—

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর বিশবছর পরে এশিয়ামাইনরের এক প্রাচীন নগর সিমাউ টায়াউতে (Simau Tau) পাওয়া গিয়েছিল এই পাণ্ডুলিপি। দীর্ঘ কয়েক বছর পরে জনৈক অজ্ঞাতনামা ভ্রমণকারী এই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এসেছিলেন বুখারায়।

১৭২১ সালে রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেটের এশিয়ামাইনরস্থ দূত

ফ্লোরিও বেন বেনিভেন্টামের (Florio Beg Beneventum) এক বিশিষ্ট সহকর্মী সরকারী কোন কর্মসূত্রে গিয়েছিলেন বুখারায়। তাঁর নজরে পড়ল দুই অধ্যায়ে বিভক্ত বাবরনামার (বাবরনামা এবং বাবরের চিঠি) এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট!

শিরদরিয়ার জলবিধৌত ফেরগানা উপত্যকার ভূমিজ সন্তান এবং রাশিয়ার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন সম্রাট বাবরের লেখার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাজদূতের যে কর্মচারী ক্রয় করেছিলেন এই পাণ্ডুলিপি এবার তাঁর জবানীতে বলা হলো—

আমি তিমুর পুলার (Timur Pular) মাননীয় রাজদূত ফ্লোরিও বেগ বেনিভেন্টামের সঙ্গে বুখারায় এসে সামান্য এক অশিক্ষিত ব্যবসায়ীর কাছে দেখেছিলাম এই পাণ্ডুলিপি। তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রসম পরাক্রমশালী এবং আকাশের তারার মত অজস্র অগণন সেনা যাঁর, যিনি মধ্যাহ্নের সূর্যের মত দেদীপ্যমান, সেই মহান নৃপতি মহামান্য জারের কথা স্মরণ করে এবং এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করলে বিশ্বভুবনময় তাঁর যশোপ্রভা বিস্তীর্ণ হয়ে পড়বে বলেই এই গ্রন্থটি ক্রয় করেছিলাম।

বুখারা ম্যানুস্ক্রিপ্টের ওপরে তিমির পুলারের এই মন্তব্যটি বা নোটটী ছিল তুর্কীভাষায়।

প্রায় একশো বছর পরে (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে) বুখারার এই পাণ্ডুলিপি এল প্রাচ্যবিদ এবং চাগাটিয়াবিদ্যার (মঙ্গোল-তুর্কী ইত্যাদি মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ভাষা বিষয়ক) পণ্ডিত ডক্টর হেনরিখ জুলিয়াস ক্ল্যাপরথের (Henrich Julius Klaproth) হাতে। হেনরিখ বাবরের যে চিঠিটি তুর্কী থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হলো—

আমার পরমপ্রিয় স্নেহাস্পদ মহামান্য এবং সর্বশ্রী পুত্র মীর্জা কামরাণ বাহাদুরকে—

স্নেহের কামরাণ,

মঙ্গলময় আল্লাহের অপরিসীম করুণা তোমার ওপরে অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক—আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এই আশীর্বাদ জানিয়ে বলছি—তুমি জেনে রাখবে আমুদরিয়া-শিরদরিয়া উপত্যকার দেশের (Trans-oxiana) অধিবাসীরা অত্যন্ত সরল, বুদ্ধিমান এবং খুব বিশ্বাসী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তুমি তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে নির্ভর করতে পারো।

তুমি তো জানো, পরম করুণাময় আল্লাহ আমার দুঃখ-দুর্দিনে আমাকে তাদের (ট্রান্স-অক্সিয়ানার অধিবাসী) মাধ্যমে-ই বিপুল সহায়তা করেছিলেন। আর তারই দূরপ্রসারী পরিণতিতে তুমি আজ হিন্দুস্থানের বাদশাহের পুত্র হতে পেরেছো—পেয়েছো রাজকুমার আখ্যা!

তাই তোমার কাছে আমার নির্দেশ এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমার দুঃখ বিপর্যয়ের দিনের বন্ধু আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার দেশের অধিবাসীদের (রুশীয়) সঙ্গে সখ্যতাবন্ধন স্থাপন করবে। কাবুল-কান্দাহারস্থিত (কামরাণ তখন কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা) রুশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। সহৃদয় আচরণে, সুবিচারে এবং তাদের সামাজিক উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কাজ করে তুমি আমার স্বপ্নের সুদূর জন্মভূমির অধিবাসীদের হৃদয়ে বিপুল এক সুখের অনুভব ছড়িয়ে দেবে।

মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে পুত্রকে লেখা বাবরের 'হোর্ট্যাটরি' অর্থাৎ উপদেশমূলক এই চিঠির কথাগুলোর ভিতরেই কি ভারত-রুশ মৈত্রীর আধুনিককালের এই দৃঢ় বনিয়াদের ভিত্তি রচিত হয় নি?

বাবর সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় এইচ, বিভারীজের (H. Beveridge) লেখা জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (১৫)—

অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে 'বাবরনামার' আর একটি পারসিক ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি আছে। এই পুঁথিতে এমন একটি তথ্য আছে যার ভেতরে আভাস পাওয়া যায় সেই ঐতিহাসিক সত্যের—ট্র্যান্স-অক্সিয়ানা অর্থাৎ আমুদরিয়ার দেশের শুধু রাজা-উজীর, আমীর ওমরাহ নয়, যে কোন নগণ্য সাধারণ মানুষের প্রতিও বাবরের ছিল অন্তহীন স্বতোৎসারিত প্রীতি।

সমরখন্দের এক পীর ফকির—মাখাদাম আজমের (Makhdam Aazam) সঙ্গে বাবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ফকিরের খোঁজখবর রাখতেন। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পরে যুদ্ধ-বিজয় উপলক্ষ্যে সেই সুদূর সমরখন্দে ফকিরকে পাঠিয়েছিলেন বহুমূল্য সামগ্রীর এক উপঢৌকন।

এই সময় (১৫২০-২১) অক্ষুনদীসংলগ্ন দেশে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে

লিপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে পাঠিয়েছিলেন সুদীর্ঘ একটি রিলিজিয়াস অর্থাৎ ধর্মীয় কবিতা 'মুবেয়ান' (Mubayyan)। এই কবিতাটির ভেতরে ছিল আমুদরিয়ার দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের উপদেশ।

কবিতার মাধ্যমে এই রাজনৈতিক কাজটি রাশিয়ার মহামান্য জার গ্রেট ভ্যাসিলি দি থার্ডের (১৫০৫-৩৩) সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন এবং বাণিজ্যিক সখ্যতার প্রচেষ্টা, তার আভাস পাওয়া যায় আলোচ্য শতকের বিশ্ববিশ্রুত ভ্রমণকারী জেনকিনসনের এই উক্তিতে—Negotiations opened by Vassili Ivanuovitch with famous Babar and the interest taken by his son and successors...

বিভারিজ জানিয়েছেন বাবরের স্মৃতিকথার (Babar Memoirs) আরও দুইটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি আছে Eton College Library-তে। ১৭৫ পৃষ্ঠা। এই স্মৃতিচারণটিকে 'History of Farghana বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আর একটি আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ৩২১৬ নং। এই পাণ্ডুলিপির শুরুতে আছে পরবর্তীকালের সম্রাট জাহাঙ্গীরের লেখা তুর্কী ভাষায় একটি মন্তব্য (১৬)—

'মগর চাহার যাজু গাম আনরাবা কাতখুদ নভিস্তম' অর্থাৎ প্রথম চারটি অধ্যায় ছাড়া অবশিষ্ট-অংশটা আমার লেখা। প্রথম চারটি অধ্যায় উত্তম-পুরুষে বাবর লিখেছেন আমুদরিয়ার দেশের বা ট্রান্স-অক্সিয়ানার মাটি আর মানুষের কথা!

নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর কোন ভারতীয় সম্রাট বোধ করি এমন করে অক্ষুউপত্যকার দেশের স্তুতিবন্দনা করে অনাগত ভবিষ্যতের রুশ-ভারত মৈত্রীর বনিয়াদকে সুদৃঢ় করেননি।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা

(১) Babur the Tiger. Harold Lamb. ২১৪

(২) Ibid Idid ৭৪

(৩) Ibid Ibid ৭৪

(৪) Ibid Ibid ২১৩-২১৫

(৫) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ১০৭

(৬) Babur the Tiger. Harold Lamb ২১১

(৭) Baburnama. ed, by Annette Susannah Beveridge ১৮২-১৮৫

(৮) Ibid Ibid ২০২

(৯) Badar Namah, British Museum. Addl M.S.S. ২৪, ৪১৬

(১০) Baburnama. Ed. & Tr. by Mrs Beveidge. ৬১০

(১১) Buhler. Baron Fivou. Odin Izkatalagov Vremen. A. E, Mahlinvskogov Sobornik Moskovskogo Elabhogo Arkhiva. 1880 & other Russian Documents. (Govt.) বিবিধ

(১২) Indian History Congress Proceeding. 1966 Surendra Gopal. ৪৬০

(১৩) Botero. Giovanni. Relations of the Most Famous Kingdoms and Commonwealth through out the World. As mentioned in P. M. Kemp's 'Bharat Russ' ৬২-৬৮

(১৪) A letter From the Emperor Babur to his son Kamran ed. by H. Beveridge (ICS. rtd) in J.A.S.B.—N.S. XV—1919 also in J.R.S. 1909 ৩৩৩

(১৫) Babar the king. By H. Beveridge in J.A.S B.—N.S.—1905. Vol. I ১৩৭

(১৬) Fragments of Babarnama. H. Beveridge In J.A.S.B.—NS. 1908 Vol. 4 ৪০

বারো

জেনকিনসন ঃ রুশ-ভারত মৈত্রী

মধ্যসোভিয়েত এশিয়া ও ভারত—এই দুটো সুপ্রাচীনকালের ভূখণ্ডের সভ্যতার ইতিবৃত্ত ষোড়শ শতাব্দীতে আরো উজ্জ্বল আরো দূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে। আলোচ্য শতাব্দীর রুশ-ভারত মৈত্রীর নানা চিত্তাকর্ষক তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন দুঃসাহসী ভ্রমণকারীদের ভ্রমণবৃত্তান্তে, ব্যবসায়ী এবং ধর্ম-প্রচারকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ অনেক বিবরণের ভেতরে—ছড়িয়ে আছে দুই দেশের সীমান্তবর্তী শহরের স্থানীয় সরকারের রেকর্ডে।

রুশ-ভারত মৈত্রীর খবর পাওয়া যায় জেনকিনসন অ্যানথনি (১৬১১ মৃত্যু নামে এক দুঃসাহসী ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর ভ্রমণবৃত্তান্তে।

জেনকিনসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য হলো (১)—Jenkinson was the first Fnglishman who penetrated into Central Asia. His Voyages, though undertaken mainly in the interest of the commerce, served largely to extend geographical Knowledge of the districts, till then known only by name...

আবার মধ্যএশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প-সভ্যতার বিশেষজ্ঞ এডগার নোব্লক (Edger Knobloch) জানিয়েছেন (২)—Anthony Jenkinson an Elizabethan merchant was probably the first Englishman to enter Bukhara (1558) after Journey from London to the white sea to Moscow and down to Volga into the Caspian.

এলিজাবেথের স্বর্ণযুগের প্রথম ইংরেজ সওদাগর যিনি লণ্ডন থেকে শ্বেত-সাগর পাড়ি দিয়ে মস্কো হয়ে ভল্গানদী পেরিয়ে কাস্পিয়ানের সন্নিহিত দেশে

পরিভ্রমণ করেছিলেন বলেই সেই সুদূর অতীতে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জনপদ বুখারা, বাকু, আস্ত্রাখান ইত্যাদির নামগুলোই যখন জানতো লোকে—সেই সময় জেনকিনসন এই সমস্ত শহরের ভৌগোলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ লোকসমক্ষে জ্ঞাত করেছিলেন।

কে এই জেনকিনসন ?

জেনকিনসন অ্যানথনি এক বহুদর্শী ইংরেজ সওদাগর। তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাসবিদরা শুধু মারচেন্ট কথাটি প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হননি। বলেছেন (৩)—**Not only merchant, Sea Captain and a Traveller—when still a youth was sent in 1546 into Leavant as a trainee (or) on a training for a mercantile career.**

১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনকিনসনের বয়স তখন কত ছিল কেউ জানে না, কেননা তাঁর জন্মের সালটা বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে। তাই বলা হয়েছে শুধু 'youth'। হয়তো বিশ বা বাইশ বছর বয়সে সমুদ্র বাণিজ্যে শিক্ষানবীশ করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল 'Levant' অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরবর্তী দেশগুলো সিরিয়া এবং 'Holy Land' প্যালেস্তাইনে।

শুধু তাই নয়, জেনকিনসন অ্যালজেরিয়া, টিউনিস, স্পেন, ইটালী, গ্রীস, তুরস্কে এই উপলক্ষ্যে পরিভ্রমণ করেছিলেন—সেই ষোড়শ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে।

কিন্তু জেনকিনসনের নাম ভারত ও মধ্য-সোভিয়েত এশিয়ার সখ্যতাবন্ধনের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে কোন সূত্রে ?

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনকিনসন এসেছিলেন সিরিয়ায়। সিরিয়ার তদানীন্তনকালের নৃপতি সুলেমান এই ইংরেজ সওদাগরের উপরে খুব প্রীত হয়েছিলেন। সুলেমান তাঁকে বিনা শুল্কে তুরস্কের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। জেনকিনসন শুধু যে ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তা নয়—বিভিন্ন বন্দরের এবং ব্যবসাকেন্দ্রের দেশ-দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাদের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন আর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পৃথিবীবাসীকে জানিয়েও দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরই লেখার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই দুটো মহান দেশের ব্যবসায়ীদের লেনদেন তথা তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ইতিহাস।

গাঙ্গেয় উপত্যকার তথা বাংলাদেশের বেনিয়ারাও যে বুখারার বাজারে তাদের পণ্য সম্ভারের পসরা সাজিয়ে বসতো, বোধ হয় জেনকিনসনের ভ্রমণ-বিবরণীতে-ই আছে সর্বপ্রথম স্পষ্ট উল্লেখ (৪)—Merchants came to Bukhara from furthest Part of INDIA, even from the country BENGALA, the river GANGES...

কিন্তু কোথায় বুখারা আর কোথায় বেঙ্গলা (বঙ্গদেশ)! সাড়ে চারশো বছর আগে বাঙ্গালী বেনিয়া তাদের ভুবনবিখ্যাত পণ্যসম্ভার সেই মসলিন (Gangetie Musslin) নিয়ে যেত বুখারায়। জেনকিনসন স্পষ্ট বলেছেন গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে শুধু Fine Textiles অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র-সম্ভার-ই রপ্তানী হতো। সোনা, রূপো, মূল্যবান প্রস্তর বা সুগন্ধী মশলা ইত্যাদি আর কোন পণ্যের-ই দায়িত্ব তারা (ভারতীয় বা বাঙ্গালী সওদাগর) নিত না—Gold, Silver, preoious stones and spices, they bring none (৫)—

গাঙ্গেয় উপত্যকার বণিকেরা এবং পারসিক বেনিয়ারা বুখারায় যেত হীরাত এবং মেসেদ হয়ে। এইখানেই জেনকিনসনের ভ্রমণ বিবরণীর সম্পাদক ফুটনোটে লিখছেন—বিগত শতকের চল্লিশের দশকের (১৮৪০ খ্রীঃ) এক ভ্রমণকারী খেনিকভ (Khenikov) প্রত্যক্ষ করেছেন—প্রতি বৎসরে সুদীর্ঘ চারটি কাফিলা মেসেদ থেকে পারসিক রেশমের বস্ত্রাভরণ, শাল, কার্পেট ও বিবিধ পণ্যসম্ভার এবং গাঙ্গেয় মসলিন নিয়ে প্রবেশ করতো বুখারায় (৬)—Four caravans annually entered Bukhara from Meshed...

ভারতীয় বা গাঙ্গেয় উপত্যকার বেনিয়ারা মসলিন বিক্রি করে বুখারার বাজার থেকে কি কিনতো—সে-তথ্যটিও আছে জেনকিনসনের ভ্রমণবৃত্তান্তে—ভারতীয় সওদাগরেরা কিনতো তুর্কীস্থানের হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব (৭)—Indians carry horses. আর কিনতো লাল টকটকে মসৃণ রুশী চামড়া (৮)—Russian Redhides এবং বুখারার সিল্ক। ভারতীয় এবং বুখারার সওদা-গরদের বিকিকিনির বৃত্তান্তটি যথাসময়ে বিশদ আলোচিত হবে।

এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই তথ্যটি—সুদূর সেই ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বুখারার মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। জেনকিনসন জানিয়েছেন (৯)—

Bukhara cotton is largely consumed by Russian manufacturers......রুশীয় বেনিয়ারা কাঁচা তুলো কিনে নিয়ে যেত তাদের নিজেদের দেশে। রুশীয় বস্ত্রশিল্পীরা (Manufacturers) সেই তুলো থেকে তৈরী করতো রকমারি নকসা বা বিভিন্ন চিত্র-মুদ্রিত (Prints) বস্ত্রসম্ভার।

শুধু তুলো নয়—বুখারার কাঁচা রেশম (রেশমের সুতোর পেটী) আবার কখনো বুখারাস্থিত ইহুদী কারিগরদের দ্বারা বিচিত্র এবং রং করা রেশমও নিয়ে যেত রুশীয় সওদাগররা। সেই সুতী এবং রেশমের বস্ত্রসম্ভার-ই আবার রুশীয় শিল্পীদের নিপুণ হাতে কারুকার্যমণ্ডিত হয়ে চলে আসতো তাদের লাল চামড়া, পিতলের তৈজসপত্র, ইস্পাতের তলোয়ার, আরও বিবিধ পণ্যের সঙ্গে বুখারা। বুখারা এবং সমগ্র মধ্যএশিয়ার চাহিদা মিটিয়ে এই রুশীয় পণ্যসম্ভার রপ্তানী হতে ভারতে (১০)—Russian prints, and wares (brass) supply the wants of the inhabitants of this (Bukhara) and adjascent countries of Central Asia......besides being carried through Bukhara, Afganisthan and Indian frontier...

বুখারা এবং ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রসঙ্গে-ই জেনকিনসন পরিবেষণ করেছেন একটি বিচিত্র তথ্য—আলোচ্য শতাব্দী নয়—তারও আটশত বছর এগিয়ে অর্থাৎ আটের শতকের (৮ম শতাব্দী) আগে থেকে ভারতীয় পণ্য বুখারা হয়ে চলে যেত পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তার কারণ—ভারত থেকে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত প্রসারিত একটি বাণিজ্যপথ ছিল বুখারার ওপর দিয়ে (১১) As early as the eight century a trade route from India to the Baltic is said to have passed through Bukhara......তাই আরবির বণিকদের মত ভারতীয় বেনিয়ারাও এই শহরটিকে তাদের পশ্চিমের দেশের এবং রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য করেছিল তাদের ব্যবসাকেন্দ্র বা trade centre।

ইউরোপ বা রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক লেনদেনের আরও বহু চিত্তাকর্ষক এবং চমকপ্রদ তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে জেনকিনসনের লেখা ভ্রমণবিবরণীতে—'Early Voyages and Travels to Russia and Persia' নামে দুই খণ্ডের বইতে।

কিন্তু খাস ইংরেজ, ইংল্যাণ্ডের খানদানী ঘরের ছেলে জেনকিনসন অ্যানথনি হঠাৎ দুরদুর্গম আর ভয়ভীষণ পর্বত আর দুস্তর মরুভূমিতে অধ্যুষিত মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আবার চলে যেতে হয় জেনকিনসনের জীবন বৃত্তান্তের ভেতরে। (১২)

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া (জেনকিনসনের সমসাময়িক কালে এই অঞ্চলটির নাম ছিল অ্যালেপ্পো—Aleppo, কিছু অংশ আরব এবং আর কিছু অংশ তুরস্কের ভেতরে। বর্তমানকালে এই এলাকা পুরোপুরি সিরিয়ার অধীনে) থেকে সফর শেষ করে ফিরে এসে এক বিস্তৃত বিবরণী পেশ করলেন রাজদরবারে।

স্মরণ রাখতে হবে—সেই সময়টাকে ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ—Golden Age. ঠিক তার তিন বছর পর (১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) রাণী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেছিলেন। এই যুগেই সেক্সপীয়রের বিস্ময়কর প্রতিভা সারা পৃথিবীকে সচকিত করে দিয়েছিল। সাহিত্যে আর জ্ঞানানুশীলনে, ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পে ইংল্যাণ্ড তখন নিজেকে প্রসারিত করে দিতে প্রয়াস করেছে পৃথিবীর দূরদূরান্তে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপনে যখন খুব আগ্রহী—সেই সময় (১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইংল্যাণ্ডের রাজানুগ্রহপুষ্ট একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মস্কোভী (Muscovy) কোম্পানী তাদের সওদাগরী নৌবহরের অধিনায়ক নিযুক্ত করে জেনকিনসনকে পাঠিয়ে দিলেন রাশিয়ায়। তাঁর মাইনে ছিল বার্ষিক চল্লিশ পাউণ্ড।

এই কোম্পানী জেনকিনসনকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল কেন? স্পষ্ট করে কোথাও তার উল্লেখ না থাকলেও অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় এর হেতু জেনকিনসন সিরিয়া ঘুরে এসেছেন। মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি বহুদর্শী। তাই হয়তো মস্কোভী কোম্পানী তাঁকেই সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিল।

১২মে, ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোভী কোম্পানীর নৌবহর গ্রেটব্রিটেনের পূর্ব-উপকূলের বন্দর গ্রেভসেণ্ড থেকে রওনা হলো রাশিয়ার উদ্দেশ্যে। তীব্র তুষারের ঝড়ে অধ্যুষিত, প্রায় অজানা নরওয়ের উপকূল ধরে উত্তর অন্তরীপ (North Cape) ঘুরে ডুইনা নদী পাড়ি দিয়ে জেনকিনসন এসেছিলেন ভল্গায়।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ সেপ্টেম্বর, এলেন মস্কোয়। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই প্রথম জার—দি টেরিবেলের (Tsar I the terrible) রাজসভায় এক ইংরেজের প্রবেশাধিকারের অনুমতি মিলেছিল। শুধু তাই নয়—with his own mouth Tsar called him by name...' জার নাকি নিজের মুখে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন। হাজার মোমবাতির আলোয় মহাসমারোহে তাকে আপ্যায়িতও করেছিলেন জার। ১৫৫৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ চার মাস মস্কোতে ছিলেন জেনকিনসন।

মস্কো থেকে মস্কোভা নদী বেয়ে নিজনি নোভগরদ (সেকালের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র ; এখানে আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতো) হয়ে চলে এসেছিলেন আস্ত্রাখানে—১৪ জুলাই, ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

আস্ত্রাখানে—মধ্য-এশিয়ার এই জনপদ ভল্গা নদীর পশ্চিম তীরে। কাস্পিয়ান এবং ভল্গার সংযোগস্থলে বলে স্মরণাতীতকাল থেকেই মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মরোক্কোর সেই ভুবনবিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা এইখানেই স্বচক্ষে দেখেছিলেন—ভারতীয় বণিক এবং রুশী সওদাগররা পাশাপাশি ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন।

আর জেনকিনসন দেখলেন : আস্ত্রাখানে হিন্দু বণিকদের স্থায়ী উপনিবেশ (১৪)—There were Large colonies of Hindu merchants at Astrakhan...তার কারণও বলেছেন জেনকিনসন—সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং গুজরাট থেকে হিন্দুকুশ-পামীর পেরিয়ে 'কাফিলা, (উটের ক্যারাভান) করে চলে যেতো পারশ্যের সীমান্ত শহর তাব্রিজ (Tabriz) পেরিয়ে আস্ত্রাখানে।

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই ইংরেজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মস্কোভা কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম আস্ত্রাখানে এসেছিলেন জেনকিনসন। কিন্তু—

রাশিয়া অধিকৃত নতুন এই জনপদ প্রাচ্যদেশের প্রবেশদ্বার আস্ত্রাখানে বাজারের দৈন্যদশা দেখে যেমন খুশী হন নি জেনকিনসন, তেমনি বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ভারতের পথও আবিষ্কার করতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু—

পাঁচ বছর পরে (১৫৫৮-৫৯) মস্কোর রুশীয় রাজদূতদের সঙ্গে বলখ, বুখারা এবং কিয়েভ ও আস্ত্রাখান হয়ে মধ্যএশিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন।

এইবার জেনকিনসন আস্ত্রাখান এবং বুখারার বাজারে ভারতীয় বণিকদের আরও বেশী আনাগোনা দেখেছিলেন (১৪)—

জেনকিনসন যখন আস্ত্রাখানে তখন একটা দারুন দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় নেমে এসেছিল। দুর্ভিক্ষের পায়ে পায়ে এলো মহামারী। জেনকিনসন কাস্পিয়ানের উত্তর তীর ধরে চলে এলেন বোখারাতে (২ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে)। বোখারা সম্বন্ধে জেনকিনসন বলেছেন (১৫)—**Bukharan traders and settlers bought Indian goods...**এবং শুধু তাই নয়—বুখারিয়ান এবং ভারতীয় ব্যাপারীরা কখনো চলে যেতো চীনে, আবার কখনো যেতো আফগানিস্তানের ভেকর দিয়ে তিব্বতে। রুশী সওদাগররা বোখারা থেকে কাজানের ভেতর দিয়ে যেতো টারায়, টমস্কে, টবলোস্কে। টবলোস্ক থেকে কাজাকের স্তেপভূমির ওপর দিয়ে চলে যেতো বোখারাতে এবং কাবুলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মহামান্য রুশীয় জার ভ্যাসিলি আইভ্যানোভিচ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ছিলেন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যকে প্রসারিত করায় এবং ব্যবসায়িক সখ্যতা স্থাপনে উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। তাই দেখা যায়, আলোচ্যসময়ে রুশীয় সওদাগররা চতুর্দশ শতাব্দীরও আগে থেকে আজভ (ক্রিমিয়ার পূর্বসীমান্ত সংলগ্ন) উপসাগর থেকে পিকিং প্রসারিত বাণিজ্যপথ ধরে আস্ত্রাখান, সেরাই (সরাই বাটু), সেরাইচিক, উরগেন্দজ, বুখারা, সমরখন্দ হয়ে চলে যেত চীনে। (১৬)

ষোড়শ শতাব্দীর এই দুঃসাহসী ইংরেজ সওদাগরের ভ্রমণবিবরণীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে শত শত শতাব্দীর পূর্বে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জনপদে ব্যবসাকেন্দ্রে রুশী-ভারতীয় বণিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ইতিবৃত্ত। ঐতিহাসিকরা তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন—**'He seems to have been a good observer ...'** তাঁর সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিঁখুত বিবরণের ভিতরে পাওয়া যায় (১৭)—**Indian trade reached Bokhara via Meshed and Northern Khorassan (Persia). Generally fine textiles were imported from India, whilst coarser cotton and linen are now almost exclusively of Russian manufacture.**

এক ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করার তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না তাঁর রুশী সওদাগরকে প্রশ্ন করার—'হ্যাঁ ভাই, ভারতীয় বণিকরা যে কাপড় বিক্রি করছে তার কোয়ালিটি কী রকম ?'

'ফাইন ফাইন ভেরী ফাইন'—রুশী বণিকের চোখে খুশীর আমেজ জলজল করে। জেনকিনসন তাঁর ডায়েরীতে লেখেন (১৮)—Indians doe bring fino whites (Cambrics. muslins) which the TARTARS doe roll about their heads and all other kinds of whites which serue for apparell made of cotton woll and crasko (coarse linen)...আর এই ফাইন বা ভারতীয় মসলিনের দারুণ চাহিদা ছিল রুশীয় সওদাগরদের কাছে।

ভারতীয় মসলিন কেনার জন্য তাতাররা বা রুশীয় বেনিয়ারা মাথা পর্যন্ত বিকিয়ে দিতো আর অন্যান্য ধরণের পোষাক তারা তৈরী করতো অমসৃণ ও খসখসে কাপড় বা ক্রাসকো (ক্রাস-ল্যাটিন শব্দ ক্রাসাস থেকে—coarse বা রাফ) দিয়ে। তারপরেই জেনকিনসন বলেছেন (১৯)—enquired and preceived that all such trade (ভারতীয় পণ্যসম্ভার) passeth throught the...land route আফগানিস্থান, হিন্দুকুশ, পামীর পেরিয়ে যেত মধ্যএশিয়ার বুখারার এবং বিভিন্ন জনপদে—কিন্তু পারস্যোপসাগরের জলপথে ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হতো না কেন ? জেনকিনসনের নজর এড়ায়নি সেই ঐতিহাসিক সত্য—ভারতের সমুদ্রোপকূলের বিভিন্ন বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্যে পর্তুগীজদের ছিল অপ্রতিহত প্রভুত্ব (২০)—Portingals (Portuguese) were the masters of the coasts of India.

আবার এক ভারতীয় বণিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জেনকিনসন—'কিসের আকর্ষণে তোমরা এতদূরে বোখারার বাজারে আসো ?'

'বোখারা সিল্ক আর লাল টকটকে রঙের রুশী চামড়া, স্লেভ আর ঘোড়ার লোভেই আমরা এখানে আসি', ভারতীয় বণিক হেসে বলে, 'আমাদের দেশে রুশী চামড়া, রুশী ঘোড়ার খুব চাহিদা।'

এসব কথা বলে জেনকিনসন খবর দিয়েছেন (২১)—Bokhara silks

have always held a high place in the commerce of Central Asia.···Red hides came from Russia, always celebrated for her leather manufactures···

সবশেষে জেনকিনসন একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন যার ভেতরে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে সেই চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্য—রুশীয় পণ্যসম্ভারের প্রতি ভারতীয় বণিকদের আকর্ষণ ছিল দুর্বার।

বোখারোর বাজারে এক ভারতীয় ব্যাপারী অনেক লাল চামড়া এবং রুশী ঘোড়া কিনছে। তাকে গিয়ে জেনকিনসন বললেন, 'ভাই, রুশী চামড়া আর ঘোড়া কিছু বার্টার অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ করবে?' (২২)

'কিসের বিনিময়ে?'—ভারতীয় বণিকের কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

'তোমাকে কিছু মূল্যবান পাথর দেবো।'

'না, ভাল ভাল সোনা দিলেও রুশী চামড়া আর রুশী ঘোড়া হাতছাড়া করতে পারবো না।'

আবার ঠিক উল্টোটাও আছে—রুশীয় বেনিয়াকে জেনকিনসন প্রশ্ন করলেন —গাঙ্গেয় উপত্যকার মসলিন কি বার্টার করবে?

রুশীয় সওদাগর তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—না—গাঙ্গেয় মসলিন কোন কিছুর বিনিময়ে-ই হাতছাড়া করতে পারবে না—They would not barter such commodities as fine cloth (Gangetic Muslim).

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী পৃষ্ঠা

(১) Dictionary of National Biography.
Jenkinson Anthony Vol. 10. ১০

(২) Beyond the oxus. Edgar Knobloch. ৭২

(৩) Dict. of National Biography.
Jenkinson Anthony. Vol. 10 ১০

(৪) Early voyages and Travels to Russia and Persia—
Jenkinson Anthony
and other Englishmen.
Ed by Delmer Morgan and C. H. Coote. Vol. I ৮৮

(৫)	Ibid	Idid	৮৮
(৬)	Ibid	Ibid	৮৮
(৭)	Ibid	Ibid	৮৮
(৮)	Ibid	Ibid	৮৮
(৯)	Ibid	Ibid	৮৯
(১০)	Ibid	Ibid	৮৯
(১১)	Ibid	Ibid	৮৯

(১২) Early voyages and Travels to Russia and Persia.
Jenkinson Anthony—Intrudnction and
D. N. B.—Jenkinson Anthony

(১৩) Early voyages and Travels to Russia and Persia.
Jenkinson Anthony Vol. I ৮৮

(১৪) Bharat-Russ. P. M. Kemp. ৪১

(১৫) Early voyages and Travels to Russia and Persia.
Jenkinson Anthony Vol. I. ৮৮

(১৬)	Ibid	Ibid	৮৯
(১৭)	Ibid	Ibid	৮৮
(১৮)	Ibid	Ibid	৮৮
(১৯)	Ibid	Ibid	৮৮
(২০)	Ibid	Ibid	৮৮
(২১)	Ibid	Ibid	৮৮
(১১)	Ibid	Ibid	৮৮

তের

রুশ-ভারত মৈত্রী ঃ সপ্তদশ শতাব্দী
ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বা মধ্যএশিয়া

এই দুটো প্রাচীন ভূখণ্ডের সখ্যতাবন্ধনের স্মরণাতীতকালের ইতিহাসটি সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো উজ্জ্বল ও আরো বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল।

XVII Century saw an outburst of Indian trading activities in Russia. (১) অর্থাৎ রাশিয়ার ভারতীয়দের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই তথ্যটি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একবিংশতিতম বার্ষিক অনুষ্ঠানে (১৯৬৬ সালে) ঘোষণা করেছেন ভারতীয় ইতিহাস-গবেষক শ্রীসুরেন্দ্রগোপাল। (১) সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ ভারত-রুশ মৈত্রীর প্রসঙ্গে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে (এই অনুষ্ঠানে পঠিত) তিনি আরো জানিয়েছেন—রাশিয়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বলেই যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তেমনি ভারত থেকে বহু বণিক তাদের ভাগ্যান্বেষণে সেখানে গিয়েছিল।

এই তথ্যটির সমর্থনের আভাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভারত-বিদ্যার সোভিয়েত পণ্ডিত গোল্ডবার্গের এই উক্তিতে (২)—সপ্তদশ শতাব্দীর বহু আগে থেকে পর্তুগীজ এবং পরবর্তীকালে ডাচ ও ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশের সমুদ্র বাণিজ্যের প্রায় সমস্ত জলপথকে কুক্ষিগত করে বসেছিল বলেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে হিন্দুকুশ ও পামীর ডিঙিয়ে সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার ভেতর দিয়ে সুপ্রাচীনকালের সিল্করুট ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশীদার হয়ে উঠেছিল—

'তবে এখানে উল্লেখযোগ্য,' গোল্ডবার্গের তথ্য উদ্ধৃত করে রুশ-ভারত মৈত্রীর গবেষক সুরেন্দ্রগোপাল আরো জানিয়েছেন—'পারশ্য-উপসাগরের জলপথ যখনি নিরাপদ হয়েছে এবং বিনাবাধায় সওদাগরী জাহাজ চলাচল করতে পেরেছে তখনি অনেক ভারতীয় সার্থবাহ পারশ্য বা ইরাকের ভেতর দিয়ে চলে এসেছে কাস্পিয়ানের তীরে।'

রুশীয় সরকারী নথিপত্রে আছে, ভারতীয় বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল ১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু গোল্ডবার্গ আস্ত্রাখান এবং দেরবেন্দের সরকারী দলিল-দস্তাবেজ নাড়াচাড়া করে জানিয়েছেন—To be exact, Indian traders in Russia became active only in the 2nd half of the XVII Century (২)—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাশিয়ায় ভারতীয় সওদাগরদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

এইবার সুরেন্দ্রগোপাল তাঁর প্রবন্ধে প্রায় চারশো বছর আগের ভারত-রুশ মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে আরো যেসব তথ্য সন্নিবেশ করেছেন এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

(১) ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের নৃপতি শাহ আব্বাস ইংরেজদের সহযোগিতায় পর্তুগীজদের পারস্যোপসাগরে আধিপত্য এবং একচেটিয়া অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের সওদাগররা দলে দলে ভাগ্যান্বেষণে পারস্যের ভেতর দিয়ে আস্ত্রাখানে, বুখারায়, ছড়িয়ে পড়েছিল।

(২) জাহাঙ্গীরের সমসাময়িককালের ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল আর ১৬৩০ থেকে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে নেমে এসেছিল সর্বনাশা এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা হিমালয় পেরিয়ে কাবুল ছাড়িয়ে রাশিয়ার দিকে পাড়ি দিয়েছিল। সমসাময়িককালের এক প্রত্যক্ষদর্শী পরিব্রাজক দ্য ব্রুয়িন কর্নোলিস (De Bruim Cornelis) লিখেছেন (৩)—Indian merchants appeared in the Russian city of Kazan in 1638 along with the Persian traders. অর্থাৎ ভারতীয় বেনিয়ারা পারশিক সওদাগরদের সঙ্গে কাজানে গিয়েছিল।

সেই শুরু হলো রাশিয়ার মাটিতে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধ্যানধারণার আদিমতম সেই দূত, সওদাগরদের নিরবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। এই তথ্যটির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায় রুশীয় সরকারী দলিলের এই উদীপ্ত ঘোষণায় (৪)—From now onwards there is a continuous history of Indian traders in Russia.

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সেই একবিংশতিম অধিবেশনে সুরেন্দ্র-গোপালের প্রবন্ধ ছাড়াও সতেরো এবং আঠারো শতকের রুশী এবং ভারতীয় সওদাগরদের ব্যবসায়িক সম্বন্ধের অনেক প্রামাণিক নজীরই ছড়িয়ে রয়েছে সমসাময়িককালের পর্যটকদের বিবরণে এবং সরকারী নথিপত্রে।

আলোচ্য শতাব্দীর ভ্রমণকারী স্যার জন চার্ডিন (Sir John Chardin)। তাঁর ভ্রমণবিবরণী 'Travels in Persia' থেকে জানা যায় (৫)—পারস্যের ব্যবসায়ীদের ভেতরে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন হলো—ভারতীয় বেনিয়া—In Persia, main traders are Indians—এই ভারতীয় সওদাগররা পারস্য থেকে তাব্রিজ পেরিয়ে রাশিয়ায় চলে যেত ব্যবসা করতে—সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-রুশ সম্পর্কিত সরকারী নথিপত্রে আছে (৬)—From Persia they (Indians) take the advantage of Russian market.

চার্ডিনের লেখা থেকে আরও জানা যায়, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং গুজরাটের বেনিয়ারা ক্রমশ পারস্যোপসাগরের উত্তরে ইস্পাহান থেকে রুশীয় সীমানায় বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র আস্ত্রাখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ছিলেন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। তাই শুধু পারস্যে নয়, সমগ্র এশিয়াতেই তারা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত (honoured) ব্যক্তি। চার্ডিনের সমসাময়িক আর এক ভ্রমণকারী জন স্ট্রুইসও (John Stryus) আস্ত্রাখানের ভারতীয় বেনিয়াদের সম্পত্তিপন্ন অবস্থার উল্লেখ করেছেন। (৭)

এবার সপ্তদশ শতাব্দীর রুশ-ভারত সম্বন্ধীয় সরকারী রেকর্ড অনুসারে দুই দেশের বাণিজ্যিক সখ্যতার ইতিবৃত্তের কালানুক্রমিক বিবরণ নীচে দেওয়া হলো (৮)—

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে একদল বেনিয়া আস্ত্রাখানে গিয়ে

—১০

বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করতে বসল। তাদের ভিতরে একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী কাজান এবং নভোগরোদ হয়ে ব্যবসার সূত্রেই মস্কোতেও গিয়েছিল। আস্ত্রাখানে ফিরে এসে তার দেশের লোকদের কাছে রাজধানী এবং সেখানকার লোকের ভালো ব্যবহার ও বিশেষ করে ভারতীয়দের প্রতি তাদের গভীর সহানুভূতির কথা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল। তার এসব কথা ব্যবসায়ীদের মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়ল পারশ্যে এবং ভারতে। সেইসব শুনে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে আরও পঁচিশজন ব্যবসায়ী সপরিবারে আস্ত্রাখানে গিয়ে ডেরা বাঁধল। আর দেখতে দেখতে তাদের ব্যবসা বেশ জমে উঠল। বছর দুই পরেই কিন্তু আস্ত্রাখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুখী আর নিশ্চিন্ত জীবন বিঘ্নিত হয়ে উঠল।

পারসিক ভাষায় বিশেষজ্ঞ এক সরকারী দোভাষী দৌলত আবুজ খান ভারতীয়দের ওপরে নানা রকমের অন্যায় জুলুমবাজী করতে লাগল। সেই সঙ্গে তার স্বদেশের বণিক অর্থাৎ পারসিকদের সঙ্গে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করল।

ভারতীয় বণিকদের প্রতিনিধি সুটুর অথবা সীতারাম মস্কোয় জারের কাছে গিয়ে নালিশ করল—

"আস্ত্রাখানের রুশী গভর্ণর আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। কিন্তু দোভাষী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুখসুবিধা দেখার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী দৌলত আবুজ খান জোর করে নির্ধারিত পরিমাণ ট্যাক্সের চেয়ে বেশি কর আদায় করছে এবং চেষ্টা করছে যাতে আমরা আস্ত্রাখানে ব্যবসা করতে না পারি। যদি দৌলত আবুজ খানকে আস্ত্রাখান থেকে বদলি না করা হয় তাহলে আমাদের বাধ্য হয়ে আস্ত্রাখান ছেড়ে চলে যেতে হবে। বলাবাহুল্য আমরা ট্যাক্সের বাবদ যে পরিমাণ রুবল দেই সেই পরিমাণ অর্থ থেকে বঞ্চিত হবে রুশীয় সরকার। আর যদি আমাদের এই ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে অত্যাচারী সেই কর্মচারীকে বদলি করা হয় তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছি—পারশ্যস্থিত এক হাজার ভারতীয় ব্যবসায়ী আস্ত্রাখানে এসে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করবে"—

ঠিক দুই মাস পরেই জার আলেক্সি মিহাইলোভিচের (Czar Aleksey Mihailovich) স্বয়ং নিজের হাতে সই করা চিঠি এল আস্ত্রাখানের গভর্ণরের

কাছে। সে-চিঠির তারিখ ছিল ২০শে মে, ১৬৪৭। আর বিষয়টি হুবহু এখানে বলা হলো (৯)—

"A letter of Czar Aleksey Mihailovich to the Commandant of Astrakhan concerning the protccion of Indians who have came with merchandise to Astrakhan from all impositions."

আর এই ঐতিহাসিক চিঠিতে ছিল মাত্র একটি লাইন—আস্ত্রাখানের গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কেন দৌলত আবুজ খান তার বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না তার কারণ জানাও—আর সেই সঙ্গে ছিল জারের সুস্পষ্ট নির্দেশ—ভারতীয় বণিকদের স্বার্থরক্ষার সর্বাধিক প্রচেষ্টা করতে হবে এবং পারস্য থেকে ভারত থেকে তারা যাতে বেশী সংখ্যক আস্ত্রাখান আসে সেই অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে—

গভর্ণর সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পেয়েই একটা মিটিং ডাকলেন। ভারতীয় বণিকদের সেই জনসভায় উদাত্ত ভাষায় বললেন—

মহানুভব জার আপনাদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য মর্মাহত। আপনারা নির্ভয়ে এবং বিনাদ্বিধায় এখানে ব্যবসাবাণিজ্য করুন এবং এখন থেকে ট্যাক্স জমা দেবেন সরাসরি আমার দপ্তরে। একজনও ব্যবসায়ীর যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়—মহামান্য জার সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। আর—

আপনাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে দৌলত আবুজ খানকে আস্ত্রাখান থেকে কাজানে বদলী করা হলো—

এই ঘটনার পরেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যে কি বিপুল উদ্দীপনা পেয়েছিল তার কিছু তথ্য এখানে Russian-Indian Relations XVII Century Moscow Oriental Literature Publishing House 1958 থেকে দেওয়া হলো—

১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। (১০)—রুশীয় সরকার তাঁদের পারসিক দূতাবাসে জানালেন—তাঁরা ভারতীয় পণ্য কিনতে চান।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে—

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। (১১)—দুইজন ভারতীয় বেনিয়া মস্কো যাওয়ার জন্য আস্ত্রাখান থেকে বিপুল পরিমাণে গাঙ্গেয় মসলিন এবং সুগন্ধী মশলা নিয়ে কাজানে

এসেছিল। উক্ত দুইজন ভারতীয় সওদাগরের নেতৃত্বে আরও ৩৫জন উত্তর ভারতীয়, বেনিয়া সরাসরি কাজানের বাজারে এসে তাদের পণ্য রুশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেছিলেন।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ (১২)। উত্তর ভারতের কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বণিক আর্মেনিয় এবং পারসিক বেনিয়াদের সঙ্গে একযোগে মস্কোতে মহামান্য জারের কাছে আবেদন করল, তারা মস্কো শহরে ব্যবসা করতে চায়। জারের বৈদেশিক দপ্তর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দরখাস্তে লেখা আবেদনকারীদের ঠিকানাগুলো পড়ে দেখল, ভারতীয় বণিকরা পারশ্যের স্থায়ী বাসিন্দা আর পারসিক বনিকদের কারো বাড়ি ইস্পাহানে, কেউ থাকে জিলামে, আবার কেউ শেমেখার নাগরিক।

চিঠি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন কর্তৃপক্ষ। এই বিদেশী বণিকদের রাশিয়ার শহরে অবাধে ব্যবসা করতে দেওয়া কি ঠিক?

জারের বিবেচনার জন্য চিঠি পাঠানো হলো তাঁর কাছে। আর সেই চারশো বছর আগে ভারত-রুশ মৈত্রীর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই চিঠির ওপরে তাঁর স্বহস্তে লিখিত মন্তব্যে—Indian and Persian traders, the applicants, should be encouraged in trading at Moscow as our capital city has been infested with European traders making their fortune by selling Indian and Persien goods in our territory.

ইংরেজরা ভারতীয় এবং পারসিক পণ্যসম্ভার মস্কোর বাজারে বিক্রি করে তাদের লাভের অঙ্ক ফাঁপিয়ে তুলছে। ভারতীয় বণিকরা মস্কোতে ব্যবসা করলে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সরাসরি বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে উঠবে এবং তার ফলে সমৃদ্ধিই হবে—

অতএব ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। আর রাশিয়ার সরকারি দলিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা হলো—Thus the trading activities of Indians in Russia in XVII century started vigorously. সুপ্রাচীন কালের বিশাল ও পবিত্র মহানগরী মস্কোর রাজপথের দুই পাশের বিপণীতে ভারতীয় পণ্যসম্ভার মসলিন, গাঙ্গেয় জটামাংসী, কচ্ছপের খোল এবং মান্নার উপসাগরের মুক্তা, মহীশূরের সবুজ পান্না শোভা পেতে লাগল।

উত্তর ভারতের বণিকদের রক্তে রক্তে প্রবহমান শত শত বছরের বাণিজ্যের ঐতিহ্য। অতএব তারা শুধু ভারতীয় জিনিস যথা কার্পাসজাত পণ্য অথবা নানাবিধ মূল্যবান পাথর কিংবা পারশ্যের প্রধান পণ্যদ্রব্য রেশমে-পশমে বোনা গালিচা বিক্রি করেই সন্তুষ্ট থাকল না। দিনে দিনে সিন্ধু উপত্যকার বেনিয়ারা কিভাবে প্রসারিত করে তুলেছিল তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই ঘটনার ভিতরে।

১৬৪২ সাল (১৩)। মস্কোর তিনজন ভারতীয় বণিক আস্ত্রাখানের কালমুক তাতারদের কাছে থেকে সাতচল্লিশটি ঘোড়া কিনেছিল। এই তিনজন ভারতীয় সওদাগরের আবার তেইশজন বুখারিয় বেনিয়ার একটা দলের সঙ্গে শেয়ার ছিল। বুখারার ব্যাপারীরা কালমুকদের কাছে কিনেছিল ২১৯টা ঘোড়া। মোট ২৬৬টি ঘোড়া নিয়ে মস্কোর বাজারে বসল ভারতীয়-বুখারিয়দের যৌথ কোম্পানী।

কালমুকদের বলশালী তেজস্বী অশ্বের যেমন চাহিদা ছিল উত্তর ভারতের রাজরাজড়াদের কাছে, তেমনি ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মস্কোর অভিজাত অধিবাসীদের কাছে। তাই বলাই বাহুল্য, এই যৌথ সংস্থাটি প্রচুর লাভ করল। সেই টাকা দিয়ে তারা পাইকারী দরে কিনে ফেলল রাশিয়ার সব চাইতে মহার্ঘ পণ্য 'ব্ল্যাক ফার'—কালো ফার। এই ভুবনবিখ্যাত ব্ল্যাক ফারের সম্ভার তারা ভল্গা-কাস্পিয়ানের জলপথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশদেশান্তরে পাঠিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছিল।

এবার যৌথ সংস্থা নয়। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। Russian-Indian Relations of XVII Century-এর দলিলে লিখছে তার নাম—স্থটুর।

ভারতের কোন অঞ্চলের অধিবাসী তা রেকর্ডে নেই। যে অঞ্চলেরই লোক হোক না কেন, স্থটুর যে ঝানু ব্যবসাদার এবং রাশিয়ার সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহেই যে সে ব্যবসায় বিপুল উন্নতি করেছিল—সেসব ইতিবৃত্ত বিস্তারিত লেখা আছে রেকর্ডে!

১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ (১৪)। ভারত থেকে পারস্যের ভিতর দিয়ে তাব্রিজ শহর পেরিয়ে রাশিয়ার সীমান্তের ব্যবসাকেন্দ্র আস্ত্রাখানে এসেছিল স্থটুর। সে একা নয়। তার সঙ্গে এসেছিল আরও পঞ্চাশজন ভারতীয় বণিক। স্থটুর এসেই

আস্ত্রাখানের রুশীয় গভর্নরকে জানালো—রাশিয়া সম্বন্ধে সে ভূয়সী প্রশংসা করেছে বলেই তার সঙ্গী হয়ে ভারতীয় বেনিয়ারা এসেছে। অতএব ব্যবসা বাণিজ্যের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হোক—

গভর্নর খুশী হয়ে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

সুটুর মধ্যএশিয়ার এবং পারস্যের কাজাবিন, ইস্পাহান ও তাব্রিজে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতে লাগল। বেশ দুটো পয়সা হলো সুটুরের।

কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। টাকা রোজগার করাটা কেমন নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুটুরের। আর হবে না-ই বা কেন। ব্যবসায় অঢেল উপার্জন করলে কার না বেশী উৎসাহ হয়।

সুটুর তার ব্যবসা শুধু পারস্যে নয়, সুদূর আমুদরিয়ার উপত্যকার খোয়া-রিজমের প্রধান শহর এবং মধ্য-এশিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্র কিভা থেকে শুরু করে সেই কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ইউরোপীয় রাশিয়ার বড় শহর দেরবেন্টে শেরভানে ছড়িয়ে দিল তার ব্যবসা! দেখতে দেখতে ভাগ্যান্বেষী ভারতীয় সেই বণিক হয়ে উঠল বিত্তশালী বণিকদের ভিতরে একজন অন্যতম ব্যবসায়ী!

১৬৫১ সালে (১৭) সুটুর একাই চার হাজার রুবল কাস্টম ডিউটি দিয়েছিল। রাশিয়ার সর্বত্র তার প্রতিপত্তি আর মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। সুটুরের প্রতিষ্ঠা কি রকম সুদৃঢ় হয়েছিল—সেই ঐতিহাসিক সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে রুশ-ভারত মৈত্রীর সেই সরকারী দলিলের এই মন্তব্যের ভেতরে—
In the fifty's of XVII century Sutur was the most prominent and most powerful Indian merchant in Russia. কিন্তু—

কিন্তু সুটুর কট্টর ব্যবসায়ী। শুধু টাকার কেন, যে কোন নেশায় নেশা বাড়ে। সুটুর যেন টাকা রোজগারের নেশায় কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একদিন হলো কি—

সুটুর শেমাখাগামী (পারস্য) এক কাফিলার (ক্যারাভান) সঙ্গে চলেছে। পারস্যের সীমান্তের চেকপোস্টে সুটুরের সামান তল্লাসী করতেই বেরিয়ে পড়ল চোরাই আফিং। জেল হলো সুটুরের। কোমরে দড়ি বেঁধে জেল গেটে যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ ছিল সুটুর। এবার জোব্বার পকেট থেকে বের করল জারের শীলমোহর আঁকা পাঞ্জা। সঙ্গে সঙ্গে আফিংটি বাজেয়াপ্ত করে এবং পরিমাণটা নোট

করে রেখে তাকে ছেড়ে দিল কাস্টমস অফিসার। রেকর্ডে লেখা আছে—
He was released due to the intervention of Czar.

রুশীয় সরকার ভারতীয় সওদাগরদের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করতো বলেই সুপ্রাচীনকালের মহান এই দুটো দেশের মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

আরও একবার। আস্ত্রাখানের রুশীয় গভর্নর বুঝি অশোভন ব্যবহার করেছিল সুটুরের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ সুটুর ভারতীয় সরাইখানার পধন (মালিক) এবং আরও বেনিয়াদের স্বাক্ষর নিয়ে একটা জয়েন্ট পিটিশান করেছিল জারের কাছে।

কয়েকদিন পরেই তার ফল পাওয়া গেল। জারের দপ্তর থেকে আস্ত্রাখানের গভর্নরের বদলির হুকুম এল।

ভারতীয় বণিকদের প্রতি রাশিয়ার সরকারী কর্তৃপক্ষের এই নিবিড় সহানুভূতির ফলেই উত্তর ভারত থেকে আরও দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করল। শুধু ভারত থেকেই নয়। সুটুর (সীতারাম কিংবা সাধুরাম) তথা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি এই সৌহার্দ্যের মনোভাবের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল রাশিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়ল পারস্যে। ছড়িয়ে পড়ল ইরাকে। ইস্পাহান তেহরান প্রভৃতি পারস্যের বিভিন্ন শহরের প্রবাসী প্রায় দশহাজার ভারতীয় বণিক চলে এসেছিল আস্ত্রাখানে (১৬)।

জনস্ট্রুইসের (John Struys) লেখা (আলোচ্য কালের প্রত্যক্ষদর্শী) থেকে জানা যায় আস্ত্রাখানে রাশিয়ার সীমান্তে ভারতীয়দের বিপুল সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত—

আস্ত্রাখানে ভারতীয়দের উপনিবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্ট্রুইস বলেছেন—At the end of the XVII century Astrakhan is a famous town for traffic frequented not only by all the regions of Tartary adjoining to the Caspian Sea but also by Persians Armenians and Indians. (১৭)

তারপরেই স্ট্রুইস জানিয়েছেন ভারতীয়রা প্রায় আশি টন ওজনের এক একটা জাহাজে করে ভারতের ভুবনবিখ্যাত মসলিন এবং রেশম রপ্তানী করতো ভল্‌গার উজানে পশ্চিমের দেশে। কিন্তু—(১৮)

আস্ত্রাখান প্রবাসী ভারতীয়দের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রসঙ্গে স্ট্রুইস বলেছেন

একটি ঘটনার কথা। সেই ঘটনা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি নাটকীয়। কিন্তু তার আগে স্ট্রুইসের পরিচয়টা বলা দরকার—

জন স্ট্রুইস ছিলেন একটি রুশীয় ব্যবসায়ী সংস্থার কর্মী। তিনি কাজ করতেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন বাটলারের অধীনে। স্ট্রুইস নিজেও ছিলেন বাটলারের স্বজাতীয়। এবারে সেই ঘটনার বিবরণ বাটলার এবং স্ট্রুইস যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি এখানে বলা হলো—

১৬৭০-৭১ সাল। ভল্‌গা কাস্পিয়ানের মোহানায় শান্ত, নিভৃত জনপদ আস্ত্রাখানের জীবনধারা নদীর মতই বয়ে চলেছিল। কোথাও কোন উত্তেজনা নেই, কোন সংঘর্ষ নেই, বিবাদ বিসংবাদ নেই। আর থাকবেই বা কেন?

আস্ত্রাখানে যে সর্ব ধর্মমতের মানুষের অবাধ অধিকার। এখানে যেমন আছে হিন্দুর শিব মন্দির, আছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির তেমনি আছে মুসলমানদের মসজিদ, খ্রীষ্টানদের গীর্জা। তাই পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসার কেপেল (Keppel, J.) লিখেছেন (১৯)—The natives of every country enjoy religious toleration here (Astrakhan). অতএব—

কারো সঙ্গে কারো মনোমালিন্য নেই। যে যার মতো যেমন অবাধে ধর্মচর্চা করছে তেমনি দোকান-পাট ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ মনের সুখেই দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু—

হঠাৎ একদিন জলে উঠল আগুন। মত্ত উল্লাসে সশস্ত্র কশাকরা ঝাড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আস্ত্রাখানে। নিমেষে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল। শুরু হলো লুঠতরাজ আর নির্বিচারে গণহত্যার তাণ্ডব। যেই হিন্দুদের ক্যারাভান সরাইতে আগুন ধরিয়ে দিল বিদ্রোহীরা তখন বাটলার আর আস্ত্রাখানে থাকা নিরাপদ মনে করল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের হুকুম ছাড়া আস্ত্রাখান ছেড়ে যাবে কি করে? জন স্ট্রুইসকে পাঠিয়ে দিল পারশ্যে, রাশিয়ার সীমান্ত শহর তাব্রিজে, শেমেখায়। সেখানকার ভারতীয় বেনিয়ারা যেই শুনল, আস্ত্রাখানে তাদের স্বজন পরিজনরা বিপন্ন এবং রুশীয় সরকারের কর্মী বাটলার সেখানে অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তখুনি তারা দলে দলে দ্রুতগামী কাফিলায় ছুটল আস্ত্রাখানে। বাদবাকী ঘটনাটা এবার বাটলারের জবানীতেই শুনুন—

আমি যখন আস্ত্রাখানে বিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অপেক্ষা করছি তখন সেখানকার

ভারতীয় বেনিয়াদের প্রায় একশোজনের একটা কোম্পানীর মুখপাত্র এবং সরাইখানায় পধন (ম্যানেজার) এসে বলল—নদীর (ভলগার) ঘাটে আমাদের কোম্পানীর বজরা অপেক্ষা করছে—শিগগির চলুন—

সে কী কেন? আপনারা যাবেন না?

—আপনি আমাদের মহামান্য জারের ব্যবসায়ী সংস্থার ম্যানেজার। সর্বাগ্রে আপনাকে বাঁচানো আমাদের কর্তব্য—বলেই তারা আমাকে নিয়ে ছুটল তাদের ধাও (Dhow) অর্থাৎ বজরায়।

ইণ্ডিয়ানদের এত বড় অতিকায় বাণিজ্য-জাহাজ আছে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। বজরায় এসে উঠলাম। ভলগার ঢেউ পাড়ি দিয়ে কাস্পিয়ানের দিকে চললাম আমরা। কিন্তু তাতেও রেহাই পেলাম না। বিদ্রোহীরা ছোট ছোট ছিপ নৌকোয় দ্রুত এসে ঘিরে ধরল আমাদের। বজরায় উঠে এসে প্রতিটি যাত্রীর টাকাপয়সা, সোনাদানা সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল। কেন যেন কাউকেই প্রাণে মারল না। হয়তো ধন দৌলত তারা এত পেয়েছিল যে মিছামিছি খুন জখম আর রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানার ভিতরে গেল না। তবে জাহাজটা তারা নিয়ে চলে গেল।

আমরা নিঃস্ব হয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভারতীয় বেনিয়ারাও ভাবছে, এখন কি করা যায়—আস্ত্রাখানে ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আবার ভলগার পাড় ধরে ধরে দক্ষিণে যাওয়াও একেবারেই অসম্ভব। এমন সময়—

এমন সময় দেখলাম,—দূরে—বহু দূরে আস্ত্রাখানের দিকের দিগন্তের কোল ঘেসে যেন কতগুলো ধূসর অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে! নদীর ওপার থেকে বয়ে আসা শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে একটা দূরাগত শব্দ ভেসে আসছে—ডিং-ডং-ডিং-ডং-ডিং-ডং—

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই সব ছায়াদেহ। একটা বিশাল কাফিলায় সওয়ার হয়ে কারা যেন অতি দ্রুত আমাদের দিকেই আসছে। প্রথম মনে হলো, হয়তো আর্মেনিয় কি কালমুক তাতারদের কাফিলা। হয়তো চলেছে জর্জিয়ার দিকে।

নাঃ। স্পষ্ট দেখলাম সবচেয়ে সম্মুখের স্তুরে (উট) বসে রয়েছে জনস্ট্রুইস। সে হাত নেড়ে আমাকে ইসারা করছে। আমার বুকের রক্তে কলধ্বনি-

বাজতে লাগল। স্ট্রুইজের সঙ্গে জাতভাইদের এবং রুশীয় সরকারের কর্মচারীকে (আমাকে) বাঁচাতে ছুটে আসছে শেমেখা এবং তাব্রিজের বিত্তশালী ভারতীয় বণিকরা।

আমি শুধু জারের 'এমপ্লয়ী' বলেই আমাকে তারা যে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা নয়, দশহাজার রুবলের একটা হ্যাণ্ডনোট বিনা বাক্যব্যয়ে লিখে দিয়েছিল—

পরিশেষে বাটলার মন্তব্য করেছেন কশাক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার ভিতরে দুটো ঐতিহাসিক সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—

(ক) তাব্রিজ, ইস্পাহান, শেমেখা তথা আস্ত্রাখানের ভারতীয় বণিকদের বিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি—They are in a flourishing condition.

(খ) জার তথা রাশিয়ার অধিবাসীদের প্রতি প্রবাসী ভারতীয়দের অপরিসীম সৌহার্দ্যের মনোভাব—They (Indians) are prepared to accept the word of an employee of the Czar of Moscovia as sufficient guarantee for a loan of money.

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে (২০) 'শ্লোকনাথ' নামে এক ভারতীয় সওদাগরকে আস্ত্রাখানের কিছুদূরে সারাটোভ বন্দর থেকে মস্কোতে ভারতীয় ও পারসিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে (২১) রুশী সরকারী প্রতিনিধি ভারতীয় বণিকদের ভল্গা এবং কাস্পিয়ান পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এগারোজন ভারতীয় বেনিয়া দেরবেন্দে রপ্তানী করেছিল ভারতের বহুমূল্য পণ্যসম্ভার। বিশেষ করে রামচাঁদ নামে এক গুজরাটি সওদাগর স্থানীয় কিছু তাতারকে নিয়োগ করেছিলেন এই মাল বহনের কাজে। রাশিয়ার মাটিতে সেই তিনশো বছর আগের ভারতীয় ব্যবসায়ী রামচাঁদ নাকি তিন দফায় বিপুল পণ্যসামগ্রী রপ্তানী করেছিলেন। (২২)

ভারতীয় পণ্যসম্ভারের ভেতরে মসলিন, রেশম, সুগন্ধী, মশলা, গাঁজের জটামাংসী ইত্যাদি ছাড়াও রুশীয় পণ্যও ছিল অনেক, যেমন শীলমাছের দাঁত, লোহার শিকল। লোহার তৈরী টুকিটাকি জিনিষ, সূচ, আয়না, উৎকৃষ্ট চামড়ার সুটকেশ আর চিনি আর কিছুটা ছিল অ্যাম্বার অর্থাৎ হলুদরঙের

তৈলাক্ত জীবাশ্ম।—এই রুশীয় পণ্যগুলো আসতো মস্কো থেকে। ভারতীয়দের পাঠাতো কে ?

ইতিহাসে এবং রুশীয় সরকারী দলিলে লিখছে—Russian goods sent to them from Moscow by their countrymen—অর্থাৎ মস্কোতে স্থায়ী বাসিন্দা ভারতীয়রা এই রুশীয় পণ্য কিনে নিয়ে রামচাঁদের মত উচ্চাভিলাষী বণিকদের বিক্রি করতো কিম্বা তাদের অংশীদার হয়ে থাকতো।

১৬৮১ (২৩) সালে দেখা যাচ্ছে—ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সেই দূর দেশে ক্রমশ সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা কিছু ম্যানুফ্যাকচারড' গুডস অর্থাৎ পারশিক রিফাইন উল ইত্যাদিও রপ্তানী করতে শুরু করেছে। চারজন ভারতীয় সওদাগরের একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান পাঁচটি মালবাহী বজরাও কিনে ফেলল। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটি পারস্যের বিভিন্ন শহরে সারা বছরে বাইশ দফায় বিভিন্ন ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে রুশীয় পণ্য রপ্তানী করল। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানে অংশীদারের সংখ্যা বেড়ে হয়ে গেল চোদ্দজন। দিনে দিনে এদের লাভের অঙ্ক ফুলে উঠতে লাগল, ফেঁপে উঠতে লাগল। রুশীয় সরকারী রেকর্ডে লিখল—1681—a very prosperous year for Indian merchants in Russia.

এইবার ভারতীয় সওদাগররা মহামান্য জারের কাছে এক আবেদনে জানালো বার্ষিক ১৮০০০ রুবল কর দিয়েছি তাই মহানুভব জারের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—রাশিয়ার সর্বত্র এবং বিশেষ করে মস্কোতে ব্যবসা করতে অনুমতি দেওয়া হোক—

কিন্তু রুশীয় সরকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি সৌহার্দ্যের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও এই আবেদন গ্রাহ্য করতে পারলেন না। কারণ ?

আর্মেনিয় এবং অন্যান্য প্রতিবেশী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ভারতীয় বেনিয়াদের ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্য ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। তারাও জারের দরবারে আবেদন করে জানালো ভারতীয়দের চেয়ে তারা বেশি ডিউটি দেয়। অতএব তারাও রাশিয়ার সর্বত্র ব্যবসা করার জন্য পারমিটের প্রার্থনা জানাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, রুশীয় সরকারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—ভারতীয়রা ক্রমশ রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের দোকান পসার এবং গুদাম ঘর তৈরী করছে। পারস্যের এবং ভারতীয় পণ্যের ওপরে অত্যন্ত চড়া দাম হেঁকে সমগ্র মধ্যএশিয়ার আপনাদের (রুশীয়) বাজার খারাপ করে দিচ্ছে।

মহামান্য জার আর্মেনিয়দের এই আবেদনের উত্তরে যা জানিয়েছিলেন তার ভেতরে সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ-ভারত সখ্যতা যে যথেষ্ট-ই গভীর ছিল তার আভাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জার লিখেছিলেন—They (Indians) are also paying duties to the Exchequer and did not jeopardise Russian economic interest in any way.

১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (২৪) আস্ত্রাখানের নিম্নলিখিত ভারতীয় ব্যবসায়ীকে পারস্যে পণ্য রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—

১) বীরবল

২) গিরি মুল্লা

৩) মিণু গারাচক

১৬৮০ সালে (২৫) এদের পারস্যে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—

১) মিত্র কাপুরচাঁদ

২) দোলা বাগ

৩) বীরবল

৪) কাপুর চাঁদ

৫) বদলা মাধব

৬) গোর্দান বালুইকা

৭) মুল্লা

৮) আড়িয়া

৯) বালা

১০) মুলচান

১১) লালা কাপুরচাঁদ

১২) জির

১৩) মিত্র কাপুরচাঁদ

১৪) পোট্যাইকা

ব্যবসায়ীদের এই তালিকায় বার বার পারস্যের উল্লেখের ভিতরে আছে একটি ঐতিহাসিক সত্য—সে-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। তার আগে যারা শত শতাব্দী পূর্বে সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার মাটিতে এই দুটো প্রাচীনদেশের মৈত্রীর একটু একটু করে পুষ্ট করে তুলেছিল, দৃঢ় করে তুলেছিল আমাদের সেই

পূর্বসূরীদের নামগুলো উল্লেখ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে (২৬) নিম্নবর্ণিত ভারতীয় ব্যাপারীদের পারস্যে পণ্য রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—

১) লালা কাপুরচাঁদ
২) দুর্গালাল
৩) উলু মালচক্র
৪) দুর্গা আলতোন
৫) বালাজান (ক)
৬) মালচাঁদ
৭) কানগর (ক)
৮) বীরবল
৯) রামচাঁদ
*১০) বাদা মাধায়েভ
১১) বাদা
১২) বালাজান (খ)
১৩) কানগর (খ)
১৪) গির
*১৫) দুর্গা আলটভ
*১৬) মাদা স্যাটুয়েভ
১৭) বাদলা মাদায়েভ
*১৮) মুল্লা চ্যালিয়েভ

১৬৮৭ (২৭) খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত ভারতীয় বণিকদের ন্যায্য পরিমাণ কর দিয়ে আস্ত্রাখান থেকে দেরবেন্টে (ইউরোপীয় সোভিয়েতের দক্ষিণ পূর্বের বড় ব্যবসাকেন্দ্র) তাদের পণ্য রপ্তানী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—

১। লালা মাজি (আস্ত্রাখান)
২। জান বাম— ”
৩। গোর্দান— ”

৪। লাল মাল্লি (২) (আস্ত্রাখান)

যাদের পারস্যে পণ্যসামগ্রী পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—

১। ভগৎ আনবুরাম্

*২। চেহুস্কি সাভায়েত (সচ্চিদানন্দ সহদেব)

৩। মুল্লা রূদায়েভ

৪। লালা মাল্লি (১)

৫। জলদা

১৬৮৮ (২৮) খ্রীষ্টাব্দে নিম্নবর্ণিত রুশী সওদাগররা ভারতীয়দের কাছে থেকে ভারতীয় এবং পারসিক পণ্য কিনে নিয়ে মস্কোয় রপ্তানী করেছিল—

১। মিকাইলভ

২। ইয়াকভলেভ

৩। স্টিফানভ

৪। পুশনিকভ

* তারকাচিহ্নিত নামগুলোতে রুশীয় নামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘদিন রাশিয়ায় বাস করলে কেমন করে ভারতীয় নাম রুশীয় নামে রূপান্তরিত হয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৭৪১ সালের আস্ত্রাখানের একটি সরকারী দলিলে। আটজন ভারতীয় সন্ন্যাসী আস্ত্রাখান থেকে স্বদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তাদের রুশীয় প্রভাবিত এবং ভারতীয় নাম পাশাপাশি দেয়া হলো—

১) ব্যাগভান পৌরী—ভগবান পুরী

২) উড্যাসী বৈভ্যাসভ—উদাসী বাবা

৩) জিওগী সেরান্যাটভ—যোগী সারনাথ

৪) ডায়ালভ্যাস বৈর্যাভসি—দয়ালদাস বৈরাগী

৫) গিয়ালদাসা বিরাকী—গয়ালদাস বৈরাগী

৬) বালটুরা স্যানেটসী—পল্টুরাম সন্ন্যাসী

৭) বাগ্ডাজ্যান জিরা সেনাসিয়া—ভুজঙ্গীরাম সন্ন্যাসী

৮) টিসেনদাস বিরাকী—কিষণদাস বৈরাগী

১৬৮৯, ১৬৯০ এবং ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে (২৯) নিম্নলিখিত রুশী ব্যাপারীরা ভারতীয়দের কাছে মাল কিনে প্যরশ্যে পাটিয়েছিল—

আর্তেমিয়ভ—Artemyov

ফিডোরভ—Fedorv

প্রোকোফিয়েভ—Prokofyev

কোলপ্যাশনিকভ—Kolpashnikov

অ্যান্টিপিন—Antipin

এস, ম্যালেনকিয়ভ—S. Maleinkeov

(ভারতীয়দের এজেন্ট)—(Agent of Indion Merchants)

এখন ভারতীয়দের প্রতিনিধি সীতারামের নালিশে জার কেন এত সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেছিলেন এবং কেন দেরবেণ্টে পারশ্যে তাদের বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন সেই আলোচনায় অগ্রসর হাওয়া যাক—

সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শুধু আস্ত্রাখানে নয়, মধ্য ভল্গা-কাস্পিয়ানের সন্নিহিত বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রের ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। সমসাময়িক কালের পর্যটক চার্ডিন (Chardin) এবং ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায়—ইস্পাহান, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, (পারশ্য), হামাদান (পারশ্য), সেমাখা (পারশ্য), আস্ত্রাখান প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টরা লগ্নী কারবার করতো, অত্যন্ত বেশি হারের সুদে নগদ টাকা ধার দিত—মোট কথা ব্যাঙ্কারের কাজ করতো। প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোকে তারাই সুদৃঢ় করেছিল। তাই জার তথা রুশীয় কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন, ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টরা বিরূপ হলে বিদেশী ভারতীয় মুদ্রার আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

আর আস্ত্রাখানের রেকর্ডে বার বার পারশ্যের উল্লেখের কারণ হলো—ভারতীয় ব্যাপারীরা শুধু 'ইণ্ডিয়ান গুডস আমদানী করেই খুশী হতো না। পারশ্যের এবং রাশিয়ার অনেক শহরের পণ্যসামগ্রীর হোলসেল ডিলার হয়ে উঠেছিল। সমগ্র পারশ্যে একদেটিয়া ব্যবসা শুরু করেছিল।

স্মরণাতীত কাল থেকে বৈশ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীরাই সমাজে সম্মানিত হয়ে এসেছে—আজও সেই ট্রাডিশন চলছে। ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়,

আজ থেকে তিনশো বছর আগে অতদূর দেশে গিয়ে ভারতীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধু রুশীয়দের উদারতার জন্যেই। Russian-Indian Relations of XVII Century—বইটিতেই ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট তথা ভারতের প্রতি রুশীয় সরকারের শ্রদ্ধা, গভীর বিশ্বাস, সর্বোপরি আন্তরিক সৌহার্দ্য এবং বন্ধুত্বের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

১৬৯৫ সালে (৩০) রুশীয় সম্রাট ভারতের বাদশাহ আলমগীর অর্থাৎ আউরঙ্গজেবকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন—

আমার প্রতিনিধি এস, ম্যালিনকিয়েভ কাবুল হয়ে ভারতে যাবেন। তিনি ভারতে এবং আফগানিস্থানে রুশীয় পণ্যের বাজার পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন। আশা করি এবং বিশ্বাস করি শ্রীম্যালিনকিয়েভ হিন্দুস্থানের সর্বত্র সহযোগিতা পাবেন।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (৩১) দিল্লীর বাদশাহী মসনদের দপ্তর থেকে সম্রাটের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত চিঠি গিয়েছিল জারের কাছে—

আপনার চিঠি পেয়ে পরমপ্রীতি লাভ করেছি। শ্রীম্যালিনকিয়েভকে শুধু যে হিন্দুস্থানে আসার অনুমতি দিচ্ছি তা নয়—তিনি এদেশের সর্বত্র নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন। এই সূত্রে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি—রুশীয় সওদাগরা ভারতে অবাধে এবং বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে—

পরিশেষে বলবো, আস্ত্রাখানের হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান, নানাবিধ ধর্মীয় সংস্কার বজায় রাখার জন্য রুশীয় সরকার তথা জনসাধারণ কত যত্নশীল ছিলেন তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই ঘটনা থেকে—

১৬৮৩ সাল। আস্ত্রাখানের কোন সরাইখানার মালিক এক হিন্দু ব্যবসায়ী মারা গেল। তার স্বজাতীয়রা মরদেহকে দাহ করার অনুমতি চাইল আস্ত্রাখানের স্থানীয় শাসকের কাছে। তিনি মস্কোতে জারের কাছে তাদের আর্জি পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসে গেল—Indians living in Astrakhan are permitted to burn the bodies of the dead...

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা

(১) Proceedings of Indian History Congress
21st Session. Mysore. 1966 — ৪৬০

(২) Russko-Indiyskic otenosnkniya. Goldbery
N. M., As mentioned in Proceedings of Indian
History Congress. 21st Seassion. Mysore 1966 — ৪৬১

(৩) Travels into Moscow. Persia and Diver Parts
of East India. De Bruin cornelis. As mentioned
in P. M. Kemps Bharat-Russ. — ৭৩-৯৪

(৪) Proceeding of Indian History Congress.
21st session. Mysore. 1966 — ৪৬২-৬৩

(৫) Travels in Persia. Chardin, John. — ২৮০

(৬) Russian-India Relations XVII Century
Moscow Peoples Publising house — বিবিধ

(৭) Voyages and Travels of John Struys through
Italy Greece. Moscow. John Struys — ৩০২

(৮-১৬) Same as — ৬

(১৭) Ibid (৭) পৃ: — ১৭৭

(১৮) Narrative of taking Astrakhan by the
Cossacks—sent From Capt. D. Butler. Butler. — ৩৬৪-৭৮

(১৯) Personal Narrative of Journey From
India to England. Novogorod,
Moscow. G. Keppel — ২৬৩

(২০-৩১) Russian-Indian Relations XVII Century
Peoples. Publishing House Moscow — বিবিধ

চোদ্দ

রুশ-ভারত মৈত্রী—অষ্টাদশ শতাব্দী

এল অষ্টাদশ শতাব্দী।

এই শতকে রুশ-ভারত মৈত্রী বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। জোনাস হ্যানওয়ে (Jonas Hanway) আলোচ্য শতাব্দীর প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার সূত্রেই গিয়েছিলেন কাস্পিয়ানের দেশ—পারশ্যে। পারশ্য থেকে বুখারো এবং আস্ত্রাখানেও ব্যবসা করতে গিয়ে দেখেছেন—রুশীয় এলাকায় অনুকূল বাতাবরনে ভারতীয় সওদাগররা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং অনেকে স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য রাশিয়ার বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র আস্ত্রাখানে বিগত শতকের ভারতীয় বেনিয়াদের কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্য আগেও বলা হয়েছে। এবার হ্যানওয়ে ভ্রমণ বিবরণীতে রুশ-ভারত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক তথ্যগুলো এখানে বলা হলো।

বিগত শতকের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয় বেনিয়া পারশ্যের তাব্রিজে, মেসেদে, ইস্পাহান থেকে রুশীয় সীমানায় আস্ত্রাবাদে, আস্ত্রাখানে এবং বুখারায় ছড়িয়ে পড়েছিল আলোচ্য শতকে। পারশ্যের তথা রাশিয়ার দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার সার্থবাহদের আকর্ষণের কারণ হিসেবে হ্যানওয়ে জানিয়েছেন—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারশ্যের নৃপতি ছিলেন নাদিরশাহ। তিনি যুদ্ধ সঙ্ঘর্ষ (রাজ্যবিস্তার এবং বিদ্রোহদমনকে) ইত্যাদি সূত্রে প্রায়ই ভারতে থাকতেন। সাম্রাজ্যের দায়িত্ব ছিল তাঁর পুত্র—রিজা কাউলি মীর্জার ওপরে।

কাউলি মীর্জা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক। তিনি দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্যিক সখ্যতাস্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী। হ্যানওয়ের পূর্ববর্তী দুই ইংরেজ ব্যবসায়ী এলটন (Elton) এবং ক্র্যায়িম (Craeme) কে মীর্জা পারশ্যে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করে নিম্নলিখিত সনদ প্রচার করেছিলেন— (১)

Honble English merchants are hereby allowed to land their goods with all freedom in any of our ports of Caspian and from thence to carry them to any market of our empire, particularly to our Province KHORASAN, HERAT, BALAKH, BADDUKSAHN, CABUL, COSSIN and to the empire of INDIA.

এসব অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা (১৭২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেখল, তাদের পণ্য পারস্যের বেনিয়ারা ছাড়াও কিনবে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সেই আকর্ষনেই তারা শালগ্রাম শিলা (গৃহ বিগ্রহ), পুরোহিত, সামান্ত কিছু পুঁজি এবং গাঙ্গেয় মৃত্তিকার সুদৃশ্য পণ্যসম্ভার নিয়ে পারস্যে পাড়ি জমিয়েছিল। পারস্যের রাজধানী মেসেদে (নাদির শাহ এখানে তাঁর নূতন রাজধানী তৈরী করেছিলেন) শেমেখায়, বাদাখশানে এবং বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে ভাগ্যান্বেষী ভারতীয় বেনিয়ারা স্থায়ী উপনিবেশও করেছিলেন। আর পারস্যের এইসব বাণিজ্যকেন্দ্রে-ই যে রুশীয় সওদাগরদের সঙ্গে ভারতীয় বেনিয়াদের ব্যবসায়িক লেনদেন চলতো তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে হ্যানওয়ের জবানী (২) থেকে—

—পারস্যের উত্তরাঞ্চলে উৎকৃষ্ট রেশম বা সিল্ক পাওয়া যেত স্মরণাতীত কাল থেকে। যেমন অতি উৎকৃষ্ট—তেমনি বিপুল তার পরিমাণ। এই উত্তরাঞ্চল থেকে পারস্যের দক্ষিণে মেসেদের বিভিন্ন রেশমের ফ্যাক্টরীতে এবং তুরস্কে চলে যেত সিল্ক।

বেস্ট কোয়ালিটি এবং বিপুল পরিমাণে রেশমের উৎপাদন হতো পারস্যের জিলান প্রদেশে। জিলানের প্রধান দুটো শহর হলো রাসির এবং শিরভান। রাজধানী—শেমেখায়। শেমেখার কাছে বাণিজ্যকেন্দ্র গাঞ্জা।

রাসির ও শিরভান কাস্পিয়ানের দক্ষিণ পশ্চিম তীরে এবং গাঞ্জা তার কাছাকাছি। রেশমের জন্ত বিখ্যাত এই শহরগুলোর ঠিক মাঝখানে পারস্যের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র মেসেদ। নাদির শাহের খুব প্রিয় শহর এবং তিনি মেসেদকে রাজধানীও করেছিলেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ও রাজনৈতিক দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল মেসেদের।

শুধু তাই নয়—নাদির শাহ যখন ভারত অভিযানের সূত্রে দিল্লীতে (১৭৩৯ খ্রীঃ) তখন কাউলি মীর্জা এইখানেই করেছিলেন তাঁর বাসস্থান এবং বিদেশী ও দেশীয় সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্তেই তিনি তার দেশের

সীমান্ত ওয়াদ্রাহান শহর থেকে তুর্কমেন উজবেক তাতারদের করেছিলেন বিতাড়িত। মেসেদকে কেন্দ্র করে দেশীবিদেশী বেনিয়ারা নিরুদ্বেগে এবং অবাধে বাণিজ্য করতে শুরু করল।

* আমার পূর্ববর্তী ইংরেজ সওদাগরদের মত (Elton এবং Craeme) আমরাও (হ্যানওয়ে ও ডিঙ্গলি Dingley) মেসেদকেই করেছিলাম অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র।

শুধু মেসেদের চারিদিকের শহরে অপর্যাপ্ত রেশম ও পশম পাওয়া যায় বলেই নয়। আমরা দেখলাম—মেসেদ থেকে আমরা তাতার অধ্যুষিত অঞ্চলে ইউরোপীয় পণ্যের এবং পারশিক রেশম ও পশমের বিপুল চাহিদা মেটাতে পারি।

মেসেদের উত্তর-পূর্বে বুখারায় বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল। জায়গায় জায়গায় মরু-দ্যানের স্নিগ্ধ ছায়াভাসের ভেতরে বিপুল বসতিপূর্ণ বহু বড় বড় শহর। আবার যেখানে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে দিগন্তপ্রসারী বন্ধ্যা প্রান্তর। সেখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে। ঘোড়া আর উটের ব্যবসা তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাদের ভেতরে পারশিক এবং ইউরোপীয় পণ্যের বিপুল চাহিদা। তাই মেসেদে-ই আমরা ছিলাম। স্বচোখে দেখেছি—

পণ্যবাহী কাফিলা (ক্যারাভান) আসছে পারস্যের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শহর থেকে, আসছে কাবুল থেকে, কান্দাহার থেকে। মূলত পারসিক রেশমের আকর্ষণেই কাফিলা আসছে ভারতের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। আর বুখারা থেকে আসত রুশীয় পণ্য। মেসেদে রুশীয় বেনিয়াদেরও ভারতীয় সওদাগরদের মতই স্থায়ী উপনিবেশ ছিল। মেসেদ ছিল রুশ-ভারত-এই দুই দেশের সওদাগরদের মিলনকেন্দ্র প্রতি বছর রাশিয়া তথা বুখারা থেকে ১৩০০ উটের এক বিশাল কাফিলা আসতো মেসেদে।

এবার এই শতাব্দীর আর এক ভ্রমণকারীর (কাস্পিয়ানের দেশে) ভ্রমণ-বিবরণীতে ভারত-রুশ মৈত্রীর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক—

এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য বৃটিশ ব্যবসায়ী জোনাস হ্যানওয়ে (Jonas Hanway) রাণী এলিজাবেথের নির্দেশে যেমন রাশিয়া হয়ে পারস্যে এসেছিলেন (১৭৭৩-৭৫) তেমনি প্রায় তাঁর সমসাময়িককালে (১৭৯৩-৯৪) দক্ষিণ রাশিয়ায় বা কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন জার্মান ভ্রমণকারী

* প্রত্যক্ষদর্শী হ্যানওয়ের বিবরণ থেকে।

পাল্লাস, পি, এস (Pallas P. S)।

ভল্গা-কাস্পিয়ানের মোহানায় সুপ্রাচীনকালের ব্যবসাকেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তথা রাশিয়ার সওদাগরদের মিলনকেন্দ্র (meeting Place) আস্ত্রাখান প্রসঙ্গে হ্যানওয়ে জানিয়েছেন, এখানে অনেক ভারতীয় সওদাগরের নিবাস আছে (৩)

Astrakhan Contains about 70,000 inhabitants among whom are many ARMENIANS, TATARS and INDIANS—

হ্যানওয়ের একুশ বছর পরে পালাস এসেছেন আস্ত্রাখানের সেই হিন্দু মহল্লায়—তিনি কি দেখেছিলেন তাঁর বৃত্তান্ত তাঁর জবাণীতেই এখানে বলা হলো (৪)

আস্ত্রাখানের ভারতীয় বণিকদের মহল্লায় দেওয়ালীর উৎসব শুরু হয়েছে। কাঠের বাড়িগুলোর ছাদে ছাদে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। দূর থেকে মনে হয় যেন, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে সারি সারি কতগুলো আগুনের ফুলে ফুটে রয়েছে।

ভল্গার সাগরসঙ্গমের সেই জনপদের আলোকসজ্জা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বহু-বহুদূরের জন্মভূমির সেই স্নেহ-মায়া-মমতা ঘেরা মধুর গৃহাঙ্গনের কথা। মনে পড়ে যায় রাশি রাশি তারায় ভরা ওই একই আকাশটার নীচে তাদেরও গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলছে প্রদীপ। চলছে দেওয়ালীর বিপুল সমারোহ। তাদেরও মনটা ভারী—খুব ভারী হয়ে ওঠে। আর এই উৎসবের রাত্রে স্বজন পরিজনকে ছেড়ে দূরে থাকার বেদনাটাকে ভুলে থাকার জন্যই যেন আরও বেশি করে মত্ত হয়ে উঠেছে গাঙ্গেয়ভূমির সওদাগরেরা।

বেনিয়াদের পঞ্চায়েত প্রধান 'পধন' একটি বিশাল হাঁড়ি নিয়ে বসেছে। তাকে চক্রাকারে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে বেশ বড়ো আকারের গ্লাস।

—আমাকে—আমাকে—

—আমি সেই কখন থেকে গ্লাস ধরে দাঁড়িয়ে আছি—

দিচ্ছি তোরে বাপু—একটু সবুর করো, একটা তো হাত—পধন খিঁচিয়ে ওঠে।

হাঁড়িতে কি আছে—কি এমন লোভনীয় সেই বস্তুটি যার জন্য এমন কাড়া-কাড়ি পড়ে গিয়েছে?

সিদ্ধির শরবত!

যারা দু-তিন গ্লাস খেয়েছে তারা অকারণেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

দেওয়ালীর এই রাত্রে ভারতীয় সওদাগররা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বণিকদের নিমন্ত্রণ করে। অতএব রুশীয়, আর্মেনিয় ইরাণীদের মহল্লা ভেঙ্গে এসেছে শত শত দর্শক। তারা ভারতীয়দের সেই আলোঝলমল এক একটা বাড়ি আর তাদের সেই হাস্যোজ্জল সুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যায়।

আপনারাও একটু খেয়ে দেখুন না সিদ্ধি, পধনের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেউ কেউ খায়। আর কিছুক্ষণ পরেই তাদের চোখে নেশার ঘোর লাগে। তারাও ভারতীয় ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসতে হাসতে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

রুশী-ইরাণী আর ভারতীয় বণিকদের সেই সমবেত কণ্ঠের হাসির ঝড়কেও ছাপিয়ে শোনা যায় তাতার সঙ্গীতের উচ্চকিত সুর—

অদূরে ফাঁকা মাঠে বিচিত্র বাজনা বাজিয়ে নেচে নেচে কোরাস গাইছে কালমুখ তাতারদের গাইয়ের দল; তাদের গান বাজনাও শুনছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা।

আসুন—আসুন—যার যা মনের বাসনা পূর্ণ হবে, হতে বাধ্য, নানাবর্ণের পাজামা, আর চোগাপরা এক নোগাহ তাতার যাদুকর তারস্বরে চিৎকার করে বলছে—এই টুপিটা একবার পরলেই আপনি যা চাইছেন তাই পেয়ে যাবেন—

ভেড়ার চামড়ার পাড দিয়ে তৈরী চারকোণা টুপীটা আর সেই যাদুকরের খুদে খুদে দুটো উজ্জল চোখের দিকে তাকিয়ে কারো কারো মনে হয়—হয়তো সত্যিই এই টুপীটা পরলে মনস্কামনা—

এইবার সবাই বসে পড়ুন—হেঁকে বলল পধন। তার পিছনে চার পাঁচজন ক্রীতদাসের হাতে পিতলের বড় বড় পরাতে গোলাপজল ছড়ানো নানাবিধ শুকনো মিঠাই, আর ঘিয়ে ভাজা হিং দেওয়া পিঠে।

বসে পড়ুন—ভাই—একটু করে মিষ্টি মুখ করে যেতে হয় দেওয়ালীর দিনে পধন বক্তৃতার মত ভঙ্গীতে, বলে আমাদের দেশের এই নিয়ম—

নিমন্ত্রিতরা হুল্লোড় করে বসে পড়ে। আর বিভিন্ন ভাষায় তাদের টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে উল্লসিত হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে আস্ত্রাখানের হিন্দু-বেনিয়া পল্লী।

এসব ১৭২৩ সালের কথা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ভল্লাতীরের সেই জনপদ-জীবনের বিচিত্র কলরোলের ভেতরেই রুশ-ভারত মৈত্রীর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—এই উক্তি নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত নয়। আর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকেও কারো, আশা করি, দূর বিসর্পিল কল্পনা বলে মনে হবে না, তার কারণ সরকারী নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আস্ত্রাখান ছাড়িয়ে রাশিয়ার ভেতরে আসতে দেওয়া হতো না। ভল্লা আর কাস্পিয়ানের মোহানার এই জনপদ ছিল ভারতীয়দের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের শেষ সীমানা। তাই আস্ত্রাখানে গড়ে উঠেছিল তাদের এক বিশাল স্থায়ী উপনিবেশ।

কিন্তু হ্যানওয়ে এবং পালাস স্পষ্ট করেই বলেছেন, আর্মেনিয় এবং হিন্দু বনিকেরা চতুর সুদক্ষ এবং উচ্চাকাঙ্খী ব্যবসায়ী। তাই আস্ত্রাখানেই সীমানায় আবদ্ধ হয়ে থেকে সামান্য মূলধন নিয়ে বিকিকিনি করে কিম্বা ইরাণী বা তাতার সওদাগরদের এজেন্ট হয়েই খুশি থাকতে পারল না। কেমন করে থাকবে ?

কেউ এসেছে মূলতান থেকে, এসেছে গুজরাট থেকে কিম্বা দিল্লী ও লাহোর থেকে। দূরদুর্গম দেশে ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে লাল শালু দিয়ে জড়ানো নারায়ণ শিলা আর পূজারী ব্রাহ্মণ। এই ধর্ম্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা আর একাগ্রতার জন্যই যেন দিনে দিনে স্ফীত হয়ে উঠল তাদের ব্যবসা। তাই অনিবার্য কারণেই ইরাণী, আর্মেনিয় তাতার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। আর যথানিয়মে তাদের মামলা গিয়ে উঠল রাশিয়ার বিভিন্ন আদালতে। তাই সরকারী নথিপত্রে ভারতীয় বণিকদের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শুধু সংঘর্ষ, বিবাদ, মনোমালিন্য নয়, হিন্দু সওদাগরদের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক প্রসারতারও খবর পাওয়া যায় সেই রেকর্ডে। আর বলাইবাহুল্য রাশিয়ার সরকারী কর্তৃপক্ষ তথা জারের সহৃদয় উদারতায় ভারতীয় সওদাগর-দের ব্যবসা যে একটু করে সমৃদ্ধ হয়েছিল তারও আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠবে সেই দলিলে।

২৬শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৭২০ (৫)

একসময় আস্ত্রাখান পর্যন্ত ভারতীয়দের গতিবিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তাই একদল হিন্দু ব্যবসায়ী মহামান্য জারের কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন তাদের এবং তাদের এজেন্টদের মস্কো এবং পিটার্সবার্গে, ব্যবসাসূত্রে যেতে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত তারিখেই আস্ত্রাখানে জারের প্রতিনিধি তথা পররাষ্ট্র পর্ষদ (Board of foreign Affairs) দরখাস্তকারী ভারতীয়দের মুখপাত্র, মাটু এবং বলরামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা মস্কো হয়ে পিটার্স'বার্গে যেতে পারেন।

১০ই মার্চ, ১৭৬২ সাল (৬)

বুখারার রুশীয় শাসনকর্তা এলোরিও বেনেভেনিও (Elorio Beneveni) জানাচ্ছেন, কিয়েভে এবং বুখারায় এসে পৌঁছেছে আস্ত্রাখানের একদল ব্যবসায়ী। তাদের এই বিশাল কাফিলায় (Caravan) রকমারি এবং রমণীয় ভারতীয় পণ্য বহন করে নিয়ে এসেছে। গ্যাঞ্জেটিক মসলিনের (Gangetic Muslin) সঙ্গে তারা রুশীয় সেই কালো পশম, চামড়া, তলোয়ার আরও বহুবিধ জিনিস নিয়ে এসেছে।

৭ই জানুয়ারি ১৭২৩ (৭)

আস্ত্রাখানের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চোখে স্বপ্ন নেমেছিল, শুধু আস্ত্রাখানের এলাকা নয়, মধ্যপ্রাচ্য নয়, ইউরোপের দেশ দেশান্তরে এবং দুর্গম সাইবেরিয়া অঞ্চলে ও চীনে তাদের ব্যবসাকে প্রসারিত করে দেবে।

আনবুরাম মুলিন (হয়তো আত্মারাম) এবং তাঁর সহকর্মীরা জার প্রথম পিটার আলেক্সি মিহাইলোভিচের (Aleksy Mihailovich) কাছে এক আবেদন করেছিলেন। সেই দরখাস্তের মূল বক্তব্য ছিল—

মস্কো এবং নভোগোরোদে ব্যবসা করতে যেতে দিতে হবে তাদের। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার উত্তরে শ্বেতসাগরের তীরবর্তী বন্দর আর্চেঞ্জেলেও (Archangel) ব্যবসা করার অনুমতি প্রার্থনা করে সবিনয়ে জানিয়েছে যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহলে ভারতীয় পারসিক ও রুশীয় তথ্য প্রাচ্য দেশীয় বিভিন্ন পণ্যের বাজারকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবে।

আনবুরামের এই অভিনব এবং উচ্চাকাঙ্খী প্রচেষ্টা প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী দপ্তর থেকে কি উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আনবুরাম তথা ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসাকে বিস্তীর্ণ করার এই মহৎ বাসনার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক সত্য—হিমশীতল আর তুষারাচ্ছন্ন সেই উত্তর সাগরের অজানা এবং দুর্গম দেশে যাওয়ার দুঃসাহসিকতা যেমন ছিল তাদের

তেমনি ছিল ব্যবসায় লগ্নী করার মত 'Considerable Resource অর্থাৎ পরিমিত মূলধন।

জার ভারতীয় সওদাগরদের এই সমৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক দক্ষতা যে উপলব্ধি করেছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে রেকর্ডে।

১৭২১-২২ সালে (আনবুরামের দরখাস্তের বছরখানেক আগে) জার যখন এসেছিলেন আস্ত্রাখান পরিদর্শন করতে তখনি সম্পত্তিপন্ন এবং ভারতীয় বণিকদের মুখপাত্র আনবুরামের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করেছিলেন—গাঙ্গেয় উপত্যকার পণ্য সরাসরি রাশিয়ার সীমানায় রুশীয় ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতে পারে কিনা।

আনবুরাম আস্ত্রাখান তথা দক্ষিণ কাস্পিয়ানের উপত্যকা থেকে হিন্দুস্থানের যাওয়ার পথের বিবরণ দিয়ে জানিয়েছিল যে, ভারতীয় মহার্ঘ্য পণ্য মসলিন এবং রেশম বস্ত্র তাদের ইরানী বা আর্মেনিয় সওদাগরদের কাছে কিনতে হয় বলেই বেশী দামে বিক্রি করতে হয়।

জার হয়তো পরিকল্পনা করেছিলেন দক্ষিণ কাস্পিয়ানের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাকেন্দ্র আস্ত্রাখানকে ঘাঁটি করে সমগ্র মধ্যএশিয়া এবং ভারতে রাশিয়ার বাজার তৈরী করা যায় কিনা।

জারের সঙ্গে প্রতিনিধিস্থানীয় হিন্দুস্থানী সওদাগর আনবুরামের এই আলোচনার কি ফলাফল হয়েছিল জানা যায় নি।

৫ই ডিসেম্বর, ১৭২৩ (৮)

ভারতীয় সওদাগরদের সম্বন্ধে জারের যে গভীর সহানুভূতি এবং তাদের বাণিজ্যিক পটুত্বের জন্য কিছুটা শ্রদ্ধাও পোষণ করতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে নিম্নবর্ণিত ঘটনার ভেতরে।

জার উপরোক্ত তারিখে ভাইস অ্যাডমিরাল উইলস্টারকে (Vice Admiral wilster) রাশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে এক বাণিজ্যিক চুক্তি করার জন্য হিন্দুস্থানে পাঠিয়েছিলেন।

১৭২৫ সাল (৯)

আস্ত্রাখান পাবলিক নোটারি অফিসের লেজারে দেখা যাচ্ছে, রুশীয় সরকার ভারতীয় সওদাগরদের তাদের ব্যবসায় লগ্নী করার জন্য টাকা ধার দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে মজুর খাটানোর জন্য কিছু তাতার শ্রমিককে

নিয়োগ করার অনুমতি দিয়েছেন সানন্দে।

১৫ই মার্চ, ১৭২৬ সাল (১০)

১৫ই মার্চ থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের ভেতরে খোদ মস্কোর এক বেনিয়া ইরোফেরিয়েভ এবং হিন্দুস্থানের সওদাগর তিরামের এক বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছিল। ভারতীয়রা যে দূর বিদেশের মাটিতে গিয়ে ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং অর্জন করেছিল রুশীয় ব্যবসায়ীদের শ্রদ্ধা—তার স্বাক্ষর বহন করছে আস্ত্রাখান পাবলিক নোটারী অফিসের এই লেজার।

২৪শে মার্চ—৩১শে ডিসেম্বর ১৭২৬ সাল (১১)

রুশীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বেনিয়াদের ব্যবসাকে প্রসারিত করে দিতে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে আস্ত্রাখানের লেজারে। ক্রিমিয়ার তাতার এবং কালমুক তাতার এবং আস্ত্রাখানের অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ইরানী আর্মেনিয়, কাজাকী) বেনিয়াদের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অনুমতি দিয়েছিলেন ভারতীয় সওদাগরদের।

জুন মাস, ১৭২৬ সাল (১২)

হিন্দুস্থানের সওদাগরদের প্রতি রুশীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির আরও নজীর রয়েছে। আস্ত্রাখানের গভর্ণর মেংডেন (Mengden) সিনেটে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—আস্ত্রাখানের বুখারিয়, আর্মেনিয় বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় বেনিয়াদেরও কিয়েভ এবং বুখারায় গিয়ে ব্যবসা করার সম্মতি দিয়েছেন—

১৫ই জানুয়ারী ১৭২৭, ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ২২শে জুন, ১৭২৭ (১৩)

আস্ত্রাখানের সরকারী দপ্তরের কাগজপত্রের উপরোক্ত তারিখগুলোতে ভারতীয় বণিকদের ঋণ দান, এবং আরো নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার আভাস রয়েছে। বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১৭ই জুলাই, ১৭৩০ (১৪)

স্মরণাতীতকাল থেকে ভল্গার ভাটিতে নিজনি নভোগোরোদের আন্তর্জাতিক মেলার খুব খ্যাতি ছিল। জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইত্যাদি ইওরোপের দেশগুলো থেকে শুরু করে মধ্যএশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই বেনিয়ারা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে যেত সেই মেলায়। নভোগোরোদের মেলায় কাস্টম অফিসার ম্যাকারিয়েভো (Makaryevo) জনৈক হিন্দুস্থানী বেনিয়া

নেবাগুকে আস্ত্রাখান থেকে নভোগোরোদের মেলায় তার পণ্য নিয়ে যেতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

২৯শে এপ্রিল ১৭৩১ সাল (১৫)

নেবাগুর মতই আর এক ভারতীয় বেনিয়া রামচাঁদ আস্ত্রাখান থেকে কিয়েভ এবং বুখারায় তার বিচিত্র পণ্যসম্ভার রপ্তানী যে করেছে তার রেকর্ড আছে আস্ত্রাখানের সরকারি দপ্তরে।

শুধু ব্যবসা, ব্যবসায়ী এবং তাদের পসরারই যে উল্লেখ রয়েছে নথিপত্রে তা নয়। আর্স্টাডাামের রুশীয় নাগরিক ভ্যাণ্ডেনবার্গ (Vandenburg) ক্যাবিনেট সেক্রেটারী ম্যাকারভ (Makarov) কে এমন এক চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন যার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেই শ্বাশত সত্য—বাণিজ্যিক প্রসারতা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও চলতে থাকে। তিনজন রুশীয় গবেষক (যারা হল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেছেন) ভারতে গিয়েছেন তাঁদের বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণার উদ্দেশ্যে।

ভ্যাণ্ডেনবার্গের চিঠির তারিখ ছিল ১৫ ডিসেম্বর, ১৭২৬ সাল।

ব্যবসাবাণিজ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও ভারতীয়দের সহজাত ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবী পূজা অর্চনা ইত্যাদির প্রতিও যে রুশীয় সরকারের গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, ব্রিটিশ ব্যবসায়ী হ্যানওয়ের ডায়েরীতে বর্ণিত এই বিবরণে—(১৬)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে ভল্গার বুকে। শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসছে সুমধুর ঘন্টাধ্বনি-ঠিন-ঠিন-ঠিন—

আমার কৌতুহল হলো। ঘন্টার শব্দকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম বিচিত্র এক দৃশ্য।

দীর্ঘ সৌম্য এক পুরোহিত গলায় পরেছে নানাবর্ণের পুঁতির মালা। মাথায় জাফরাণী টুপি। এক হাতে ধূপদানী আর একহাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে দেবতার আরাধনা করছে। আরতির পর পুরোহিত হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। কে জানে, হয়তো এটাই ভগবানকে ভক্তি জানানোর ওদের রীতি।

পূজো শেষ হলো।

আমাকে ফলমূল ও মিষ্টি (দেবতাকে যা দিয়েছিল) খেতে দিল। আমি খেলাম না। আমার আজন্ম লালিত সংস্কারে বাধল। চলে এলাম—

হ্যানওয়ের বাষট্টি বছর পরে আর এক ভ্রমণকারী কেপল (Kepple) ভারতীয়দের প্রতি রুশীয় সরকারের এই উদারতা এবং Religious Tolerance অর্থাৎ পরধর্ম সহিষ্ণুতার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, একটি জনপদের অধিবাসীদের জীবনচর্যা এবং বিভিন্ন দেশের নানা জাতির সঙ্গে সংস্কৃতি তথা শোনিতসমন্বয়ের মত ব্যপক একটি বিষয়ের আলোচনা কখনো নির্দিষ্ট একটি শতকের সংকীর্ণ সীমানার ভেতরে আবদ্ধ রাখা যায় না।

আস্ত্রাখানের হিন্দুপল্লীতে পালাস যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষ্যে তাতার রুশীয় মঙ্গোলিয়-তুর্কী-ভারতীয় বেনিয়াদের নিবিড় সখ্যতার বর্ণাঢ্য চিত্রটি—সেটা নিশ্চয়ই আকস্মিক নয়।

রুশীয় সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আস্ত্রাখানের হিন্দুদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জাতির সার্থবাহদের মিলনোৎসব নিশ্চয়ই যেমন বেশ কয়েকশত বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল তেমনি প্রসারিতও হয়ে গিয়েছিল অনাগত ভবিষ্যতের কয়েক শতাব্দীতে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের দুঃসাহসী ইংরেজ পর্যটক জর্জ কেপলও (George Kepple) সেই আস্ত্রাখানেই দেখলেন, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ধর্মের প্রতি রুশীয় কর্তৃপক্ষের আশ্চর্য উদার সহিষ্ণুতা। Natives of every county enjoy religious tolerance (১৭)। শহরে যেমন হিন্দুর মন্দির আছে, কালমুক তাতারদের দেবায়তন আছে, তেমনি আছে মুসলমানদের মসজিদ, খ্রীষ্টানদের গীর্জা।

১৮২০ সালের ৬ই জুলাই, কেপল এলেন কাস্পিয়ানের তীরে প্রাচীন জনপদ বাকুতে। আধুনিককালের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী এই শহর। আজ যেখানে অটোমেটিক পাইপ ওয়েল্ডিং-এর বিশাল কারখানা, যেখানকার নিজামি স্কোয়ার আলোয় ঝলমল করছে, অয়েল রিফাইনারী থেকে লক্ষ লক্ষ টন খনিজ তৈল দেশদেশান্তরে রপ্তানী হচ্ছে, দেড়শো বছর আগে কেপল সেখানে এসে দেখলেন—পঞ্চভুজ বিশিষ্ট (Pentagon) দেওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গনের ওপরে বিশাল এক মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে কড়িকাঠে তিনটি বড় বড় পিতলের ঘন্টা দুলছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য! সেই পাঁচটি দেওয়ালের পাঁচ কোনে মন্দিরের চূড়ো থেকে

উঁচু পাঁচটি সুদীর্ঘ ফাঁপা স্তম্ভের ভেতরে থেকে উত্থিত অগ্নিশিখা লকলক করছে। কেপল খোঁজখবর নিয়ে জানলেন—এই মন্দিরটি হিন্দুদের অগ্নি-দেবতার মন্দির (Fire temple)। সেই দেবায়তনের প্রাচীন বেষ্টনের পাঁচটি দেওয়ালের ভেতরে দিকে ছোট ছোট উনিশটি কুঠুরীতে উনিশজন জটাজুট ধারী অগ্নিউপাসক বা হিন্দু সন্ন্যাসী বাস করে।

সন্ন্যাসীরা জানালেন, প্রত্যেক দুই তিন বছর অন্তত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে এই মন্দিরে আর পুরানো তীর্থকামীরা ঘরে ফিরে যায়।

এখানে কেপল বিষ্ণুর এবং হনুমানের মূর্তিও দেখেছিলেন। দেখেছিলেন নিবিড় মনোযোগে মন্ত্রোচ্চারণরত কর্নওয়ালিশের সমসাময়িককালের ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক সন্ন্যাসীকে। অগ্নিদেবতার মন্দিরের আরও বিশদ বিবরণের ভেতরে অগ্রসর না হয়ে বলতে হয়, রাশিয়ার এই সুপ্রাচীনকালের জনপদে প্রবাসী হিন্দু সন্ন্যাসী এবং তীর্থঙ্করেরা পুরোপুরি এবং নিছক ধর্মের টানে সেখানে গেলেও তাদের ভেতরে রুশীয় সংস্কৃতি এবং জীবনচর্যা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে?

হিন্দুসন্ন্যাসীরা কথাবার্ত্তা বলছিল হিন্দী এবং তাতার ভাষায় (তুখারিয় বা প্রাচীন পারসিক) এক জগাখিচুড়ীতে—The language they spoke was the mixing of Hindusthan language with Corrupt dialect of Tartars ..(১৮)

শুধু তাই নয়। ভক্তসন্ন্যাসী, হিন্দু পুরোহিত এবং তীর্থ পর্যটনকারীরা রাশিয়ার অধিবাসী তথা রুশীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে নিবিড় সখ্যতার মনোভাব পোষণ করতো—They spoke fabourly of the Russians (১৯)

কেপলের ত্রিশবছর আগে (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট ফর্ষ্টারও জানিয়েছেন, রুশীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিশীল উদারে দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই হিন্দু-বেনিয়ারা এবং তাদের বেতনভুক ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা আস্ত্রাখানের সর্বত্র স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারতো। এমন কি একদিন ফর্ষ্টারের নজরেও পড়েছিল, আস্ত্রাখানের কিছু দূরে এক ক্যারাভানসরাইতে তাতার-তুর্কী-রুশীয়-মুসলমান ইহুদী নানা ধর্মের নানাজাতির সওদাগরদের উপস্থিতিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই হিন্দু বেনিয়ারা উচ্চস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করে পূজো করছে।

এই বিচিত্র ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা করে ফর্ষ্টার জানিয়েছেন (২০)

দীর্ঘদিন এক ক্যারাভ্যানসরাইতে থেকে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমেই এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের জন্যই হয়তো তাদের ভেতরে নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। সৌহার্দ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল পরধর্ম-সহিষ্ণুতা।

ফর্ষ্টারের একচল্লিশ এবং কেপলের উনিশ বছর পরে ইষ্টইণ্ডিয়ার কোম্পানীর প্রতিনিধি আলেকজান্দার বার্নস (Alezr Burnes) দেখেছিলেন (২১) বুখারার বাজারে বিক্রি হচ্ছে ঢাকার সেই জগদ্বিখ্যাত বস্ত্রাভরণ-মসলিন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক একটি বস্ত্রখণ্ড বিশ টিল্লা (১ টিল্লা = ৬॥ সিক্কাটাকা অর্থাৎ তের শিলিং)

বুখারায় শুধু মসলিন নয়, ভারতীয় বিবিধ পণ্যের সঙ্গে রুশীয় পণ্যের বিপুল সমাবেশ উল্লেখ করে বার্নস বলেছেন, তুর্কীস্থানের প্রাচীন জনপদ এই বুখারা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বণিকদের মিলনকেন্দ্র। কাবুল থেকে যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকার পণ্য যায় বুখারায় তেমনি বুখারা থেকে রুশীয় এবং পারসিক পণ্যসম্ভার রপ্তানী হয় কাবুলে। পূর্ব সোভিয়েত এশিয়ার উরালনদীর তীরে ওরেনবার্গ (Orenburg) থেকে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রুশীয় পণ্য-সম্ভার নিয়ে আসে ১৩০০ উটের এক বিরাট কাফিলা (ক্যারাভান)। বুখারার বাজারে ভারতীয় পণ্যের যেমন তেমনি রুশীয় পণ্যসম্ভারের বিপুল চাহিদা প্রত্যক্ষ করেছেন বার্নস—Russian trade encounters no opposition as BOKHARA from Indian trade...(২২)

কিন্তু বুখারার চেয়ে ভল্গার তীরে আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত চল্লিশ দিন ব্যাপী নভোগোরোদের মেলাতেই মধ্যএশিয়া সওদাগরেরা তাদের পণ্য যেমন খুব বেশি পরিমানে বিক্রি তেমনি বিদেশী পণ্য ক্রয় করতে পারতো। মধ্যএশিয়া বাসীরা এই মেলাকে বলে মিউক্রিয়া বা সেন্ট ম্যাকায়িরের মেলা। (Mucrea —St Macaire)

বার্নস দেখেছেন, নভোগোরোদ বা সেন্ট ম্যাকায়িরের মেলায় হিন্দু বেনিয়ারাও তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে—Hindoos are found St. at Macaire...(২৩)

বুখারা এবং তুর্কীস্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা ত্রিশগজ দীর্ঘ এবং এক ফুট চওড়া সাদা ধবধবে যে কাপড়ের পাগড়ী পরে—সেই বস্ত্র রপ্তানী হতো পাঞ্জাব থেকে (২৪)।

বুখারার বাজারে প্রতিবছর একশো কুড়ি থেকে দুইশো জোড়া ভুবনবিখ্যাত

অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত কাশ্মীরি শাল আমদানী হতো। রুশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি এবং রাজপুরুষদের কাছে কাশ্মীরি শালের চাহিদা ছিল (২৫)। আমদানী হতো ভারতের চিনি। তুর্কীস্থানের মাটিতে আখগাছ জন্মায় না বলেই ইণ্ডিয়ান সুগারের খুব আদর ছিল বুখারায়। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানী হতো বুখারায় ভারতীয় নীল (Indigo) প্রতি বছর গড়ে পাঁচশো উটের ক্যারাভানে নীল রপ্তানী হতো ভারত থেকে।

ভারতীয় পণ্য যেমন রপ্তানী হতো তেমনি বুখারার তথা তুর্কীস্থানের রেশম (২৬) আমদানী হতো কাবুল হয়ে ভারতে। পূষাণের (তুর্কীস্থানে) পশমের পণ্যসম্ভার উত্তুঙ্গ পামীর-হিন্দুকুশ ডিঙিয়ে আসতো কাবুলের বাজারে। এই পশম দিয়ে পাঞ্জাবে শাল তৈরী হতো। আমুদরিয়া (oxus) এবং বুখারার মাঝখানে একটা ছোট জেলা কারকুল থেকে ভারতে রপ্তানী হতো রুশী ভেড়ার চামড়া। এই মসৃণ চামড়া খুব জনপ্রিয় ছিল সমগ্র ভারতে—Lamb skin are Celebrated in East...(২৭)

আরও বিবিধ অনেক পণ্যের লেনদেনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সখ্যতা থেকে এই দুই মহান দেশের যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যায় বুখারায় হিন্দু বেনিয়াদের দেয় শুল্ক বা ট্যাকস নির্ধারণে। মুসলমান-খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদের যেখানে মোট পণ্যের মূল্যের শতকরা বিশ ভাগ সেখানে হিন্দু সার্থবাহদের দিতে হতো মাত্র শতকরা দশভাগ Hindu merchant is to pay only 10% as tax...(২৮)

স্বভাবতই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে আরও পরবর্তীকালের পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের ভ্রমণবিবরণী বা স্মৃতিকথায় আরও বেশি করে পাওয়া যাবে বাণিজ্যিক লেনদেন এবং সখ্যতার ইতিবৃত্ত।

হাজার হাজার বছর আগে আমুদরিয়ার দেশে কিজিলকুম মরুভূমির অন্তহীন বালুকাবিস্তারে, তিয়েনশান পাহাড়ের গিরিকন্দরে পৃথিবীর প্রাচীনতম দুত—এই দুই মহান দেশের সার্থবাহদের তিলে তিলে গড়ে তোলা সৌহার্দ্যবন্ধন যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়ে আজ আরও সুদৃঢ় আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

আরও হবে।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি

		পৃষ্ঠা
(১)	An Historical Account of British Trade over the Caspian Sea. Jonas Hanway	২০
(২)	Ibid — Ibid	২৩-২৪
(৩)	Ibid — Ibid	৮২
(৪)	Travels through the Southern region of the Russian Empire in the years 1793 & 1794. Pallas, P. S.	বিবিধ
(৫-১৫)	Russian-Indian Relations XVIII Century Peoples Publishing House. Moscow	বিবিধ
(১৬)	An Historical Account of British Trade over Caspian Sea. Jonas Hanway	৮৫
(১৭)	Personal Narrative of Journey From INDIA to ENGLAND, NOVOGOROD MOSCOW George Kepple.	২৬৩
(১৮)	Ibid — Ibid	১১৬-১৭
(১৯)	Ibid — Ibid	২১৭
(২০)	Journey from Bengal to England through the Northern part of India, Kashmir, Afganisthan and Persia and into Russia by Caspian Sea. Forster Vol. 2	বিবিধ
(২১)	Travels into BOKHARA Containing the narrative of a Voyage on the Indus From Sea to Lahore...... and an Account of a Journey From INDIA to CABOOL, TARTARY & PERSIA. Vol. III Alexr. Burnes	৩৪৮
(২২)	Ibid — Vol. III Ibid	৩৪৪
(২৩)	Ibid — " Ibid	৩৪৩-৪৪
(২৪)	Ibid — " Ibid	৩৪৮
(২৫)	Ibid — " Ibid	৩৪৮-৪৯
(২৬)	Ibid — " Idid	৩৫২
(২৭)	Ibid — " Ibid	৩৫২
(২৮)	Ibid — " Ibid	৩৫৩

—★—

রুশ-ভারত সম্বন্ধীয় তথ্য-নির্দেশিকা

অগ্নিদেবতার মন্দির ১৭৩
অজন্তা ২২
অজিত সেন ৬২
অতিগুপ্ত ৬২
অনুবাদসভা ৬৭
অন্ধকারের দেশ ১১২
অক্ষু (বক্ষু) নদী ১৩০
অভিধর্মপিটক ৫৮
অভিধর্মমহাবিভাস ৪০
অরেল স্টেইন ২৩, ৬৫, ৬৭
অশ্ব (তুর্কীস্থান) ৭, ১৩৫
অশ্ব-সংস্কৃতির ভূমি ৭
অশোক ৩১, ৪৭, ৫২
আই. ওয়াই জ্যাবেলিন ৪
আই. রিয়াসানভ ১১
আউরঙ্গজেব ১৬০
আক-বেসিম ২০
আঁকা (প্রত্নতাত্ত্বিক) ২৩
আগ্রা ১২৫
আগমোক্ত দ্বাদশনিদানসূত্র ৫৭
আজারবাইজান ১
আদি সেন ৬৪
আনবুরাম (আত্মারাম) ১৬৯
আন-হিউয়ান ৫৭
আনি-সে-কাও ৫৫
আফগানিস্থান ২২, ৩৫, ৪৪, ১১৮
আবুল ফিদের ১১৩
আর্মেনিয় ৯৮, ১৪৮, ১৫৫, ১৬৭
আমুদরিয়া ৬-৭, ১৩-১৪, ১৮-১৯, ২৩
২৮, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪৩-৪
আরবিয় ১৫, ৮৫
আলেকজান্দার দি গ্রেট ৭৭
আলেকজান্দার বার্নস (বার্নস দ্রষ্টব্য)
আস্ত্রাখান ১১৩ ১১৪, ১৪৪, ১৪৬-৪
১৫২, ১৫৬-৫৭, ১৬০, ১৬২
১৬৫, ১৭০
আস্ত্রাবাদ ১৬২
আম্বিরতাম ১১, ১৩, ২৪, ৪৭
অ্যাকাস্থার ১২
অ্যাকামেনিদ ৩০
অ্যালেপ্পো (সিরিয়া) ১৩৭
অ্যাসিরিও (বর্ণমালা) ৩১
অ্যাসিরিয়া ৭৩
ইউজেনীভ্যান ক্লিফ ২৯
ইন্দোসিদিয়ান ৩২
ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজি অফ দি
সোভিয়েত একাডেমী অফ সায়েন্স ১৬
ইটিল ৯৭-৯৮, ৯৯
ইবন খোরদাদবিহ ৯১
ইবন ফাদ[illegible]

ইবন বতুতা ১১১, ১১৩, ১১৭-১৮
ইরান ৩৫
ইস্পাহান ১৫৪, ১৫৯, ১৬২
উইলস্টার (রুশপ্রতিনিধি) ১৬৯
উগ্রাপরিপৃচ্ছা ৫৭
উজবেক ৫, ১২৪
উজবেক অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স ২
উজবেকিস্থান ৭, ১২
উজবেকিস্থান কমিটি ফর দি প্রিজার্ভেশান অফ মনুমেন্টস অফ অ্যান্টিকুইটি অ্যাণ্ড আর্টস ১২
উত্তর ভারত ১৯, ৭১
উপশূন্য ৬২
এ. এস উভ্যারভ ৪
এ. ওয়াই, ইয়াকুবোভস্কি ১১, ১৬
এইচ, আর জিব ১১১
এডগার নোরক ১৩, ২৭-২৮, ৪৮, ৮১, ১৩৩
এম, ই, ম্যাসন ১১-১২, ৩৪
এম, এড, চাভানিজ ৪২
এম, ম্রষ্টোভেফট ৩
এরমাইন (সাদা পশম) ১১৩
এল, কে আইভ্যানেভস্কি ৪
এল, দি জিয়াল্লিন ২০
এশিয়ামাইনর ১২৮
ওরেনবার্গ ১৭৪
কচ্ছপের খোল ১০৮
কনফুসিয়াস ৫৪
কনিষ্ক ৩৯, ৪০-৪১, ৪৫, ৪৮
কপিশা ২২
কমতে দ্যলাস্বেরণ ৩
কম্বোজা ৫২
কর্ণেল ওয়াডেল ৩১
কর্ণেল বোয়ের ২৩
কল্পনামন্দিতিকা ৪২
কাউজিনারী ৩
কাজাক রিপাবলিক ১, ৫
কান্দাহার (গান্ধার দ্রষ্টব্য) ৩৯
কানান ১০৮
কানিংহাম ৪২, ৪৭
কাবুল ৩৭, ৭৭, ১০৬, ১২৫, ১৭৫
কাবুল-খোরাসান (রাস্তা) ১২৬
কাবুল নদী (কুভা) ২২, ৩৪
কারজ্যান (উজবেকিস্থান) ১০৮
কারম্যান (দক্ষিণ-পূর্ব ইরান) ১০৫, ১০৮
কারাকালাপাক ৭
কারাকুম (মরুভূমি) ৭, ২৪, ৪১, ৮২
কারাশর ৩৫
কালমুক (তাতার) ১৪৯, ১৭০, ১৭২
কালোপশম ৯৩
কাশগর ৪২, ৬৫, ১৪২
কাশ্মীর ৫৯
কাশ্মীরি শাল ১৭৫
কাশ্যপ মাতঙ্গ ৫৪-৫৫
কাস্পিয়ান ২১
কিজিলকুম ২, ৭, ১৪, ২১, ২৪, ৮২
কিরগিজ ১, ২, ৫, ১২৪
কিয়েভ ৯৯, ১৬৮

কুচিয় ৬৭
কুচী ২৩
কুমারজীব ৬৩
কুমারায়ন ৬৩
কুর্মানিদান শ্রীপলহস্মূত্র ৫৮
কুশান ৮-৯, ২২, ৪২, ৪৭-৪৮, ৫২
কেনেডি (ঐতিহাসিক) ৪৮
কেপলজর্জ ১১৪, ১৫২, ১৭২-৭৪
ক্যারাভ্যান রুট ২৯
ক্যারাভ্যানসরাই ৮৩, ১৭৪
খোরোষ্ঠী লিপি ৩৯, ৪৮
খাইবার গিরিপথ ৭৭
খাজার ৯২, ৯৮
খেজুর (বুখারা) ১১৫
খেনিকভ ১৩৫
খোটান ৩৫, ৪২, ৬৫, ৬৭
খোরাসান ৭১
খোয়ারিজম ৬-৮, ২৪, ৩৪, ৩৭, ৪৪,
৪৬, ৭৭, ১০২, ১১৬
গঙ্গা-আমুদরিয়া-শিরদরিয়া ১
গঙ্গে (তাম্রলিপ্ত) ১০৬
গাঙ্গেয় উপত্যকা ১৮ (অধিবাসী),
২২ (লিপি), ৪২ (নগর)
১০৫ (লৌহ ইস্পাত)
১২২, ১৩৫ (বণিক)
গাঙ্গেয় জটামাংসী ৭৯, ৪৮
গাঙ্গেয় মসলিন ১৩৫, ১৪৭
গার্ডেনার (প্রত্নতাত্ত্বিক) ৪৮
গান্ধার ৩৭, ৩৯, ৫২
গান্ধার শিল্প ১২, ৪৭
গিলগিট ৩৬
গ্রীক ৮, ২৩, ৪৭
গ্রীস ৯৮
গুজরাট ৭১, ৯৩, ১০৪, ১৪৫
গুণবর্মন ৬৪
গুণবৃদ্ধি ৬৪
গুপ্তযুগ ৪০
গুগ্‌গুল ৭৯
গ্রুয়েনওয়েডেল ২৩
গ্রেগরী ফ্রামকিন ৮১
গ্রেট সিল্ক রোড ২১, ৮১
গোবি মরুভূমি ৮৮
গোল্ডবার্গ ১৪৩-৪৪
গৌতম ধর্মজ্ঞান ৬৪
গৌতম সংঘদেব ৬৪
গ্র্যাসো-ব্যাক্ট্রিয়ান ৪৬-৪৭
চতুর্থ বৌদ্ধসংগীত ৪৫
চন্দ্রগুপ্ত ৩৯
চি-ইয়াও ৫৭
চিনি (ভারতীয়) ১৭৫
চীন, ৪৫, ৮২
চীনা ২৩
জনচার্ডিন ১৪৫, ১৫৯
জন মার্শাল ৩১, ৪২, ৪৭
জন স্ট্রুইস ১৪৫, ১৫১
জরথুস্ত্র ৩২, ৪৯
জাতক ১৭
জার-টেপে ৪৬

জার্মানী ৩৫
জার্মেইন মারলেন্স ৭৬
জার আলেক্সি মিহাইলোভিচ ১৪৬, ১৪৮
জার গ্রেট ভ্যাসিলি দি থার্ড ১৩১
জার পিটার দি গ্রেট ১২৮
জারফশান ২, ২৮, ৮২
জালান্ধার ৪৪
জাহাঙ্গীর ১৩১
জি, গ্রাম গ্রজহিমেলো ৮৪
জিনগুপ্ত ৬৩
জিনযশ ৬৪
জিলদ (চামড়া) ৯৩
জিলডিক ৪৪
জেঙ্গিস টেপে ১৩
জেমকিনসন ১৩১, ১৩৩-৪১
জেনোফোন ৩১
জোনাস হ্যানওয়ে ১৬২, ১৬৪, ১৬৭, ১৭১
জ্যাঙ-টেপে ৪৬
টলস্টভ ৪, ৬, ১১, ২৪, ৩৪, ৪৩
টালেমি ৩৩, ৭৩, ৭৫
টায়ার ২৯
ট্রান্স-অক্সিয়ানা ৫২, ১২৯-৩১
ট্রান্স-আলাই ৮৩
ট্রাপুস ৫৩
ট্যাভারনিয়ার ১৫৯
টিটিয়ানাস ৭৪-৭৫
টেদজেহেন্দ ৮৩
টেরাকোটা (তক্ষশিলা) ৪৭
টেসিক কালা ৬
টোপরাক কালা ৪৪
ডি, ওয়াই, শ্যামোকভ্যাসভ ৪
ডিমিট্রিয়াস ৪৭
ডুক দ্য রিচেলিইউ ৩
ডেরিয়াস ৩০-৩৪, ৩৭, ৩৯, ৫২
ড্যানিয়েল স্কালাম বার্জার ৪৭
তক্ষশিলা ৪২, ৪৭, ৭৭
তরমুজ (খোয়ারিজম) ১১৭
তলোয়ার ৯৩
তাওয়িজম ৫৪
তাকলামাকান ২১, ২৪' ২৮, ৭৩
তাজাবাগিয়াব ৬
তাজিক ১, ৫, ২০
তাজিকিস্থান ২
তাতার (ভাষা) ১৭৩
তাতারের দেশ ১০৩
তাব্রিজ ১৫৪, ১৬২
তারিম ৮৬, ৮৮
তাসখন্দ ১, ২, ২১, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৭৩, ৭৬, ৮৫-৬
তুর্কীস্থান ১৭৫
তুর্কীস্থানী আর্যভাষা ৬৮
তুখারা ৫৪, ৭১
তুঘলক (গিয়াসুদ্দীন) ১১৬
তুন-হোয়াং ২৩, ৬৫-৬৭
তেরমেজ ১১, ১৩-১৪, ২১, ২৪, ৪৭
তেহরান ২৯
তোখারিস্থান ১৯

তোমায়ুন (পারসিক মুদ্রা) ৯৮
তিব্বত ৩০, ৬৫
তিব্বতী (ভাষা) ৬৭
তিয়েন তি-চাউ (ভারতবর্ষ) ৪১
তিয়েনশান ২, ১১, ১৮, ৮১, ৮৮
তুর্কমেন-উজবেক ১, ১৬৪
তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক ৭
তুর্কমেনিয়া ৫
তুর্কী ৬৭, ১২৮
দজুন গারিয়ানগাট ৮৬
দশাসহাস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ৫৬
দান্দান উইলকি ৬৬
দানিয়ুব ৩৪-৫
দ্রাবিড় ২৪
দামাস্কাস ৯২
দ্বিচত্বারিংশৎবস্তুসূত্র ৫৫
দেওয়ালী ১৬৫, ১৭২
দেবতার আরাধনা ১৭২
দেরবেন্দ (ভারতীয় ব্যবসায়ী) ১৪৪, ১৫৭
দ্রবুয়েন কর্ণোলিস ১৪৪
ধর্মগুপ্ত ৬৩
ধর্মচন্দ্র ৬৩
ধর্মমিত্র ৬০
ধর্মরক্ষ ৬৩
ধর্মরত্ন ৫৪-৫
ধর্মরুচি ৬৪
ধর্মযশ ৬০
ধর্মসিংহ ৬২
নটরাজ শিব ২৪
নভোগোরোদ ১৪৩, ১৭১, ১৭৪
নরেন্দ্রযশ ৬৪
নলিনাক্ষ দত্ত ৩৯
নাদিরশাহ ১৬২-৬৩
নানজীও ৫৭
নিদান চর্যাসূত্র ৫৮
নীল ৯৪, ১০৪, ১৭৫
নীলকান্তমণি ১০৫
নুগোদর ১০৯
নো (প্রত্নতত্ত্ববিদ) ৪৮
পঞ্চতন্ত্র ১৭
পলপোলিও ২৩, ৬৭
পলিভ্যানভ ৮৫
পশম ১০৩
পাঞ্জাব ১৯, ১৪৫
পাটলিপুত্র ৪৮
পাণ্ডুলিপি (বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র) ২১
পার্থিয়া ৫৫, ৭৩, ৭৭
পারসিক ১৬, ২৩ (পুঁথি), ৩১ (বর্ণমালা) ৪৭ (শিল্প), ৮২, ৮৫, ১৪৮, ১৬৪
পারস্য ২২, ৪৫, ৫২, ১৬২
পি, এস, পাল্লাস ১১৪, ১৬৫, ১৬৭
পিটসবার্গ ১৬৮
প্লিনি ২৭, ৭৬
পুগাচেঙ্কোভা ২৪
পুণ্যত্রাতা ৬০

পুণ্যমোদয় নন্দী ৬৩
পুরুষপুর (পেশোয়ার) ২২, ৪২
পুন্দজিহিকেন্ত ১৬-১৭, ২১, ২৪, ৪৭
পেরিপ্লাস অফ
এরিথ্রেয়ান সী ৩২, ৩৭, ৭৩, ৭৬
পেশ্চিলেন (প্রত্নতত্ত্ববিদ) ১৩
পেশোয়ার ৩২, ৩৪, ১০৬
প্রভাকর মিত্র ৬১
প্রস্তরের পুঁতির (ভারতীয়)
অলঙ্কার ১৭
ফস্টার ১১৪, ১৭৩-৭৪
ফার্মাকোভোস্কি ৪
ফা-হিয়েন ৩৫, ৪২
ফ্রানকিনসেন্স (ধূপ) ৭৮
ফ্রান্স ৭৫
ফিনিসিয়া ২৯
ফ্লীট (ঐতিহাসিক) ৪৮
ফুশে (ফরাসী পণ্ডিত) ১৯
ফ্রুঞ্জে ২০
ফেরগানা ২, ৪৩, ৪৫, ৮৩, ১২৪
বক্ষু (নদী, অক্ষু দ্রষ্টব্য) ২১, ৭৭
বলাখ ৭১, ৯২, ১০২, ১০৪, ১২৬
বহ্লীক ৫৩
ব্যবসা (নিশব্দ) ১১৩
বাকু ২, ১৭২
বাগদাদ ৩০, ৯২, ১০৬
বাদাখশান ৩৬, ১০২, ১০৪, ১২৬
বাটর ডোরজ বারাজভ ২০
বাটলার ১৫২
বাণিজ্যপথ ২১, ৬৭
বার্নস ১৭৪
বাবর ১২২-৩১
বাবরনামা ১২৯
বামিয়েন ২২
বারবারিকাম ৭৮-৭৯
বারাণসী ৩৯
বারিগাজা ৭৮
বসোরা ৯২
ব্যাক্ট্রিয়া ১৯, ৪৬
ব্যাবিলন ৩১
বুখারা ১৪, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৯৭,
১০২, ১১৫, ১৩৪, ১৩৬, ১৬২,
১৭৪
বুখারা খুদতস ১৫
বুদ্ধমূর্তি ২২ (১৫০ ফিট দীর্ঘ)
বুদ্ধযশ ৫৯
বুদ্ধশান্ত ৬৪
বুলগার ৯২-৯৪, ৯৭, ১০৪, ১১১
বুলনয়েজ ৪৫, ৮৪
বি, এম, কিট্রোভা ৪
বিভারীজ ১২৪, ১৩০
বিমলাক্ষ ৫৯
বেঙ্গলা ১৩৫
বেজী (কৃষ্ণবর্ণ) ৯৩, ১০৩
বের্ণস্ট্যাম ৪, ১১, ১৭-১৮
বেলিনিতস্কি ৫, ১৩-১৪, ২৪
বোধিরুচি ৬৪
বোধিসত্ব ২০

বৌদ্ধধর্ম ১৯, ২১, ২৩, ৪৭
বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ৪৬, ৫৫, ৬০
বৌদ্ধভিক্ষু ২২, ৫২
বৌদ্ধশিল্প ২০, ৪৭
বৌদ্ধসংস্কৃতি ১৯, ২২, ৪২
ব্রাহ্মীলিপি ২১-২২, ২৩-২৪, ৪৮
ভক্ষ (উপত্যকা) ২০
ভলাডিমির ৯৯
ভারতবর্ষ ১৮, ২২, ২৫, ২৯, ৪২, ৪৬
ভারতীয় ওঝা ৯৯
ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা ৬৬
ভারতীয় বেনিয়া ১৩৫, ১৫৫, ১৭০
ভারতীয় রত্ন ১৮
ভারতীয় রূপকথা ১৭
ভারতীয় শিল্প ১২-১৩
ভারতীয় সভ্যতা ১
ভারতীয় সংস্কৃতি ১৯, ২৩, ৩৯, ৪২, ৮২, ১৪৫
ভারাক্ষা ১৪, ১৭, ২১, ২৪, ৪৭
ভারোবিইভ ডেশ্যাতোভস্কিয়া ৪৬
ভাস্কো-ডি-গামা ২৯
ভ্যারোবিয়েভা (প্রত্নতাত্ত্বিক) ৩৪
ভি, আই, সিজভ ৪
ভি, এ, নিলসেন ১৫
ভি, এ, শিশকিন ১৪
ভি, এ, স্মিথ ৪০
ভি, এল, ভরোনিনা ১৭
ভেনিস ১০১
মথুরা ৩৯
মনগেট ৫, ১১
মরোক্কো ১১১
মসলিন ৭৯-৮০
মস্কো (ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্লোকনাথ) ১৫৪, ১৫৮
মস্কো (রুশী-ভারতীয় বেনিয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি) ১৭০
মস্কো আর্মারি মিউজিয়াম ৪
মস্কো (ব্যবসাকেন্দ্র) ১২৭
মস্কোভী ১৩৭
মহানদানসূত্র ৫৬
মহেঞ্জোদারো ৫, ৬, ৮, ৩১
মার্কোপোলো ৮৩, ১০০-১১০
মার্গভূমিসূত্র ৫৬
মার্ভে ২৯, ৭৭, ৯৭
মালাওয়ার (লাহোর) ১০৯
ম্যাকগভর্ণ ৮
ম্যাকেরিয়েভো ১৭১
ম্যালকিয়েভ (রুশ প্রতিনিধি ভারতে) ১৬০
ম্যাক্সিস টিটিয়ানাস ৪৫, ৭৪-৭৫
মিউক্রিয়া (নভোগোরোদ দ্রষ্টব্য)
মি-ঙ-টি (চীনাসম্রাট) ৫৪
মীর্জা কামরান ১২৮
মুরঘাব (ব্যবসাকেন্দ্র) ৮৩
মুলতান ৭১, ৯৩, ১১৯, ১৪৮
মেরিনাস ৭৪
মেসেদ ১৬২-১৬৪
মেসোপটেমিয়া ৭২

মেহেদি হোসেন ১১২
মৌর্যযুগ ১১৪
যাযাবর (উপজাতি) ১৭, ৩৪
রস্টোভ ৯৯
রস্টোভেফট ৫
রাওলিনসন ৩০
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ৪০
রানী এলিজাবেথ ১৩৭, ১৬৪
রাশিয়া ১২৮
রাশিয়া (ভারতীয় সওদাগর রামচাঁদ) ১৫৪
রাহুল সংকৃত্যায়ন ৩, ৫, ৮, ৩৭, ৪৫
রিয়াজান ৯৯
রুশী ভেড়া ১৭৫
রুশী অশ্ব ৮
রুশী তলোয়ার ৮
রুশী বস্ত্রশিল্পী ১৩৬
রোম ৩৫, ৯৮
লপ-নর ৮৩, ৮৬, ৮৮-৮৯
লয়্যাড ৫৫
লাহোর (মালাওয়ার দ্রষ্টব্য) ৯৩, ১০৯
লুডার (ভারত বিদ্যা বিশেষজ্ঞ) ৪০, ৪২
লেভিনা বুলাটোভা (প্রত্নতাত্ত্বিক) ২০
লোকক্ষেম ৫৬
লোকত্তম ৫৫
ল্যাণ্ড অফ সেরিস ৮৮
ল্যাসেন ৩১, ১০৫
শক ১৮, ২২-২৩, ৮১
শাহিরিস্থান ১৬
শিরদরিয়া (আমুদরিয়া দ্রষ্টব্য) ১২৭
শিলালিপি (বেহিস্তান) ৩১
শেমাখা ১৫০, ১৫৪, ১৬৩
ষ্ট্যাভিস্কি ২৪
সপ্তনদী ৫২
সমরখন্দ ১৬, ২২, ১১৫, ১১৯, ১২২-২৪
সম্যাক্ত-রত্নপিটক সুত্র ৪০
সরাই বাটু ১০২
সহস্রবুদ্ধ ২২
সংঘভূতি ৫৮
সংস্কৃত (পুঁথি) ২৩
স্ট্যাভিস্কি ১৩, ২৪
স্মলেনস্ক ৯৯
সাকলাবাহ (তলোয়ার দ্রষ্টব্য)
সান্দালিয়া ৯৫
সারনাথ ৪৪
স্ত্যালিনগ্রাদ (সরাইবাটু দ্রষ্টব্য)
স্যালমাসিয়াস (ঐতিহাসিক) ১০৫
সিথিয়ান (শক দ্রষ্টব্য) ৮, ৪৮
সিন্ধুনদ ৩০, ৭৯
সিন্ধুপ্রদেশ ২১, ৭৭, ১৪৫
সিন্ধু সভ্যতা ৮, ১৯
সিরিয়া ৩৩, ১৩৪
সিরিয়াক (ভাষা) ২৩
সিঙ্করুট ৩৪, ৩৬-৩৭, ৪৫-৪৬, ৭৩, ৭৬-৭৭, ৮৫, ১০৬, ১৪৩
সুকুমার সেন ৪৯
সুখানদরিয়া ৪৭
সুগন্ধী ধুনো ৭৮

সুগন্ধী মশলা ১৪৭
সুগদ ২২, ৩২
সুগদায় ১৬, ২৩, ৬৭, ৭১
স্প্নার ৩১
সুরেন্দ্রগোপাল ১৪৩
সূত্রালঙ্কার শাস্ত্র ৪০, ৪২
সেমিরিচ (সপ্তনদী দ্রষ্টব্য)
সেলুকাস ৪৭
সোভিয়েত মধ্যএশিয়া ৯, ২৫
সোং-ইউন ৫৮
হরপ্পা ৫, ৩১
হামাদান ৭৩
হিউয়েন-সাঙ ৫৪, ৫৮
হিন্দুদেবতা ২২-২৩
হিন্দুবণিক ১৬৭
হিন্দু সন্ন্যাসী ১৭৩
হিন্দু সংস্কৃতি ২১
হিন্দু মন্দির ১৭২
হীরাট ৮৩, ১০৫, ১১৮
হুন ৮, ২৩, ৪৫
হেনরিখ জুলিয়াস ক্ল্যাপরথ ১২৯
হেরোডোটাস ৭, ২৭
হোমুর্জ প্রণালী ১০৬, ১০৭
হোয়াইস হর্স মনেস্টরী (লয়্যাঙ দ্রষ্টব্য)
হ্যানওয়ে (জোনাস হ্যানওয়ে দ্রষ্টব্য)
হ্যারল্ডল্যাম্ব ১২২

